সাহিত্য-সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ, এম. এ., ডি. ফিল.

প্রকাশক :
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. উপাধির জন্য
প্রদত্ত এবং অনুমোদিত গবেষণা-পত্র)

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীসুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্মমিশন প্রেস প্রাঃ লিঃ
২১১/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মা, বাবা ও দাদার

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে প্রখ্যাত। উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে নবজাগরণ এসেছিল, যে বিভিন্নমুখী চিন্তা ও কর্মের বিচিত্র আয়োজন হয়েছিল তারই পটভূমিতে তাঁর আবির্ভাব। তাই ধর্মসাধনা ও কর্মযজ্ঞ উদ্‌যাপনই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি উপেক্ষণীয় ছিলেন না। একথা সত্য যে, যে যুগগত প্রয়োজনে তিনি সমাজকর্মী ও ধর্মনেতা হয়েছিলেন, সেই প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি লেখকও হয়েছিলেন। তবে, গভীরতর বিচারে দেখা যায়, প্রয়োজনের তাড়না তাঁর ব্যক্তিগত হৃদয়কে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি, সময় সময় তিনি আপন রচনায় প্রয়োজনধর্মকে অতিক্রম করে শিল্পধর্মে পৌঁছতে পেরেছেন। তাঁর একটা সাহিত্যিক মনও ছিল। আর যেখানে তিনি সামাজিক, ধার্মিক, নীতিগত ও আদর্শগত প্রয়োজনচক্রের মধ্যে নিজের চিন্তা ও অনুভূতিকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন সেখানেও তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এবং সেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের মধ্যেও তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতার নিদর্শন আছে।

ঈশ্বর গুপ্তের যুগে শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনাকর্মের আরম্ভ এবং রবীন্দ্রযুগে তার সমাপ্তি। এই অন্তবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য প্রয়োজনধর্মের দায় মিটিয়ে শিল্পধর্মে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজে বিশিষ্ট সামাজিক ছিলেন বলে তাঁর বিভিন্ন ধরণের রচনা শিল্পধর্মের দাবী নিয়ে পুরোপুরি উপস্থাপিত হয়নি, তিনি সাহিত্যিক আদর্শ হিসাবে কলাকৈবল্যবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। যদি কোন সামাজিক দায় তিনি অঙ্গীকার না করতেন, তবে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকতর স্ফূর্তি ঘটত বলে আমাদের বিশ্বাস। সে যাই হোক্, তাঁর রচনা যেমন পরিমাণে প্রচুর, তেমনি বিচিত্রও বটে। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য সব রকমের সাহিত্য-কর্মে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। আর সেই কারণে শিবনাথের সাহিত্য-সাধনার একটা বিশেষ মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিবনাথের ধর্মান্দোলন, শিক্ষাব্রত ও সামাজিক

কর্মধারা বাংলা দেশে যতটা স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাঁর সাহিত্য-সাধনা ততটা স্বীকৃতি লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস সমালোচনা ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁকে কতকটা মর্যাদা এনে দিয়েছে বটে, কিন্তু কবি হিসাবে তিনি উপযুক্ত সম্মান পান নি। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কোন কোন নীতিকবিতা স্থান পেলেও তাঁর কাব্যকৃতির ব্যাপক সমাদর হয় নি। সচিত্র শিশুপাঠ্য রচনায় তিনি যে অগ্রণী ছিলেন, এ তথ্য অনেকেরই জানা নেই। তাছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্র সম্পাদনেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। কিন্তু সমালোচকগণ এখনও পর্যন্ত শিবনাথের সাহিত্যচর্চার পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রসর হননি এবং তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়টিকে সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করার কোন চেষ্টা করেন নি। এদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যসাধক চরিতমালায় প্রথম দৃষ্টি দেন, কিন্তু তাতে শিবনাথের সাহিত্য-জীবনের রূপরেখাটি ধরা পড়লেও তাঁর বিস্তৃত পরিচয়টি সেখানে ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি, অবশ্য সে সুযোগও সেখানে তাঁর ছিল না। ছোট ছোট প্রবন্ধে কোন কোন সমালোচক তাঁর সাহিত্য-চর্চার যে বিবরণ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন সাহিত্য-ইতিহাসে তিনি যতটুকু পরিমাণে আলোচিত হয়েছেন, তা কোন মতেই পাঠকের জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করে না। সেই অভাব পূরণই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য।

শিবনাথের সমগ্র সাহিত্য পরিচয়টিকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য আমি যেমন এযাবৎ মুদ্রিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছি, তেমনি এযাবৎ অনাবিষ্কৃত বহু তথ্য ও ঘটনা আলোচনার মধ্যে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি। শিবনাথ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে তথ্য ও তারিখের নানা ত্রুটি লক্ষ্য করেছি, এমন কি শিবনাথও সঠিক সংবাদ ও তারিখ সর্বত্র সরবরাহ করতে পারেন নি। আমি বহু সন্ধান করে ও তুলনা-মূলক আলোচনার সাহায্যে সেই সমস্ত ত্রুটি দূর করতে যথাসম্ভব প্রয়াস পেয়েছি। সম্ভাব্য স্থান থেকে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক অজানা বিষয় আমি জানতে পেরেছি এবং যথোচিতভাবে গ্রন্থ মধ্যে তা সন্নিবেশ করেছি। সেকারণে বর্তমান আলোচনা চারদিক থেকে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে—(১) আলোচনার সমগ্রতা; (২) বিচিত্র, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা সত্য নির্ধারণ; (৩) নূতন তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ; (৪) সাময়িক পত্রে

উপেক্ষিত অবস্থায় বর্তমান এবং অপ্রকাশিত বহু রচনার সন্ধান। আমার এ দাবী গ্রহণযোগ্য কিনা, তা উপযুক্ত ব্যক্তিরাই বিচার করবেন।

সাহিত্যসাধক শিবনাথের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি তাঁর যুগজীবনেরও সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্দেশ না করে পারিনি। তার কারণ শিবনাথের সাহিত্য-সাধনা, আমি পূর্বেই ইঙ্গিত করেছি, তাঁর সমকালের সমাজ ও ধর্মভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুতপক্ষে, তাঁর সাহিত্য সাধনা এবং ধর্ম ও কর্ম-সাধনা পরস্পরের পরিপূরক। তাই একেকে চিনতে হলে অপরকে বাদ দেওয়া চলে না। তবে শিবনাথের সাহিত্য-সাধনার আলোচনাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর জীবনের পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করার চেষ্টা করেছি। তাতে যেটুকু ফাঁক থেকে গেছে তা পূর্ণ করার জন্যেই পরিশিষ্টে ব্রাহ্মসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজনা করেছি। আশাকরি এই আলোচনার ফলে যুগজীবনের পটভূমিকায় শিবনাথের সাহিত্য-সাধনার স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ইউ. জি. সি. বৃত্তি লাভ করে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ও আমার পূজনীয় শিক্ষক ডঃ জীবেন্দ্রবিনোদ সিংহরায় মহাশয়ের অধীনে এই গবেষণাকার্য সম্পাদন করেছি। তার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা ও আমার গবেষণা-উপদেষ্টাকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। গবেষণাসূত্রে নানা ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করেছি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী সুজাতা ভট্টাচার্য আমাকে শিবনাথের অপ্রকাশিত কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপিটি ও শিবনাথের হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকাটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। এগুলি না পেলে গবেষণার একাংশ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এছাড়া কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, শিবনাথের পুত্রবধূ অবন্তী দেবী কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাতন সংবাদপত্রের নির্বাচিত অংশ (কাটিং) ইত্যাদি দিয়ে আমার প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আমাকে সাধ্যমতো সহায়তা করেছেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর সংগৃহীত অবলাবান্ধব পত্রিকার একটি সংখ্যা আমাকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই পত্রিকাটি বর্তমানে একান্তই দুষ্প্রাপ্য—এমন কি অপ্রাপ্য বললেও অত্যুক্তি

করা হবে না। এই পত্রিকাটির ব্যবহার পূর্বে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নাই। এছাড়া কয়েকটি পুস্তকের সন্ধান, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত শাস্ত্রী মহাশয়ের নানা রচনার সন্ধান এবং বহু মূল্যবান উপদেশ তিনি দিয়েছেন। অবলাবান্ধব-সম্পাদক স্বনামখ্যাত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র সদ্যোগত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও নানা আকরগ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন, শিবনাথের জীবনের নানা অজানা কাহিনী তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। দুঃখ রয়ে গেল, বইটি তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সহায়তা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের অপ্রকাশিত ডায়েরীগুলি তাঁরই অনুগ্রহে পেয়েছি। অন্যান্য বহু ব্যাপারেও তিনি আমাকে মূল্যবান উপদেশাদি দিয়েছেন। গ্রন্থ প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য। মজিলপুর নিবাসী শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ('বাংলার লৌকিক দেবতা' নামক রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থের লেখক) মহাশয় স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে শাস্ত্রী মহাশয় সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য আমাকে জানান। রাম-মোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুরথ চক্রবর্তী, শ্রীবিনয় ঘোষ, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ ভবতোষ দত্ত, ডঃ বিজিতকুমার দত্ত, শিবনাথের একান্ত সচিব শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ যূথিকা বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে আমাকে নানা উপদেশ পরামর্শাদি দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমদর্শী' পত্রিকার সম্পূর্ণ ফাইলটি আমাকে অনুগ্রহ করে দেখতে দিয়েছেন। তিনি আমাকে গবেষণার ব্যাপারে নানা নির্দেশ দিয়েও অনুগৃহীত করেছেন। বর্ধমান রাজকলেজের অধ্যাপক আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীকালীপদ সিংহ মহাশয় আমাকে শিবনাথের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাসগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। শ্রীমতী মীরা সান্যাল (শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা) কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র ও শিশুপাঠ্য কবিতা ব্যবহারে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমার শিল্পী-বন্ধু দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খুল্লতাত অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষ আমার নিত্য প্রেরণাস্থল। আমি তাঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধুবর ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অপেক্ষা রাখেন না। শ্রীমতী সুব্রতার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যতীত নানা গ্রন্থাগার থেকে আমি প্রভূত উপকার লাভ করেছি। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশে'র সমস্ত সংখ্যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এর মধ্যে শিবনাথের জন্মস্থান ও মাতুলালয় চাংড়িপোতা গ্রামস্থ বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে 'সোমপ্রকাশে'র সংগ্রহ সর্বাধিক। এখানে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আমাকে পড়াশুনোর ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেছেন। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, বর্ধমান রাজকলেজ লাইব্রেরী, উদয়চাঁদ সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগারের কর্তৃপক্ষ সমূহকে পড়াশুনায় সাহায্য করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে গবেষণা-নিবন্ধের পরীক্ষকদের আমার প্রণাম জানাই। ডঃ জীবেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়, ডঃ ভবতোষ দত্ত ও ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের কাছে আমি আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

আশাকরি মুদ্রণ-জনিত প্রমাদগুলি পাঠকের ক্ষমাগণ্য হবে।

শ্রীপ্রণবকুমার মিত্র, এম. এ., বি. টি. নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

বর্ধমান
বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৩৭১।

বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

সাহিত্য-সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী



শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৯১৪ সালে)

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবনভাষ্য

প্রথম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পারিবারিক ইতিহাস

একটি ফুল ফুটে ওঠে তার সমগ্র পারিপার্শ্বিকতা ও আত্মশক্তির বলে। যাঁরা যুগের বিশিষ্ট চরিত্ররূপে প্রতিভাত হন, তাঁদের জীবনেও এই পারিপার্শ্বিকতা ও আত্মশক্তির ক্রিয়া সমান থাকে। তাঁরা যেমন যুগের ইতিহাস রচনা করে থাকেন তাঁদের জীবনচর্যা দিয়ে, তেমনি যুগও তাঁদের সৃষ্টি করে থাকে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন উনিশ শতক ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের এক বিশিষ্ট মনীষী। তাঁর জীবন ও সাধনা উনিশ শতকের ধর্মান্দোলন, সমাজোন্নয়ন এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে। অন্যদিকে সমকালের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি, নানাবিধ ঘটনাধারা, পারিবারিক আচার-বিধি ইত্যাদির দ্বারা তাঁর জীবনও বিচিত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

মানুষের জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে তার পারিবারিক পরিবেশ যথেষ্ট ক্রিয়াশীল থাকে। এই পরিবেশ প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় প্রকারই হতে পারে।[১] তবে প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে চরিত্রের যে বিকাশ ঘটে, তার মূল্য অনেকখানি। শিবনাথের জীবনে তাঁর পরিবারের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাব প্রায় সমান্তরাল ভাবেই কার্যকর হয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' ও হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকায়[২] তাঁর পূর্বপুরুষের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা থেকে তিনি অধস্তন নবম পুরুষ। শিবনাথের

১। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ তাঁর জীবন বিকাশের পক্ষে অনুকূল হয়েছিল। দ্রষ্টব্য, 'আত্মপরিচয়', পঞ্চম অধ্যায়।

২। এই অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকাটি আমি শিবনাথের পৌত্র শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে পেয়েছি।

পিতৃভূমি কলকাতার প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত মজিলপুর নামক গ্রাম। 'আত্মচরিত' থেকে আরও জানতে পেরেছি যে, তাঁরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যজন, যাজন ও সংস্কৃত চর্চা ছিল এঁদের বৃত্তি। সুতরাং একটা আত্ম-মর্যাদার ভাব এই বংশে বরাবরই ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মজিলপুরের মত ক্ষুদ্র গ্রামে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ১০।১২টি টোল-চতুষ্পাঠী ছিল।[১] শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারেরও একটি টোল ছিল। বিদ্যাশিক্ষার এই বিস্তৃতি দেখে সে সময়ের নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা মজিলপুরকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ আখ্যায় ভূষিত করেন।[২]

শুধুমাত্র স্বীয় বংশ মধ্যেই নয়, সমগ্র মজিলপুরেই শিবনাথের আবির্ভাব-কালে শিক্ষার একটা আবহাওয়া ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। গ্রামের জমিদার দত্ত-বংশীয়গণের অবদান এ ব্যাপারে কম ছিল না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে ঐ গ্রামে একটি মডেল স্কুল (আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়) স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয় 'বিদ্যাবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার ছিল, তাতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ইত্যাদি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হত।[৩] তাছাড়া গ্রামের উন্নয়ন কর্মে নিযুক্ত কয়েকজন যুবক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'মজিলপুর পত্রিকা'[৪] নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যা-বিলাসিনী সভা'র একটি অনুষ্ঠান থেকেই মজিলপুরে যথার্থ ব্রাহ্ম প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়।

আরও একটি ঘটনা লক্ষ্য করার মত। শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যই ঐ বংশের প্রথম রাজ-কর্মচারী। পুরনো বৃত্তির রক্ষণশীলতাকে এইভাবে বর্জন করায় অবশ্য তাঁকে আত্মীয়মহলে খুবই অপ্রিয় হতে হয়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্বপুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা, পিতার স্বাধীনতার প্রতি

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত। (সিগনেট সংস্করণ), ১৯৫৯, পৃঃ ১২।

২। হেমলতা দেবী, শিবনাথজীবনী (১৯২০), পৃঃ ৭।

৩। তদেব, পৃঃ ৯।

৪। 'কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে মজিলপুর পত্রিকা নামে এক পত্র প্রকাশ পাইয়াছে।'—'সম্বাদ ভাস্কর', ২০এ ডিসেম্বর ১৮৫৬ সংখ্যা।

আকর্ষণ ও গ্রামস্থ যুবকবৃন্দের কর্মপদ্ধতির ক্রমসংস্কৃত আবহাওয়ায় শিবনাথের বাল্য-জীবন আরম্ভ হয়েছিল।

'আত্মচরিতে' শিবনাথ তাঁর পূর্বপুরুষগণের কারও কারও নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয় পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে আলোচনা করে শিবনাথের উপরে এঁদের চরিত্রের নানা প্রভাবের কথা উল্লেখ করছি।

প্রপিতামহ ॥

প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার যখন পরলোকগমন করেন, তখন শিবনাথের বয়স বার ছিল।[১] অর্থাৎ রামজয়ের চরিত্রের সর্ববিধ প্রভাব তাঁর উপর পড়ে নি। শিবনাথের বাল্যকালে তিনি অন্ধ, বধির ও অসমর্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অন্তরে তাঁর ধর্মভাব ও সাধননিষ্ঠা এতই বেশী ছিল যে, শিবনাথ-জননী গোলোকমণি দেবী তাঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। শিবনাথ এই ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিটির আদরের 'বাবা' ছিলেন। শাক্তসাধক রামজয় পূজার্চনায় দীর্ঘসময় অতিবাহিত করে শেষে করতালি দিয়ে যখন নৃত্য করতেন, শিবনাথ তখন তাঁর 'পো'-এর নৃত্য-সঙ্গী হতেন। শিবনাথ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, 'মা প্রপিতামহদেবকে আমার ধর্ম শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন…।'[২] ধর্মোপদেশ শুনিয়ে, জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিখিয়ে, দেবতাদের স্তবাদি কণ্ঠস্থ করিয়ে রামজয় শিবনাথের অন্তরে ধর্মভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া সেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর ছিল যে, তাঁর কাছে বহুজনই শাস্ত্রের 'পাঁতি' নিতে আসতেন। শিবনাথ প্রপিতামহের মত দীর্ঘজীবী না হলেও তাঁর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

পিতামহ। পিতামহী ॥

সাক্ষাৎভাবে পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য ও পিতামহী লক্ষ্মীদেবীর প্রভাব শিবনাথের জীবনে পড়েনি। কারণ শিবনাথের জন্মের বহু পূর্বে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা উভয়েই পরলোক গমন করেন।

১। Hemchandra Sarkar, Shivanath Sastri (1929) p. 2.

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৩৯।

পিতা ॥

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যের বর্ণনা করতে গিয়ে হেমচন্দ্র সরকার যা বলেছেন, তা তাঁর যথার্থ পরিচয় বলে আমরা উদ্ধৃত করছি। 'Harananda Bhattacharya was a short, thin, hot-tempered man who had a high sense of honour and self-respect. He was a typical Brahmin, simple, stern, proud and noble-minded, scrupulously honest and absolutely fearless.'[১] স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে এঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। পত্নী গোলোকমণি দেবীকে তিনি জ্ঞাতিবর্গের প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে পাঠশিক্ষা দিতেন। স্বীয় কন্যাদ্বয়কে গ্রামস্থ ব্রাহ্ম-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) পাঠিয়েছিলেন। তাঁর একগুঁয়েমি স্বভাবের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন—যার কিছুটা শিবনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। সত্যনিষ্ঠা তাঁর প্রবাদস্থলীয় ছিল। সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।[২] স্বদেশী আন্দোলনের সময় মজিলপুরের এক সভায় অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দানের পর তিনি একজন মুসলমানকে আলিঙ্গন করেন। ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অতুাচ্চ। পশুকুলের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক প্রীতি শিবনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। পিতৃ-চরিত্রের মূল্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শিবনাথ অঙ্গীকার করেছেন, 'শৈশব হইতে ঐ তেজস্বী অধর্মবিদ্বেষী ও সত্যানুরাগী মানুষের শাসনাধীনে না থাকিলে আমার চরিত্র গঠিত হইত না।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তিনি মুখে আমাদিগকে কখনো নীতির উপদেশ দেন নাই,·· কিন্তু তাঁহাতে জীবননীতি দেখিয়াছি।'[৩] ঋণমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর যে সংকল্প হরানন্দকে কিম্বদন্তীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, শিবনাথের জীবনে সেই গুণের প্রভাবও ছিল সমধিক।

মাতামহ ॥

মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। অসাধারণ মিতব্যয়িতার গুণে তিনি স্বগ্রামে একটি পাকা দোতলা বাড়ী নির্মাণ করেন। সে যুগের

১। Hemchandra Sarkar, Shivanath Sastri, p. 2.

২। হেমলতা দেবী, শিবনাথজীবনী, দ্রঃ, হারাণ চন্দ্র রক্ষিতের বিবরণী, পৃঃ ৪৩।৪৪ ॥

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৬৫ ॥

প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদনা কার্যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে সাহায্য করিতেন।[১]

মাতামহী ॥

জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই শিবনাথ মাতামহীর স্নেহ সর্বাধিক পরিমাণে ভোগ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই স্নেহের কথা স্মরণ করলেই শিবনাথের চক্ষু সজল হয়ে উঠত। দানে মুক্ত-হস্তা, স্বভাবতঃ স্নেহশীলা, কোমলপ্রাণা ও ধর্মভীরু এই মহিলাটির উদ্দেশ্যে শিবনাথের প্রথম পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বলতেন, 'এ জীবনে অনেক মানুষ দেখিলাম, আমার দিদিশাশুড়ীর মত অত বড় প্রাণ আর কারো দেখি নাই।'[২] নারীজাতির প্রতি শিবনাথ যে এত শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিলেন—মাতামহীর চরিত্রই ছিল তার অন্যতম প্রেরণাস্থল।

মাতামহীর উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি ও মাতামহের মিতব্যয়িতা শিবনাথের উত্তর জীবনে সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মাতুল ॥

মাতৃকুলের যে ব্যক্তিটি শিবনাথের জীবনের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি তাঁর মাতুল, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

প্রচণ্ড রক্ষণশীল হয়েও তিনি সত্যনিষ্ঠার খাতিরে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। এই দ্বারকানাথের মাধ্যমেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শিবনাথ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।[৩] পিতার সঙ্গে শিবনাথের যখনই বিরোধ ঘটেছে, সত্য ও ন্যায়ের পূজারী দ্বারকানাথ ভাগিনেয়কেই সমর্থন করেছেন। দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশে'ই শিবনাথের কাব্যপ্রতিভা প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় এবং ঐ পত্রিকা-সম্পাদনাতেই শিবনাথের সাংবাদিক জীবনের যথার্থ সূত্রপাত ঘটে। মিতবাক্, অসাধারণ পরিশ্রমী, বিদ্যোৎসাহী,

১। 'শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আমারদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু।'—সংবাদ প্রভাকর, ২রা বৈশাখ, ১২৫৪ সংখ্যা।

২। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ৫০।

৩। অবশ্য তাঁর পিতা হরানন্দের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট পরিচয় ছিল।

আদর্শ শিক্ষক, তেজস্বী, দেশপ্রেমিক মাতুলের প্রায় সকল প্রকার গুণই শিবনাথের জীবনে কিছু না কিছু পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছিল।

মাতা ॥

আত্মমর্যাদাবোধ মাতা গোলোকমণি দেবীর প্রধান গুণ ছিল। ননদের অত্যাচারে গোলোকমণি অতিষ্ঠ হয়ে উঠে একমাত্র পুত্রের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করায় শিবনাথের স্বাস্থ্য বাল্যকাল থেকে খুবই রুগ্ন হয়ে পড়ে। মুখে তার প্রতিবাদ না করলেও, ননদবিদায়ের পর একাকিনী গোলোকমণি দেবী একমাত্র আত্মমর্যাদাবোধের বলেই সংসার প্রতিপালনে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ রক্ষণশীল ছিলেন, পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণে তিনি প্রভূত বেদনা পেয়েছিলেন, তবুও তাঁর পুত্রস্নেহ ছিল অপরিসীম। তিনি শিবনাথের আশ্রয়-দাত্রী হতে পারেননি বটে, তবে পুত্রকে নানাভাবে স্নেহ করে এসেছেন। বাল্যকালে শিবনাথের রোগমুক্তির কামনায় বুকের রক্ত দানেও কুণ্ঠিতা ছিলেন না। সুরুচি ও শিক্ষার প্রথম পাঠ শিবনাথ মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন।

আত্মীয়-স্বজনের গুণাবলীর অধিকাংশ শিবনাথ স্বীয় জীবনে অঙ্গীকার করেছিলেন। বিমিশ্র এই নানাগুণের অধিকারী শিবনাথের জীবনও তাই বিচিত্র কর্মদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ তাঁর মনোজীবন গঠনে এঁদের প্রভাব ছিল অনতিক্রমণীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

বাংলা ১২৫০ সালের উনিশে মাঘ, ইংরেজি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের একত্রিশে জানুয়ারি রবিবার মাতুলালয় চাংড়িপোতা (চব্বিশ পরগণা) গ্রামে শিবনাথের জন্ম হয়। বহুদিন পর সেই বাড়িতে শিশুর আবির্ভাব সাড়ম্বরে সমাদৃত হয়। মাতুল দ্বারকানাথ নবজাতকের প্রশস্ত ললাট দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'এ ছেলের যে কপাল দেখছি, বেঁচে থাকলে বড়লোক হবে।'[১] পুত্রের ছ'মাস বয়সে তাঁকে নিয়ে গোলোকমণি দেবী শ্বশুরালয় মজিলপুরে এলেন। সেখানে তাঁকে প্রপিতামহ অতিবৃদ্ধ রামজয় সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, কিন্তু শিশু শিবনাথ জ্যেষ্ঠা পিতৃস্বসা আনন্দময়ীর ঈর্ষাবহ্নি থেকে মুক্তি পেলেন না। তাতে গোলোকমণি দেবীও নিতান্ত রুষ্ট হয়ে পুত্রের যত্ন নিলেন না। মাতার উপেক্ষায় শৈশব থেকেই শিবনাথ রুগ্ন হয়ে পড়লেন।[২] এই রুগ্নাবস্থার কথা বড় হয়ে তিনি বন্ধু-বান্ধবদেরও বলতেন।[৩]

ক্রমে তাঁর বয়স চার বছর হল। ভবিষ্যতে তিনি যে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করবেন, এমন ইঙ্গিত এই শৈশব থেকেই শিবনাথ দিয়েছিলেন। শিবনাথের পরিবারে এই নিয়ম ছিল যে, গৃহদেবতাগণকে নিবেদন না করে কেউ আহার গ্রহণ করতে পাবেন না। কিন্তু শিবনাথ অতি শৈশবেই ঠাকুরের 'উচ্ছিষ্ট' গ্রহণ করবেন না বলে ধনুর্ভঙ্গপণ করেছিলেন। এজন্যে তাঁকে নিপীড়নও কম সহ্য করতে হয় নি।

১ ॥ শিক্ষাজীবন : গ্রামে ॥ (১৮৫২-৫৬) ॥

পঞ্চমবর্ষে শিবনাথের হাতে খড়ি হয়। মজিলপুরের বোসপাড়ায় বসুদের বাড়ীতে বর্ধমানাগত ('বর্ধমেনে') এক পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁকে

১। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ: ৫২।

২। তদেব, পৃ: ৫৩।

৩। '...he used to tell us ever and anon, the cause of the frequent attacks of illness which, in his latter days, undermined his health and eventually carried him away'—Sitanath Tattvabhusan, Pandit Shivanath Sastri, (1920), p. 3-4.

ভর্তি করা হল। মায়ের ব্যক্তিগত যত্নে ও অসাধারণ মেধার সাহায্যে শিবনাথ লেখাপড়ায় উন্নতি করতে লাগলেন। বাল্যকাল থেকেই পড়াশুনো ও পড়ার সাজ-সরঞ্জামের উপর তাঁর প্রখর যত্ন ছিল। পাঠশালার নির্দিষ্ট পাঠক্রম ছাড়াও তিনি বাড়ীতে রামায়ণ ইত্যাদিও শিখেছিলেন। 'মা প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলা রামায়ণ পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে শিখাইতেন।'[১] কাজেই সমবয়সী সহপাঠীগণের চেয়ে শিবনাথের প্রতিভা অধিকতর প্রকাশ পেয়েছিল। শৈশবের এই গভীর পাঠানুরক্তির অনুসরণ তাঁর শেষ জীবনেও আমরা লক্ষ্য করি।

কিছুদিন এখানে অধ্যয়নের পর গুরুমশাই-এর অশালীন চাপল্যবশতঃ শিবনাথের মা তাঁকে পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। 'সেই আমার পাঠশালে যাওয়া শেষ।'[২]

গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে মজিলপুরে যে আদর্শ বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এবারে শিবনাথ সেখানে ভর্তি হলেন। সেখানে তিনি 'স্কুল বুক সোসাইটি' প্রকাশিত 'বর্ণমালা' এবং মদনমোহন তর্কলঙ্কারের নবপ্রকাশিত 'শিশুশিক্ষা' পড়তে লাগলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি শিবনাথ কলকাতায় পড়াশুনোর জন্যে আসেন। এই ন' বছর বয়সের মধ্যে শিবনাথের মধ্যে যে সব গুণ ফুটে উঠেছিল, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পশুপ্রীতি॥ শিবনাথের উপন্যাসসমূহের যে চরিত্রকে পাঠক প্রায়শঃ লক্ষ্য করে থাকেন, সেটি হচ্ছে কোন গৃহপালিত জন্তু বা পাখী। শিশুকাল থেকেই শিবনাথ তাদের ভক্ত ছিলেন। ঘরের রূপী বেড়াল তাঁর নিত্যদিনের শয্যাসঙ্গিনী ছিল। পিঁপড়ের 'কথা' শোনার জন্য তিনি বহু সময় ব্যয় করিতেন। নবপরিণীতা বধূর চেয়ে 'রবা' কুকুরের প্রতি তিনি অধিক আকর্ষণ অনুভব করতেন। আর 'টুনো' নামে শালিখ পাখীটিকে উড়িয়ে দেওয়ার অপরাধে তিনি পত্নীকে পর্যন্ত বিদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[৩]

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২০।
২। তদেব, পৃঃ ২০।
৩। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ৫০।

জীবজন্তুর প্রতি এই প্রীতি শিবনাথের প্রকৃতি প্রেমিক করে তুলেছিল। তাছাড়া শিবনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এর মধ্য দিয়ে তাঁর 'অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি, অখণ্ড মনোযোগ ও তন্ময়তা গড়ে উঠেছিল।[১]

সুরুচি॥ পল্লীগ্রামের বালকদের হীনরুচি থেকে শিবনাথের মা তাকে রক্ষা করতেন। এমনকি এ ব্যাপারে তিনি নির্মমও হয়ে উঠতেন। মায়ের এই রুচিভাব শিবনাথকে যেমন রুচিমান্ করে তুলেছিল, তেমনি কলকাতায় শিক্ষা জীবনে তাঁকে যে ভয়ানক কুসঙ্গের মধ্যে থাকতে হয়েছিল, তার রক্ষাকবচও ছিল।

কৌতুক-প্রবণতা॥ বাল্যকাল থেকেই শিবনাথ আমুদে ছিলেন। পাড়ায় রামায়ণ গান শুনে তার অনুকরণে একদল বাল্যসঙ্গী নিয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে রামায়ণ গান গাইতে শুরু করেন। নির্দোষ সরল শিবনাথের এই আমোদ-প্রবণতার কথা প্রসঙ্গে তাঁর সহপাঠী দীননাথ দত্ত লিখেছেন,[২] 'শিবনাথ বাল্যকালে বড় আমোদপ্রিয় ছিলেন, একটা আমোদ করবার কিছু পেলেই ছুটে যেতেন।'

বাক্-পটুতা॥ বাক্-পটুতা শিবনাথের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। শৈশবের এই বাক্-পটুতাই সম্ভবতঃ উত্তরকালে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে পরিচিত করেছিল। বাল্যকালে এই বাচালতার জন্য তাঁকে গঞ্জনাও কম সহ্য করতে হয়নি, তাঁর তো একটা ডাকনামই ছিল 'শিবে জ্যেঠা'।

২॥ শিক্ষাজীবন : কলকাতায়॥ (১৮৫৬-৭২)॥

চিরদিনের নারীস্নেহ-বুভুক্ষু শিবনাথ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে কলকাতার চাঁপাতলায় সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের 'মহাপ্রভুর বাড়ী'-তে মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের নারীবিবর্জিত বাসায় নির্বাসিত হলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ শিক্ষাজীবন সুরু হয়ে গেল নিদারুণ কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৫২।
২। দ্রষ্টব্য, হেমলতাদেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ৬৩

জীবনে তিনি যে এক-ব্রহ্মের তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন, সেই সাধ্যের সাধনস্থলের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটেছিল এই কলকাতাতে বসবাস কালেই।

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, এককালে সংস্কৃত কলেজের পরম মেধাবী ছাত্র। বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত তিনিও 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে, যে যুগ অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে, তাতে শুধুমাত্র সংস্কৃত শিখে উদর পোষণ সম্ভব নয়। সরকারী স্কুলে পণ্ডিতি করে তাঁর মাসিক উপার্জন ছিল সাকুল্যে পঁচিশ টাকা। সেই কারণে হরানন্দ পুত্রকে ইংরেজি শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পুত্রকে কলকাতায় এনে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। একটা প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই আমাদের মনে জাগে যে, উনিশ শতকের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। অথচ শিবনাথকে ভর্তি করা হল সংস্কৃত কলেজে। আসলে হরানন্দের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে ডেভিড্ হেয়ারের স্কুলেই ভর্তি করার। কিন্তু প্রধানতঃ দুটি কারণে তা সম্ভব হয়নি। এক, ডেভিড্ হেয়ারে পড়ানো ব্যয়সাধ্য—পঁচিশ টাকা মাইনের পণ্ডিতের পক্ষে তা জোগানো অসম্ভব ছিল। দুই, সংস্কৃত কলেজে ছিলেন তাঁর গৌরবান্বিত বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র,—তাঁর অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না হরানন্দ। তাছাড়া সে সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি পঠন-পাঠনের জন্য একটা বিভাগ খুলেছিলেন। আর শ্যালক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (যাঁর বাসাতে শিবনাথ ছিলেন) ছিলেন ঐ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। সুতরাং শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে গেলেন।

সংস্কৃত কলেজে পাঠের ফলে শিবনাথের জীবন অন্ততঃ তিনটি দিক থেকে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

প্রথমতঃ, উত্তরজীবনে শিবনাথকে যে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছিল, তা' সহ্য করার মতো শক্তি সঞ্চয়ের ভিত্তি এখানেই গড়ে উঠেছিল। কলকাতার বিভিন্ন বাসায় বাসকালে রান্নাবান্না ক'রে, তৈজসপত্রাদি পরিষ্কার ক'রে, সুদূর ভবানীপুর থেকে হেঁটে সংস্কৃত কলেজে এসে এবং পিতার নির্মম প্রহার সহ্য করে তাঁকে পড়াশুনো করতে হয়েছে। তদুপরি তাঁকে এমন বাসায় থাকতে হত, যার বাসিন্দারা প্রত্যেকেই তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, এবং যাদের রুচিবোধ বলে কিছু ছিল না। মায়ের

সুশিক্ষা ও আত্মগত প্রতিরোধশক্তি বলে সেই ক্ষতিকর দীন পরিবেশের মালিন্যকে অতিক্রম করে তিনি নিজেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, একদিকে যেমন তাঁকে কুসঙ্গীগণের মধ্যে বাস করতে হয়েছিল, তেমনি কয়েকটি আদর্শ চরিত্রের স্নেহ-সান্নিধ্য শিবনাথের শিশুমনকে উন্নত ও ভবিষ্যৎ জীবনকে দৃঢ়রূপে গঠন করতে সাহায্য করেছিল। এঁদের মধ্যে দুজন সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং দ্বিতীয়জন, স্বীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। দ্বারকানাথের সঙ্গে গভীর বন্ধুতাসূত্রে বিদ্যাসাগর প্রায়ই এই বাসায় আসতেন এবং স্ফীতোদর শিবনাথকে পেট টিপে আদর জানাতেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'তিনি তখন আমাদের আদর্শ পুরুষ।'[১] বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে শিবনাথের মনের পুরনো সংস্কার সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছিল। ছাত্রাবস্থাতেই শিবনাথ বিধবাবিবাহ আন্দোলনে মেতে উঠেছিলেন। সে কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'His repeated visits (to our residence) made our lodging a hot-bed of widow remarriage agitation, and what I swallowed at home, I disgorged at the College and this gave rise to the heated discussions amongst my classmates'.[২] শিবনাথ বিদ্যাসাগরের এতখানি প্রীতির অধিকারী হয়েছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু কেউ সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বলতেন, 'ওকে বুকে রাখলে বুক ব্যথা করে না।'[৩] মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করলেও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দ্বারকানাথের সঙ্গে শিবনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নি। কলকাতায় বাসকালে এই সুযোগ ঘটে। নেশাদ্রব্যে অনাসক্তি, পাঠে গভীরচিত্ততা, বাক্-সংযম ইত্যাদি গুণগুলি শিবনাথ মাতুলের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।[৪]

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৪৪।

২। Shivanath Sastri, Pandit Iswarchandra Vidyasagar, Men I Have Seen (1966), p. 3.

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৮৩।

৪। এ-সম্পর্কে 'সংক্ষিপ্ত পারিবারিক ইতিহাসে' আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী,[১] শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী,[২] উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,[৩] যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মহিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেও শিবনাথ নানাভাবে উপকৃত হন।

কলকাতা বাসকালে ব্যক্তিচরিত্রের প্রভাব ব্যতীত, কতকগুলি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এক, ১৮৫৬[৪] খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসভবনে। শিবনাথ এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।[৫] শিবনাথের মনে এর প্রভাব দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল।[৬]

দুই, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের একটি সিঁড়ি নিয়ে দু'দল ছাত্রের বিবাদ সম্পর্কে তৎকালীন অধ্যক্ষ ঈ. বি, কাউয়েল সাহেব তদন্ত করতে আসেন। একমাত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য সত্যনিষ্ঠার অনুরোধে যথার্থ ঘটনাটি বিবৃত করেছিলেন।

তিন, আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর প্রবল। তাই তৎকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শক উড্রো সাহেবের ঘরে চটিপায়ে ঢুকলে সাহেব যখন তাঁকে চটি খুলে রাখার নির্দেশ দেন, তখন শিবনাথ এই আদর্শের যুক্তিযুক্ততা খুঁজে না পেয়ে তার প্রতিবাদ করেন। দ্বারকানাথ একথা শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন[৭] এবং 'সোমপ্রকাশে' এই ঘটনাটি প্রকাশ করেছিলেন।[৮]

১। 'তাঁহাতে যে সাধুতা ও সদাশয়তা দেখিয়াছি তাহা কখনো ভুলিবার নহে।'—আত্মচরিত, পৃঃ ৫৭।

২। 'এঁকেই শিবনাথ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ' উৎসর্গ করেন।

৩। ইনি শিবনাথকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচিত করার প্রয়াস পান।

৪। ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬।

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৬৪।

৬। 'শৈশবাবধি আমি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা বিবাহের পক্ষ।'—আত্মচরিত পৃঃ ৭৬।

৭। 'তুমি আমার ভাগিনার মত কাজ করিয়াছ'—আত্মচরিত, পৃঃ ৬৪।

৮। শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখেছেন যে, দ্বারকানাথ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু 'সোমপ্রকাশের' ১০ই অগ্রহায়ণ ১২৭০ সংখ্যার ৪৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'ফলনা সাহেব ও চটিজুতা' শীর্ষক পত্রটির রচয়িতা 'চটিপায় ব্রাহ্মণ'—শিবনাথেরই রচনা বলে অনুমান করি।

চার, এই ঘটনাটি অবশ্য তাঁর গ্রামে ঘটে। সম্ভবত: ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রিয়নাথ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি মজিলপুরে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি চলে গেলে বিদ্যালয়টির পরিচালন ভার গ্রামস্থ ব্রাহ্মভাবাপন্ন যুবকেরা গ্রহণ করেন। মজিলপুরের জমিদারগণ এর বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত আদালতে জমিদার পক্ষ পরাজিত হন। শিবনাথের চোখে এই ব্রাহ্মযুবকগণ আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। ফলে শৈশবেই শিবনাথের মধ্যে একটা ব্রাহ্মভাব পরোক্ষে প্রবিষ্ট হয়েছিল। এই সময়ে শিবনাথের প্রথমবার বিবাহ হয়। বিবাহ-সম্বন্ধ কুলপ্রথা অনুযায়ী শিবনাথের আড়াই বছর বয়সে স্থির হয়েছিল। শিবনাথের বয়স তখনও তের বছর উত্তীর্ণ হয়নি এবং প্রসন্নময়ী দেবীর বয়স তখন অনধিক দশ বছর।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মন ঈশ্বরাভিমুখী হওয়ায় শিবনাথের মন শান্ত ছিল। ফলে তাঁর এ সময়ের পাঠ্যজীবন সরস হয়ে উঠেছিল। পড়াশুনোয় ভাল হওয়া সত্ত্বেও এর পূর্বে সহপাঠী গঙ্গাধর ক্লাশে 'ফার্স্ট' হয়েছিল। কিন্তু ধর্মভাব এবারে তাঁর জীবনে এমন প্রেরণা বহন করে এনেছিল যে, এর পর থেকে প্রতি বছরই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতে লাগলেন। ধর্মজীবনের মত পাঠ্যজীবনেও আত্মনিগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। অঙ্ক ইত্যাদি যে সব বিষয়ে তাঁর মনোযোগ অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সেই সকল বিষয়েও তিনি আশাতীত ফললাভ করতে লাগলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত প্রবেশিকা (এন্‌ট্রান্স) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে 'সেকেণ্ড গ্রেড্ স্কলারশিপ' পেলেন। কলেজেও প্রথম হলেন। এই পরীক্ষার পূর্বে দ্বিতীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে শিবনাথের পাঠ্যজীবন কেমন আলোড়িত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে কন্যা হেমলতা লিখেছেন, 'শুনিয়াছি ক্লাসে বসিয়া সম্মুখে বই ধরিয়া তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতেন।'[১]

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. (বা এফ. এ.) পরীক্ষাদানের পূর্বে শিবনাথ তাঁর এক বন্ধুর বিধবাবিবাহের ব্যাপারে এমন গভীর ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ ভেবে কলেজ কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী শিবনাথকে ডেকে

১। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ: ৭৮।

সতর্ক করে দিলেন। শিবনাথ সহসা বিনামেঘে বজ্রপাত হতে দেখলেন। বিশেষ করে স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে গেলে বন্ধুপত্নী মহালক্ষ্মীকে তাঁর নিদারুণ অসুস্থতা থেকে বাঁচানো অসম্ভব হবে। পরহিতৈষণা প্রবৃত্তি তাঁকে সচেতন করে তুলল। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কাছে অনুমতি পেলেন ক্লাসে উপস্থিত না থেকেও তিনি পরীক্ষা দিতে পারবেন। পূর্বতন আশ্রয়দাতা মহেশচন্দ্র চৌধুরীর ভবানীপুরের বাসভবনের একটি কক্ষে শিবনাথ অধ্যয়ন তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। 'প্রাতে একবার আহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধঘণ্টার জন্য যাইতাম।···এই আড়াই মাসের মধ্যে শয্যাতে যাই নাই।'[১]

নিম্নবর্ণিত তালিকাটি থেকে এই সময় তাঁর পাঠ্যসময় জানা যাবে :—

অঙ্ক দু ঘণ্টা পড়া চার ঘণ্টা কষা	ইতিহাস	ইংরেজী	সংস্কৃত	লজিক	সর্বমোট
৬ ঘণ্টা	৬ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	১৮ ঘণ্টা

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল তখন দেখা গেল, শিবনাথ পরীক্ষায় নিম্ন অঙ্কের বৃত্তিগুলি পেয়েছেন :—

এক, University first grade scholarship— Rs. 32/-

দুই, First in English and Sanskrit in University—
Duff scholarship— Rs. 15/-

তিন, First in Sanskrit College— Rs. 12/-

সর্বমোট ৫৯৲ উনষাট টাকা।

পরিশ্রমের একটা মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু মাত্র আড়াই মাসের পরিশ্রমে অন্য কারও পক্ষে এই আশাতীত ফল সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ছিল—একথা বলা চলে। 'সকল যন্ত্র অপেক্ষা ধী-যন্ত্র' শ্রেষ্ঠ। শিবনাথ সেই ধী-যন্ত্রের অধিকারী ছিলেন বলেই অধ্যবসায় তাঁকে এই ফল এনে

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৮০।

দিয়েছিল। এই নিদারুণ পরিশ্রমে তিনি এমনই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, কারও কারও মতে তাঁর কুষ্ঠ ব্যাধি হবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল।[১]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ বি. এ. পাশ করেন। এই সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ, পিতা কর্তৃক বর্জন ইত্যাদি সংগ্রামের মধ্যে তাঁর চিত্ত খুবই বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সংসার জীবন ও ধর্মজীবনের আলোড়নে পাঠ্যজীবন অবহেলিত হওয়ায় পরীক্ষায় তাঁকে আশানুরূপ ফল করতে দেখি না। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি উকিল হবার ইচ্ছায় তিন বছর ধরে 'ল লেকচার' শুনে রেখেছিলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। বি. এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দিকে তাঁর মন যাওয়ায় উকিল হওয়া তাঁর হল না। কেশবচন্দ্রের কর্মে তিনি আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে শিবনাথ প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করে 'শাস্ত্রী' উপাধি পান ও কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে যোগদান করেন। কলেজের পড়াশুনোর এখানেই সমাপ্তি। যদিও সারা জীবনে পাঠই ছিল তাঁর প্রধান ব্রত ছিল।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৮১।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথের ভূমিকা

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তার একটি সংখ্যায়[১] প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছে, 'প্রতি ব্রাহ্মই এক একজন ধর্মপ্রচারক।' মন্তব্যটির মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বীর কর্তব্যের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। পাঠ্যাবস্থা থেকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থেকে শিবনাথ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ্যে দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পর থেকেই শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই প্রচার-কার্য প্রচারকের বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়নি।

শিবনাথের জীবন উৎসর্গীকৃত জীবন। ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নিযুক্ত তাঁর জীবনের ধারা প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ, আচার্য-প্রচারকের মুখ্য ভূমিকা এবং দ্বিতীয়তঃ, আধ্যাত্মিক-সংস্কর্তা বা সাধকের ভূমিকা। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, তাঁর এই দ্বিবিধ ভূমিকা পরস্পর-নির্ভর। তবে একটি মনই কিভাবে প্রচারক ও সাধকের দ্বৈত ভূমিকার গ্রহণ করেছিল, তা এপ্রসঙ্গে

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রভৃতি নিয়ে যে সব আন্দোলনে শিবনাথ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) রচনা প্রসঙ্গে আমরা সেকথা আলোচনা করেছি।

৬ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র সেনের নিকট শিবনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে কবি হিসাবে সমাজে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। এবারে ধর্মজীবনে স্বাভাবিক ব্যাকুলতাহেতু অচিরেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সারির নেতারূপে পরিগণিত হন। দীক্ষাগ্রহণের কয়েকমাসের মধ্যেই শ্যামবাজার ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক উৎসব সমাগত হলে উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কাশীশ্বর মিত্রের অনুরোধে শিবনাথকে বেদী গ্রহণ করতে হয়। শিবনাথ স্বভাবতঃ লাজুক ছিলেন। বক্তৃতা করার মত সাহস ও প্রস্তুতি তখন তাঁর ছিল না।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৭৮১ শক, ১৯৯ সংখ্যা।

ঐ উৎসবে তিনি একটি লিখিত উপদেশ পাঠ করেন। একুশ বছর বয়সে এই তাঁর প্রথম আচার্যত্ব।[১] সভায় উপস্থিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে শিবনাথকে অভিনন্দন জানালেন। ঘটনাটিকে ব্রাহ্মসমাজের উৎকৃষ্ট আচার্য হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

অনতিবিলম্বে এই উপদেশ দানের সাফল্যের কথা ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখায় প্রচারিত হয়ে গেল। সিন্দুরিয়াপটি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশি মহাশয়। তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করলে উক্ত আচার্য পদ গ্রহণের জন্য শিবনাথের কাছে অনুরোধ নিয়ে এলেন ক্ষেত্রনাথ শেঠ মহাশয়। নিদারুণ সঙ্কোচের সঙ্গে শিবনাথ এক শুক্রবার সেই সমাজের উপাসনায় যোগ দিলেন। তারপর থেকে বহুদিনের জন্য তাঁকে সিন্দুরিয়াপটি সমাজের প্রথম স্থায়ী আচার্যের কাজ করতে হয়। শিবনাথ অবশ্য উত্তরকালে এই ঘটনাকে তাঁর ধর্মজীবনে প্রলোভন স্বরূপ বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ থেকে তাঁর অধ্যাত্মচর্চার সুযোগ এবং দায়িত্ববোধ গড়ে উঠেছিল। কোন জিনিষকে লঘুভাবে গ্রহণ করা শিবনাথের স্বভাববিরুদ্ধ বস্তু ছিল।[২] তদুপরি আচার্যের কর্তব্য তাঁকে গুরুতর চিন্তার সুযোগ এনে দিয়েছিল। উত্তর-জীবনে এই দায়িত্বজ্ঞানই তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে, শিক্ষাজীবনে ও সমাজসংস্কারের প্রতিটি ক্ষেত্রে বড় করে তুলেছিল। শিবনাথ স্বয়ং লিখেছেন, 'এই দায়িত্বজ্ঞানই আমাকে ফুটাইয়াছে।'[৩]

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শিবনাথ হরিনাভি থেকে ভবানীপুরে এসে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমাজ স্থাপন করলেন। স্বগৃহে অনুষ্ঠিত এই সমাজের উপাসনা অধিকাংশ দিনই শিবনাথের আচার্যত্বে পরিচালিত হত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই হল আচার্য হিসাবে শিবনাথের ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

১। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পূর্বে বি. এ. পাঠরত অবস্থায় বন্ধু উপেন দাসের বিবাহ উপলক্ষ্যেই শিবনাথ প্রথম প্রকাশ্যে উপাসনা করেন। দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৮৩।

২। 'গভীর বিষয়ে লঘুভাবে কথা বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।'— 'শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী (১৩৬৪), পৃঃ ১৫৫।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১০৪।

শিবনাথ স্বীকার করেছেন যে, 'আমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্যে আপনাকে অর্পণ করিব বলিয়াই ভারত-আশ্রমে বাস করিতে গিয়াছিলাম।'[১] এই ইচ্ছা তাঁর মনে বলবৎ না থাকলে, আমরা হয়ত শিবনাথকে একজন প্রখ্যাত আইনজীবী হিসাবে পেতাম; ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হিসাবে কখনই নয়। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই শিবনাথ কেশবচন্দ্রের ভারত-আশ্রমে যোগ দিয়ে দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে প্রচারক জীবন আরম্ভ করলেন।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে কেশবচন্দ্র 'সোসাইটি অফ থিয়েস্টিক ফ্রেণ্ডস্'-কে পুনরুজ্জীবিত করেন। এর একটি অধিবেশনে শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। সভাপতি কেশবচন্দ্র ব্যতীত আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান মিশনারি ডাল্ সাহেব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণের একটা বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, তা যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি বেগবান। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মসমাজের প্রাণের লক্ষণ। শিবনাথ শাস্ত্রী এই প্রবহমান প্রাণধারাকে প্রচারের মাধ্যমে আরও বেগবান করে তুলেছিলেন। তাঁর এই প্রচার কার্য যেমন পশ্চিমবঙ্গে, তেমনি পূর্ববঙ্গে, যেমন দক্ষিণ ভারতে, তেমনি উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। নদীজপমালাধৃত এই বিশাল ভারতের ভূখণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে শিবনাথের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের বাইরে, সুদূর ইংলণ্ডে দীর্ঘ আটমাস অতিবাহিত করে সেখানেও তিনি ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বধর্ম হিসাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

২৪ এ মে ১৮৭৮, শুক্রবার তারিখে 'ব্রাহ্মসমাজের দাস' শিবনাথ প্রথম প্রচারযাত্রা শুরু করলেন। এই দিন তিনি চন্দননগরে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়ে প্রচারে বহির্গত হন। রামপুরহাট, ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, মোকামা, মজঃফরপুর, মতিহারি, সমস্তিপুর, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে শিবনাথের মনে এই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, 'প্রচারক-জীবনই ব্রাহ্মের শ্রেষ্ঠ জীবন।'

প্রথম প্রচার যাত্রার পর কলকাতায় ফিরে এসে শিবনাথ 'ছাত্রসমাজ' স্থাপন করে দেশীয় যুবকগণকে বক্তৃতার সাহায্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রচারকর্মে লঘুভাব প্রশ্রয় পেত

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১০৯।

না। ছাত্রসমাজে তাঁর তিন ঘণ্টা ব্যাপী আবেগ ও যুক্তিপূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে অনবরত 'হিয়ার', 'হিয়ার' শব্দ দ্বারা কক্ষ পূর্ণ করতেন। প্রচারকের বাগ্মিতা এখনেই সমধিক স্ফূর্তি পেল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শিবনাথ পুনরায় দ্বিতীয় প্রচার-যাত্রায়[১] বের হলেন। ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থ নেই, ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করে প্রায় রিক্তহস্তে তিনি প্রচারযাত্রা সোৎসাহে সম্পন্ন করেন। দীর্ঘ ছয়মাস ধরে সমগ্র পশ্চিমভারতে পরিভ্রমণ করে বহুস্থানে বক্তৃতা করলেন। এই বক্তৃতাগুলির বিষয় যে সব সময়ে ধর্মকেন্দ্রিক ছিল তা নয়, পরন্তু দেশের নানা সমস্যা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিত বলে দেশের প্রসঙ্গও আলোচিত হত। যাঁরা যুগপুরুষ হন, যুগসমস্যাকে তাঁরা অবহেলা করতে পারেন না। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি—ত্রিভাষাতেই বক্তৃতাদানে তাঁর পটুত্ব ছিল সংশয়াতীত। বোম্বাই প্রার্থনা সমাজে প্রদত্ত শিবনাথের একটি বক্তৃতা শুনে হাইকোর্টের একজন ব্যবহারজীবী মন্তব্য করেছিলেন, "what could Father Remington say more.'[২] এই প্রচারকালে নবীনচন্দ্র রায় (আগ্রা), প্রকাশচন্দ্র রায় (বাঁকিপুর), নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ (বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ), ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ (ঐ), রাও সাহেব ভোলানাথ সারাভাই (আমেদাবাদ) প্রভৃতি ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে ব্যক্তিগতভাবে তিনি উপকৃত হন।

প্রচারকালে শিবনাথকে নানা বিরোধী ধর্মপ্রচারকগণের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে হত। মতিহারীতে (জুলাই, ১৮৮০) সমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে আর্যসমাজের সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর গভীর বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই বিতর্কে শিবনাথের যুক্তি ছিল অমোঘ। প্রাচীন শাস্ত্রাদির অর্থানুসরণ সম্পর্কে শিবনাথ বলেছেন যে, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য আমরা টীকাকারগণের টীকা থেকে অনুধাবন করি। কিন্তু বিভিন্ন টীকাকারের ব্যাখ্যা বিভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই কিছু পরিমাণে ভ্রান্তবুদ্ধি-সম্পন্ন। শিবনাথের যুক্তি ছিল, 'অভ্রান্ত টীকাকার

১। প্রচারচিত্র: কলিকাতা, বাঁকিপুর, আগ্রা, টুণ্ডলা, লাহোর, মুলতান, সিন্ধু, করাচি বোম্বাই, সুরাট, গুজরাট-আমেদাবাদ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, কলকাতা।

২। হেমলতা দেবীর 'শিবনাথ জীবনীতে' উদ্ধৃত। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ তারিখে শিবনাথের ডায়েরী দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৮৮-৮৯।

না দিলে শাস্ত্র দেওয়া বৃথা।'[১] ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস নাগাদ শিবনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ যথাক্রমে ঢাকা ও দার্জিলিঙ্গে প্রচারার্থে বহির্গত হন। দার্জিলিঙ্গে একটি উপাসনাগৃহের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে শিবনাথ দক্ষিণ ভারতে প্রচারকার্যের জন্য গমন করেন। দু'বার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে থেকে সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। দক্ষিণ ভারতের বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথার চরম শাসন শাস্ত্রী মহাশয়ের মনকে দারুণভাবে পীড়িত করে। তিনি সেখানে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে নানাস্থানে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বহুস্থানে এজন্যে তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। মাদ্রাজে প্রচারযাত্রা কিরূপ ফলবতী হয়েছিল তা' পি. আর. মুদলকারের ১১ই এপ্রিলের একটি লিখিত মন্তব্য পাঠে জানা যায়।[২] ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার মাদ্রাজ গমন করেন। মাদ্রাজের দেবদাসী প্রথা শিবনাথকে খুবই আঘাত দেয়। স্ত্রী-জাতির অধঃপতনে শিবনাথ স্বাভাবিকভাবেই বেদনাবোধ করতেন। এর পূর্বে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ধমান জেলার বড়বেলুন নামক একটি গ্রামে প্রচারকার্যের জন্য যান। সেখানে নগর-কীর্তনের সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীগণের অধিকাংশের মন জয় করেন। অবশ্য আহার্য দ্রব্য সংগ্রহে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। গ্রামের নারীরা তাঁকে গোপনে আহার্য দ্রব্য প্রেরণ করেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে শিবনাথ পুনর্বার ঢাকায় গমন

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৮০।

২। It is indeed with great pleasure that we record here the prolonged stay in our midst at the time of Pandit Shivanath Sastri, M.A., missionary of the Sadharan Brahmo Samaj who by his earnestness, humility, piety and other excellent qualities endeared himself to us, and owned our sympathy to such an extent that his separation could certainly be keenly felt by one and all who had the pleasure of a moment's conversation with him.'—দ্রঃ হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২১০-১১।

করেন। এই বছরেই তিনি হিমালয়ের কার্সিয়াঙ্ নামক স্থানে নির্জনে ধর্মসাধনের জন্য নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শশিভূষণ বসুর সঙ্গে গমন করেন। এখানের নির্জন সাধনা ও উপাসনায় তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে স্বচ্ছ হয়ে উঠে।[১] তাঁর এই নব উপলব্ধি সাধারণ্যে প্রচারার্থে তিনি আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, শিলং-এর সমগ্র অঞ্চল পরিভ্রমণ করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ঠিক দশ বছর পরে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ড গমন করেন। বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। এক, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনকে ও ব্রাহ্মধর্মকে প্রচার করা; দুই, 'পাশ্চাত্য উদ্যোগশীলতার কিঞ্চিৎভাব' এ দেশীয় ভাবপ্রবণতা, সরসতা ও ধ্যানপরায়ণতার সঙ্গে মিশ্রিত করে ব্রাহ্মসমাজকে এ দেশের ধর্মশিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত করা। দুর্গামোহন দাস ও পার্বতীনাথ রায় এই জাহাজে শিবনাথের সহযাত্রী হলেন।

ধর্মজীবনের সূত্রপাত থেকে শিবনাথের মনে আত্মোন্নতির যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল, বিলাত বাস কালে তার কথঞ্চিৎ পূরণ হয়েছিল। বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ দ্বারা আত্মোন্নতি এবং প্রচার উভয় কার্যই সাধিত হয়েছিল; মিস্ কলেট, প্রফেসর নিউম্যান, স্টপফোর্ড ব্রুক, উইলিয়ম স্টেড্, রেভারেণ্ড ভয়সী প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ হয়। বিভিন্ন ছোট খাটো সভাতে, বড় উপাসনাগৃহে, খাওয়ার টেবিলে সর্বত্র তিনি ব্রাহ্মসমাজের উদার ধর্মনীতি ও তার দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

বিলাত থেকে অক্টোবর মাসে শিবনাথ ফিরে আসেন সম্পূর্ণ এক পরিবর্তিত মানুষ হয়ে। বিলাতে গিয়ে ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আকর্ষণ বহুগুণে বর্ধিত হয়।[২] বিলাত থেকে ফিরেই ভারতমাতাকে সেবা করবার জন্য শিবনাথ পুনর্বার প্রচারে বহির্গত হলেন।

১। 'সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান ও উপাসনা করিতাম। এক মাস এইরূপ সাধন করিয়া প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছিলাম।'—শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২০১।

২। 'ঘরের দিকে আমার মন ছুটিয়াছে—আমার হতভাগ্য জন্মভূমির ক্রোড়ে গিয়া লক্ষ লক্ষ অনাথ পদদলিত নরনারীর জন্য পরিশ্রম করিয়া মরিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।'—শিবনাথের ডায়েরী, দ্রঃ হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২২৫।

দ্বিতীয়বার দক্ষিণভারতে যাত্রা করার পূর্বে শিবনাথ লণ্ডনস্থ রেভারেণ্ড চার্লস ভয়সীর একেশ্বরবাদানুসারে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের জন্য একটা উপাসকমণ্ডলী গঠিত করে তাঁদের আচার্যপদ গ্রহণ করেন। এখানে ইংরেজিতে উপাসনা হত।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি প্রচার-নিমিত্তে খাণ্ডোয়া ও রট্‌লাম হয়ে ইন্দোর যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট এবং মহারাজ হোলকারের বিরোধিতায় বক্তৃতাদানের সুযোগ হল না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ চতুর্থবারের জন্য মাদ্রাজে যান।[১] এ সময়ের দুরন্ত পরিশ্রমে শিবনাথ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ রোগভোগের পর ছাব্বিশে ডিসেম্বর ১৮৯০ তারিখে তিনি কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।

প্রচারক ছাড়া শিবনাথের অপর পরিচয় তিনি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বশীল আচার্য ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের প্রস্তাবক্রমে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শিবনাথ প্রথম 'উপাসকমণ্ডলীর দায়ী স্থায়ী আচার্য'রূপে ভার গ্রহণ করলেন। এ সময়ে তাঁর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লিখিতভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় তিনি প্রদান করতে লাগলেন। তাঁর ঔপনিষদিক উপলব্ধি, সমাজ ব্যাপারে গভীর জ্ঞান ও সাধকোচিত ভাব এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

রুগ্নদেহ ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে এল। কিন্তু অমিত প্রাণশক্তির অধিকারী শিবনাথ সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচার করার জন্য সাতান্ন বছর বয়সে ভারত ভ্রমণে বের হলেন।[২] দ্বিতীয় পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী এই যাত্রায় সঙ্গী হলেন। বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, সাহারণপুর, দেরাদুন, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, ইন্দোর, মাঙ্গালোর,

১। 'বেজওয়াড়া হইতে আমি মস্‌লিপটম্ যাই। সেখানে একদিন একটা আর একদিন একটা বক্তৃতা হয়, সেখান হইতে ফিরিয়া বেজওয়াড়া হইয়া রযুমাহেন্দ্রী গমন করি। সেখানে ১৭ই নভেম্বর শনিবার পৌঁছি এবং সেই দিনই একটি বক্তৃতা করি।...১৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার কোকনদা পৌঁছি।'—শিবনাথের ডায়েরী (২৭-১-১৮৯১), হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২৩৮।

২। এর পূর্বে প্রথম পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয় (জুন, ১৯০১)।

কালিকট, কোইম্বাটুর, বাঙ্গালোর, ত্রিচিনপল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর ভ্রমণান্তে শিবনাথ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে শিবনাথ লক্ষ্য করেন যে, 'দেশের সর্বত্রই এই Hindu Reaction-এর স্রোত প্রবাহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে খর্ব করিয়াছে। ইহারা লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে যে, ব্রাহ্মেরা অর্ধেকের অধিক খ্রীষ্টীয়ান, ও স্বজাতি ও স্বদেশের অনুরাগী নহে। সর্বত্রই দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মেরা একটা praying body মাত্র হইয়া পড়িতেছেন, যেন দেশের ভদ্রাভদ্রের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মেরা দেশের ভদ্রাভদ্র চিন্তা হইতে যেন সরিয়া পড়িতেছেন। এই জন্য ব্রাহ্মগণ অবজ্ঞার তলে তলাইয়া যাইতেছেন।'[১] কয়েকবার সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে ব্রাহ্মধর্মের অবস্থা সম্পর্কে শিবনাথের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রচার-সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মকে ভারতীয় সাধারণেরা অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে নি। শিবনাথের বক্তৃতায় অনেকে মুগ্ধ হয়েছিলেন মাত্র, ধর্মমত পরিবর্তনের ব্যাপারে সেইগুলি গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। এর কারণ এই নয় যে, শিবনাথের প্রচারে কোন ত্রুটি ছিল। দীর্ঘকাল-বাহিত বিচিত্র সংস্কার জনসাধারণকে নূতন ধর্মমত গ্রহণে কুণ্ঠিত করেছিল। তাছাড়া, ভারতীয়রা ধর্মকে ততখানি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নি, যতখানি সামাজিক আচার-বিচারকে মান্য করেছে। ধর্মের স্বরূপ আচারানুষ্ঠানের নির্মোকে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পরপর দু বছর শিবনাথ স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে দার্জিলিঙ্গে যান। সেখানকার স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রতি রবিবার উপাসনা করতেন। ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কার্সিয়াঙ্‌ বাসকালেও দার্জিলিঙ্গে এসে উপাসনা করতেন।

প্রচারের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় হল শাস্ত্রাদিতে অধিকার। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র শিবনাথ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রসমূহকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তাদের মূলভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং সেগুলি প্রচারকালে উদ্ধৃত করতেন। শুধু ভারতীয় কেন, পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রসমূহ তিনি গভীরভাবে পাঠ করতেন।

১। শিবনাথের ডায়েরী (১৪.৫.১৯০৪), দ্রঃ, হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২৮০-১।

ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বাইবেল পাঠ তাঁর জীবনের নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া থিওডোর পার্কার, নিউম্যান ইত্যাদির গ্রন্থ পাঠে তিনি নিরলস ছিলেন।

বক্তৃতাদান প্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। শৈশবের 'শিবেজ্যেঠা' উত্তরকালে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তাঁর ডায়েরীগুলি পাঠকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বক্তৃতা দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি আসত না। অথচ শ্রোতারা বক্তৃতাগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।[১] বক্তৃতার মধ্যে তাঁর ঐশী-অনুভূতি ও মনুষ্যত্বের প্রকাশ, শিবনাথকে ভারতের বহুজনের পরমাত্মীয় করে তুলেছিল।[২] এ কারণে সাধু বজরং বিহারীর মত সম্পত্তিশালী ভদ্রলোক, মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র সন্তানকে শিবনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

প্রচারক ব্যতীত শিবনাথের আরও একটি বড় পরিচয় আছে। তিনি সাধক। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর বহুকীর্তি এবং সাহিত্যে তাঁর বহুল দান সমসাময়িককালে তাঁকে খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত করলেও, উত্তরকালে তিনি প্রধানতঃ সাধক শিবনাথ রূপেই পরিচিত হন। এদিক থেকে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমগোত্রীয়। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সাধনার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও শিবনাথ নানা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গেও আমৃত্যু জড়িত ছিলেন।

শিবনাথের অন্তরে একটি সাধকপুরুষ বাস করতেন। উনিশ শতকীয় জীবনকেন্দ্রের স্থিতিবিন্দুটি ছিল আত্মশক্তি ও আত্মাশ্রয়। আমরা এই আত্মাশ্রয়কেই ধর্মবোধ আখ্যা দিতে পারি। শিবনাথের জীবন এই ধর্মভাবের বিন্দুতেই স্থিতিশীল ছিল। তাই তাঁর সকল কর্মের মধ্যে এই ধর্মবোধের প্রকাশ কম-বেশি লক্ষ্য করি। সেকারণেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁর কাছে উপাসনানুষ্ঠানের সংকীর্ণ মন্দির না হয়ে, 'জীবনধর্ম পালনের সমাজ' হয়ে

১। 'শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনায় উপদেশে বক্তৃতায় উৎসারিত হ'ত তাঁর অন্তর্গঙ্গোত্রীর মুক্তধারা—অনাবিল স্বচ্ছ, অমৃতময়।'—সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, 'শিবনাথ শাস্ত্রী', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭।

২। 'কেবল বাহিরের পথ বাঁধায় নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিবনাথ শাস্ত্রী', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২০।

উঠেছিল। বেশ কিছুদিন ধরে শিবনাথ লক্ষ্য করছিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নানাবিধ সামাজিক উন্নতি এবং নানা কর্মযোগের মধ্যে লিপ্ত হয়ে রয়েছেন। অথচ তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক 'বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার' ভাব বড় হয়ে উঠে নি। 'বিশ্বাসী ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন মানুষই ধর্মসমাজের বল'—এই ছিল শিবনাথের ধারণা। সেই ভাবের ভাবিত এক সাধকমণ্ডলী[1] গঠন করার উদ্দেশ্যে শিবনাথ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বস্ব-বিনিময়ে একটি 'সাধনাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসবে (মাঘোৎসব, ১৮৯৩) যোগ দিয়ে আশীর্বাণী পাঠ করলেন। অবশ্য শিবনাথের বিভিন্ন রচনা পড়ে বোঝা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সর্বস্বত্যাগী ব্রাহ্ম তিনি দেখতে পান নি। নিজেকেও এ ব্যাপারে বহুবার অসম্পূর্ণ ভেবেছেন।

এই সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে তাঁকে নিদারুণ বাক্যযন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছিল।[2] অন্তরে বেদনা পেয়েও তিনি সেবাতে পশ্চাদ্‌পদ হন নি। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে, চৌদ্দ বছরের মধ্যে (১৮৭৮-৯২) ব্রাহ্মসমাজের বহু সভ্য বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু প্রচারকের সংখ্যা আট থেকে চার-এ দাঁড়িয়েছে। 'যে চারজন আছেন তাঁরাও এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া কার্য করিতে পারিতেছেন না।' বক্তৃতা, উপদেশ, উপাসনা শিবনাথের কাছে আপাততঃ বিফল মনে হতে লাগল। পূর্বে তাঁর ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মসমাজ অন্ততঃ আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলবান—সে ধারণারও পরিবর্তন হল। সমাজকে এই অবস্থা থেকে উন্নীত করার ব্যাপারে শিবনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহুজনে অর্থদান করলেন সত্য, কিন্তু যথার্থ সাধকের ভাব কারও মনে সঞ্চারিত হল না। কারণ শিবনাথের এই আহ্বানের মধ্যে বহুজনেই একনায়কত্বের ভাব লক্ষ্য করলেন।[3]

১। একদল বিশ্বাসী ও প্রেমিক সাধক চাই যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন ও ঘনিষ্ঠ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজের মধ্যে নূতন জীবন আনিবার চেষ্টা করিবেন।'—শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনাংশ, সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত (১৯৫২), পৃঃ ২।

২। 'শাস্ত্রী গুরু হইতে চান, আত্মকর্তৃত্ব জাহির করিতে চান'—এই ধরণের মন্তব্য হেমলতা দেবী উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ১৯৫-৯৬।

৩। হেমলতা দেবী, শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ২৪৮-৪৯।

শিবনাথের উদ্দেশ্য তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমাধিস্থ হয়ে গেল। অথচ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শিবনাথ এই আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

ধর্মজগতে রামমোহন রায় ছিলেন এক যুগধর্মের প্রবর্তক। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ উদ্ধার করে তিনি সংকটে পতিত এক জাতিকে উদ্ধারের জন্য স্বদেশে প্রচার করলেন। উপনিষদের সে বাণী হল, 'নিজ নিজ আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর।' এই দর্শন জনসমাজকে ও মঙ্গলকে কেন্দ্র করেই হবে—ব্রাহ্মধর্ম এই শিক্ষাই দিয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উপনিষদের এই ধর্মেরই সাধনা করেছেন। কিন্তু শিবনাথ যুগধর্মের প্রকৃতিটি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুধাবন করেছিলেন। সে কারণেই তিনি রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের অনুসরণে কেবলমাত্র 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্মভাবের সমাবেশ' না ঘটিয়ে ভাবুকতা ও নীতির সংমিশ্রণও চেয়েছিলেন।[১] তাছাড়া সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা এই পরস্পর বিরোধিতা-সম্পন্ন ভাবেরও সমাবেশ তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর ধর্মমতকে তিনি নিজের ধর্মজীবনে সাধন করেছিলেন। হৃদয়শীলতা এবং প্রতিভার শক্তিই এই সাধনে সহায়তা দান করেছিল। ধর্মসাধনের উপায় হিসাবে শিবনাথ প্রাণায়ামাদি যোগে বিশ্বাসী ছিলেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হওয়ায়ই শিবনাথের ধর্মজীবনের সবচেয়ে বড় কথা। তাঁর এই ঈশ্বর-প্রীতির ভিত্তি ছিল মানব-সমাজ।[২] মানবকল্যাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তাঁর ঈশ্বরপ্রীতি পথ খুঁজে পেয়েছিল। আবার যখন তিনি মানবসমাজের মধ্যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেছেন, তখনই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের যে বিচিত্র প্রকাশ রয়েছে, তাকেই গ্রহণ করেছেন। পার্কারের প্রার্থনাগুলি এই কারণে শিবনাথকে গভীর আনন্দ দান করত।[৩] 'প্রার্থনাই

১। 'নীতিহীন ভাবুকতা, ও ভাবুকতাহীন নীতি উভয়ই বর্জন করা যায়।'—হেমলতা দেবীর শিবনাথ-জীবনীতে উদ্ধৃত শিবনাথের উক্তি, পৃঃ ৩২০।

২। উদ্ধৃতিযোগ্য অপর একটি উক্তি, 'মনুষ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষের সুখ দুঃখ ভুলিয়া যে ঈশ্বরপ্রীতি, তাহা আমার ভাল লাগে না।'—তদেব, পৃঃ ৩২৪।

৩। 'পার্কারের প্রার্থনাগুলি আর এক কারণে আমার বড় ভাল লাগে।...জড়জগতে প্রাণীরাজ্যে ও মানবরাজ্যে, প্রভু পরমেশ্বরের যে করুণা তাহা আমি সর্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। জগতের ধনধান্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে, ঊষার আলোকে, শরতের সুনীল গগনে, বসন্তের কোমল পুষ্পদলে তাঁর প্রেম বড়ই অনুভব করি।' শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী।

আমার জীবনের পরম সম্বল। আমি ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ধর্মজগতে প্রবেশ করিয়াছি। এবং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আছি।[১]

ঈশ্বরের উপলব্ধি তাঁর জীবনে ঘটেছিল। শিবনাথ লিখেছেন, 'গতকল্য অবধি সত্যস্বরূপ আমার হৃদয়কে উজ্জলরূপে অধিকার করিতেছেন।'[২] মন্ত্র, জপ, ব্রতধারণ, গুরুকীর্তন ইত্যাদি তাঁর উপাসনার অঙ্গ ছিল। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন, 'এমন করিয়া আপনাকে দিতে, আপনাকে হারাইতে, আপনাকে লুপ্ত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।[৩] ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগসুখাসক্ত জীবনকে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলেই শিবনাথ বুঝেছিলেন যে, 'আত্মসংযম, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, পরসেবাই' ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা। তাঁর জীবনের মন্ত্র ছিল, 'জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্তব্যপালনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি।'[৪] এই মন্ত্র সাধনার ইতিহাসই শিবনাথের জীবনের মূল ইতিহাস।

'তাঁর ধর্ম কেবল ভক্তির ধর্ম ছিল না, ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জীবন এবং সেবাই তাঁহার ধর্ম ছিল।—তিনি সেই ধর্ম বাক্যে ও জীবনে প্রচার করিতেন।'[৫] এখানেই সাধক শিবনাথের পূর্ণরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কীকে বলেছিলেন, 'আমি ভক্তি ধর্মাবলম্বী, আমার ঈশ্বর জীবন্ত শক্তিশালী, জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ, তাঁহার সঙ্গে প্রেমযোগেই মানবের পরিত্রাণ।'[৬]

বাগ্মিতার অধিকারী প্রচারক শিবনাথ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, আর প্রার্থনার সাহায্যে সাধক শিবনাথ এক ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

১। হেমলতা দেবীর শিবনাথ-জীবনী গ্রন্থে উদ্ধৃত শিবনাথের পত্রাংশ, পৃঃ ৩২৭।

২। হেমলতা দেবীর শিবনাথ-জীবনী গ্রন্থে উদ্ধৃত শিবনাথের ডায়েরীর (২৩.৬.১৮৮৮) একাংশ, পৃঃ ৩২৮।

৩। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শিবনাথ শাস্ত্রী, (১৩৭৫), পৃঃ ২২।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, অবন্তী দেবী রচিত 'নিবেদন', পৃঃ ১২।

৫। কবি কামিনী রায়ের উক্তি, দ্রঃ, হেমলতা দেবী, শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ৩৩৪।

৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৭৪।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্নমুখী কর্মব্রত উদ্‌যাপন : শিক্ষকতা, সমাজসেবা ও স্বদেশ-সাধনা

॥ ১ ॥

শিক্ষকতা ॥

সরস্বতীর ভাবপ্রসাদ ও স্বভাবকর্মীর কর্মৈষণা আপন জীবনে একীভূত হওয়ায় শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের সেবা ছাড়াও সমাজের বিভিন্নমুখী কর্মব্রত উদ্‌যাপনে সফলকাম হয়েছিলেন। চরিত্রের প্রচণ্ডবেগে কুলগত সীমা ও সংস্কারের উর্ধ্বে বিরাট মানবলোকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি মানবজাতির সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। উচ্চশ্রেণীর মনীষা ও অসাধারণ কর্মযোগের ক্ষেত্রে আমরা বিদ্যাসাগর ও শিবনাথের মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করি। এই বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ 'মানব বৎসলতা'[১] বলে উল্লেখ করেছেন। সমাজের বহুবিধ প্রগতির সঙ্গে আপনাকে জড়িত রেখে মানব সমাজকে তিনি সেবা করে গিয়েছেন।

শিবনাথের এই সেবা প্রবৃত্তি প্রধানত: তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে—এক, শিক্ষাক্ষেত্রে ; দুই, সমাজসেবায় ; তিন, দেশপ্রেম তথা রাজনীতিতে।

শিক্ষা বিষয়ে শিবনাথের কর্মপদ্ধতি ছিল দ্বিবিধ। প্রথম, শিক্ষক হিসাবে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা ; দ্বিতীয়, শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও দান।

আদর্শ বাংলা বিদ্যালয়ের গণ্ডী তখনও শিবনাথ পার হন নি ; অর্থাৎ ন'বছর বয়স হওয়ার আগেই শিবনাথের প্রথম শিক্ষকতা শুরু হয়। তাঁর পিতার সম্পর্কিত এক খুড়ী, গৌরাঙ্গী বিধবা এক যুবতী শিবনাথের প্রথম ছাত্রী।[২] শিবনাথ এঁকে বর্ণপরিচয় করাতেন।

দ্বিতীয় ছাত্রী বন্ধু ঈশানচন্দ্র রায়ের ভগ্নী মহালক্ষ্মী। এঁর সঙ্গে শিবনাথ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।—'শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে ; সেটি তাঁহার প্রবল মানব বৎসলতা'।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৮।

ধর্ম-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ছাড়াও এঁকে বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন।[১] এ ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। শিবনাথ তখনও এল. এ. পরীক্ষা দেন নাই। এ ছাড়া কলেজে পাঠকালীন গ্রীষ্মাবকাশের সময় বাড়ী গিয়ে গ্রামের পাঠশালাতেও পড়াতে যেতেন।[২] এখনও পর্যন্ত শিক্ষকতা শিবনাথের বৃত্তি হয়ে উঠে নি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করে ও 'শাস্ত্রী' উপাধি পেয়ে শিবনাথ কেশবচন্দ্রের ভারত-আশ্রমের মহিলা বিদ্যালয়ে নামমাত্র পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হলেন। ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি এই কাজ করতে লাগলেন। প্রতিদিন দুপুরে আশ্রমবাসিনী মহিলাদের নিয়ে স্কুল হত। শিবনাথ ঐ স্কুলে কেশবপত্নী জগন্মোহিনী দেবীকে ইংরেজি পড়াতেন। 'তদনন্তর তিনি আমার ছাত্রী হইলেন।'[৩] শিবনাথের পড়ানো জগন্মোহিনী দেবীকে এত মুগ্ধ করত যে, তিনি শিক্ষার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রকে একেবারেই আমল দিতেন না।

শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল হরিনাভি। মাতুল দ্বারকানাথের আহ্বানে তিনি ভারত-আশ্রম ছেড়ে হরিনাভিতে গিয়ে 'মাতুলের সোমপ্রকাশের সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও তাঁহার পরিবার-পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক' হলেন। হরিনাভিতে তিনি প্রায় দেড় বছর ছিলেন। হরিনাভির বিদ্যালয়টি ছিল নব প্রতিষ্ঠিত। শিবনাথ লঘুভাবে কোন কাজ করতে জানতেন না। ফলে বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য তাঁকে দুরন্ত পরিশ্রম করতে হত। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। এটির সুষ্ঠু-পরিচালনের জন্য শিবনাথ শিক্ষকদের বেতন হার কমিয়ে দিলেন। এজন্য তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৪] শিক্ষক মহাশয়েরা পদত্যাগের ভয় দেখিয়েও শিবনাথের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম না করতে পেরে সংশোধিত বেতন-হার গ্রহণে সম্মত হলেন।

এ ছাড়া সে সময়ে হরিনাভি গ্রামের নৈতিক আবহাওয়া খুবই অসুস্থ

১। আহারান্তে মহালক্ষ্মীর ঘরে বসিয়া তাঁহাকে বাংলা ও ইংরাজী পড়াইতাম'—তদেব, পৃঃ ৭৮।

২। তদেব, পৃঃ ২৫২-৫৩।

৩। তদেব, পৃঃ ১০৯-১১।

৪। 'কি করিব, কর্তব্যবোধে লোকের অপ্রিয় হইতে হইল।'—তদেব, পৃঃ ১২১।

ছিল। গ্রামস্থ একটি সখের যাত্রা দলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সঙ্ সাজতেন। শিবনাথ নীতিগতভাবে এতে আপত্তি জানিয়ে সার্কুলার জারি করলেন,—'স্কুলের কোন শিক্ষক সখের দলের অভিনেতার মধ্যে থাকিলে তাহা তাঁহার পক্ষে শিক্ষকতার অনুপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে।' যাত্রার দলের লোকেরা এতে বিরক্ত হয়ে গ্রামের জমিদারের প্ররোচনায় শিবনাথের বাড়ী পর্যন্ত আক্রমণ করল। কিন্তু শিবনাথ একা নির্ভয়ে ও বীর বিক্রমে তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই তারা পশ্চাদপসরণ করল। শিবনাথ ইচ্ছা করেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা আনলেন না দেখে, জমিদারবাবুরা সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করতে লাগলেন।

বিদ্যালয়ের কাজে একদিন কলকাতা থেকে হরিনাভি আসার পথে স্কুলের এক মাসের তহবিল ট্রেনে চুরি হয়ে যায়।[১] অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করেও তিনি ঋণ করে ক্ষতিপূরণ করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি হরিনাভি থেকে ভবানীপুরে চলে এলেন।

তৎকালীন 'ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্' রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শিবনাথকে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের হেডমাষ্টার করে নিয়ে আসেন। দু' বছর সেখানে তিনি কাজ করেছিলেন। ভবানীপুর বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছাড়াও এই সময়ে তিনি মহিলাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে একটি আন্দোলনের সমর্থক হয়ে পড়েন। কেশবচন্দ্রের মহিলা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট না হয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখেরা মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'[২] নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকানাথের অনুরোধে শিবনাথ কন্যা হেমলতাকে এই বিদ্যালয়ে (বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় নাম তখন) ভর্তি করে দিলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সুরুতে হেয়ার স্কুলে Head Pandit-cum-Translator Master-এর পদ সৃষ্টি হলে শিবনাথ ভবানীপুর থেকে ঐ পদ গ্রহণ করে হেয়ার স্কুলে আসেন।[৩] এখানে তাঁর স্থিতি দু'বছর—১৮৭৬-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

১। হেমলতাদেবী, শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ১০০।

২। কুমারী এক্রয়ডের বিবাহের পর বিদ্যালয়টি 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়। পরে ১৮৭৭ সালে বেথুন কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৬০-৬৫ ও পৃঃ ১৩১।

পর্যন্ত। ইতিমধ্যে প্রবল ধর্মভাব ও স্বাধীনতাস্পৃহায় তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে ধর্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করার বাসনা বন্ধু আনন্দমোহন বসুকে জানালেন। আনন্দমোহন শিবনাথের সুন্দর পড়ানোর পদ্ধতি জানতেন। মাত্র পাঁচ বছরেই তাঁর শিক্ষক-জীবনের সমাপ্তি ঘটে তা তিনি চাইলেন না। তা ছাড়া পরিবারের কথা চিন্তা ক'রে তিনি শিবনাথকে আপাতত চাকুরী ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে আহ্বান করছিল। সুতরাং সাংসারিক অনটন সত্ত্বেও[১] ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মার্চ থেকে 'বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাকর্মের আবর্তে' পড়লেন। স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা-বৃত্তির এখানেই শেষ। অবশ্য সারা জীবনই তিনি মানব-সমাজকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত থেকে তিনি সেই সব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকতা করেছিলেন।

চাকুরী পরিত্যাগ করলেও একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। কিন্তু কুচবিহার-বিবাহ আন্দোলন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার জন্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কর্ম রূপায়িত হয়নি। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই সুযোগ আসে। আনন্দমোহন বসু এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থানুকূল্যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষকতায় ও শিবনাথের সাক্ষাৎ দায়িত্বে সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হল। 'প্রথম মাসেই ব্যয় বাদে টাকা উদ্‌বৃত্ত হইল।' দলে দলে ছাত্র ভর্তি হতে লাগল। শিবনাথের নামেই স্কুলের সুনাম। শিবনাথ স্কুলে গিয়ে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ নিজে দেখতেন। নিজে শিক্ষকের কাজও করতেন।[২] বহু ছাত্র ভর্তি হওয়ার দরুণ বহু বিতাড়িত (Expelled) ও অভব্য ছাত্র বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট

১। অথচ আর ছ'মাস মাত্র অপেক্ষা করলে তিনি স্কুলের বোনাস-স্বরূপ অনেক টাকা পেতে পারতেন।

২। Within a short time the City School took high rank among the educational institutions of Calcutta. In 1881 it was raised to the status of a second grade College...with provision for teaching Arts, Science and Law. In 1918 a superb building was constructed in Amherst street for the college classes.' Hemchandra Sarkar, Shivanath Sastri, pp. 35.

হয়। অথচ বিদ্যালয়টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, 'বালকদিগের প্রাণে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের নীতি শিক্ষা দেওয়া।' চরিত্রবান শিবনাথ ছাত্র বাছাই-এর কাজে দুরন্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন।[১] এ ব্যাপারে তিনি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। এ সম্পর্কে শিবনাথের মতটি যথার্থই গ্রহণযোগ্য—'এক শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় সকলের শিক্ষকদের মধ্যে আত্মীয়তা ও যোগ না থাকিলে, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের অভিভাবক এই উভয়ের মধ্যে সাহচর্য না থাকিলে, বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান সময়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই দুইটিরই অভাব।'[২]

সিটি স্কুল স্থাপনের আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল,—'বহু সংখ্যক বালকের মনে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব দেওয়া যাইবে।' ধর্মবিহীন শিক্ষা ফলপ্রদ নয়, একথা শিবনাথ কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে জেনেছিলেন। এক সময়ে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়েও ধর্মশিক্ষাদান শিবনাথের নিত্যদিনের চিন্তা ছিল। 'Students' fortnightly meeting' বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের বালিকাদের ধর্মশিক্ষা·· আরম্ভ করা নিতান্ত কর্তব্য বোধ হইতে লাগিল।' (ডায়েরী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮)। অন্যত্র (ডায়েরী, ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮) 'অদ্য প্রত্যুষে উঠিয়া আনন্দমোহন বাবুর নিকট গমন করিলাম, তাঁহার সঙ্গে তিন বিষয়ের কথা হইল, প্রথম Students' fortnightly Service, দ্বিতীয় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে ধর্মশিক্ষার ভার, তৃতীয় প্রতিনিধি সভা। তিনি 'Students' Service-এর সঙ্গে অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।'[৩] এই ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্য আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির সহযোগিতায় শিবনাথ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল তারিখে ছাত্রসমাজ স্থাপন করলেন। প্রথমে প্রতি রবিবার সকালে সিটি স্কুলের ঘরে ছাত্রসমাজের কাজ আরম্ভ হল। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখেরা চিত্তাকর্ষক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাদি দিতে লাগলেন। ছাত্রসমাজে শিবনাথ যে সব বক্তৃতা দিতেন, সেগুলি তাঁকে বঙ্গভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৬১-৬৪।

২। তদেব, পৃঃ ১৬৪।

৩। হেমলতা দেবীর শিবনাথ-জীবনী গ্রন্থে উদ্ধৃত, দ্রঃ, পৃঃ ১৫৯-৬০।

প্রতিষ্ঠিত করল। এমনকি তাঁর বিরোধিরাও এই বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে যেতেন।[১] 'বক্তৃতা স্তবক' নামক গ্রন্থে এই বক্তৃতাসমূহের কিছু কিছু মুদ্রিত হয়েছে। ছাত্রসমাজের একজন সভ্য রজনীকান্ত গুহ ছাত্রসমাজের উপর শিবনাথের বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন, 'তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়াছে, দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে এবং চিত্ত ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া ভূমার আশ্রয় লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে শিখিয়াছে।'[২]

সেকালে ছাত্রসমাজ ব্যতীত ছাত্রদের ধর্ম-শিক্ষার নিমিত্ত অন্য কোন সভা-সমিতি ছিল না বলে ছাত্রসমাজের সভ্য সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। পরে উৎসাহী সভ্যগণকে নিয়ে ছাত্রসমাজে শিবনাথ একটি 'ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী' গঠন করেন। এখানেও তিনি নানা উপদেশ দান করতেন।[৩]

শিশুপাঠ্য মাসিক 'সখা'-পত্রিকার সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন প্রতিষ্ঠিত একটি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে শিবনাথ মাঝে মধ্যে উপস্থিত থেকে উৎসাহ ও উপদেশাদি দিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের কয়েকজন কন্যার[৪] উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অপর একটি রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিবনাথ সাক্ষাৎভাবে যুক্ত ছিলেন। 'আমি এই নীতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম। এই কন্যাদের সঙ্গে বসিয়া ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতাম, নীতি

১। 'Pandit Sastri was unquestionably one of the best, if not the best, speakers in Bengali.... They (lectures) thrilled and charmed the audience and raised them to a high pitch of enthusiasm. At the close of his lecture on caste system, two Brahmin young men tore off their sarificial thread on the spot. An orthodox gentleman of the old school who was not at all sympathetic towards Pandit Sastri but had reasons to be hostile to him, once remarked, "One feels inclined to stand and hear him for hours."—Hem-Chandra Sarkar, Shivanath Sastri, pp. 36.

২। রজনীকান্ত গুহ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

৩। ছাত্রসমাজ প্রদত্ত শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেওয়া অভিনন্দন পত্রটির জন্য দ্রঃ, হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১০-১৫।

৪। কুমারী কামিনী সেন, লাবণ্যপ্রভা বসু, কুমুদিনী খাস্তগীর, সরলা মহলানবিশ, হেমলতা ভট্টাচার্য এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বিদ্যালয়ের কার্যাদি পরামর্শ করিতাম, ইহাদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম।'[১]

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। শিশুশিক্ষার প্রতি শিবনাথের বিশেষ দৃষ্টি বরাবরই ছিল। হরিনাভি ও ভবানীপুরে শিক্ষকতা কালে নীচু ক্লাসের ছাত্রদের 'ভুলাইয়া পড়াইবার' উপদেশ দিতেন। ইংলণ্ডের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ছাড়া কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি শিবনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।[২] তারপর থেকেই স্বদেশে এই ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শিবনাথের মনে হতে থাকে। ব্রাহ্মপাড়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা ভেবে কিণ্ডারগার্টেনের আদর্শে শিবনাথ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করলেন। আনন্দমোহন বসু এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পূর্ববৎ সাহায্য ক'রতে এগিয়ে এলেন। বিদ্যালয়টির নাম-করণ প্রসঙ্গে শিবনাথ বলেছেন, 'জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা শিক্ষালয় স্থাপন করিব, বিদ্যালয় নাম রাখিব না—আমরা প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, পুঁথিগত বিদ্যা নয়, সুতরাং চেয়ার টেবিলের আবশ্যকতা কি? আমাদের বালিকারা মাদুর পাতিয়া পড়িবে, তাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।'[৩] এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার আগে এদেশে এ ধরণের শিশু বিদ্যালয় ছিল না। সুতরাং এদেশে কিণ্ডারগার্টেন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ হিসাবে শিবনাথের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিবনাথ এতই চিন্তাপূর্ণ থাকতেন যে, ডালের বদলে জল দিয়ে ভাত মাখতেন কোন কোন দিন।[৪] শিবনাথ নিজে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে বোর্ডের সাহায্যে ছবি এঁকে পড়াতেন।

স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে শিবনাথের একটা নিজস্ব মত ছিল।[৫] তিনি মেয়েদের

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৯৮।

২। 'শিশুদের এই শিক্ষাপ্রণালী আমার এত ভালো লাগিয়াছিল যে, আমি আসিবার সময় কিণ্ডারগার্টেনের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রোবেলের জীবনচরিত ও উক্ত শিক্ষা প্রণালীর কয়েকখানি গ্রন্থ কিনিয়া আনিলাম।'—আত্মচরিত, পৃঃ ২২৩।

৩। হেমলতা দেবীর শিবনাথ-জীবনী গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২৩৪-৩৫।

৪। তদেব, পৃঃ ২৩৬।

৫। শিবনাথের স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কে মতামতের জন্য দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা বেথুন ও

জ্যামিতি, লজিক, মেটাফিজিক্‌স্‌ পড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘোর মতান্তর উপস্থিত হয়েছিল, যখন তিনি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, সেই সময়।[১] ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়েও সেই মতান্তর এসে উপস্থিত হল। শিবনাথ বিদ্যালয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি শিশুদের স্বাধীন চিন্তা বিকাশে বাধা ঘটাবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। ফলে শিবনাথ এর সাক্ষাৎ সংশ্রব ত্যাগ করলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোয়েটা থেকে শিবনাথ বাঁকিপুরে প্রচারকার্যে আসেন। ষ্টেশনে অনেকগুলি এম. এ. কে উপস্থিত দেখে গুরুদাস চক্রবর্তী একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ষ্টেশন থেকে এসেই শাস্ত্রী মহাশয় একটা 'চমৎকার প্রস্পেক্‌টাস্‌' রচনা করে ফেলেন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে লাগলেন।[২] আমৃত্যু এর সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

শিক্ষা সম্পর্কে শিবনাথের কতকগুলি ব্যক্তিগত ধারণা গড়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ, শিশু এবং মহিলাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে। শিশুদের শাস্তি দান তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। অন্তরে তাঁর একটি শিশু মন বাস করত। অতি সহজেই শিশু হয়ে শিশুদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়টি নিপুণভাবে শিখিয়ে দিতে পারতেন। তিনি এমন আশ্চর্যভাবে ক্রীড়াচ্ছলে সকল বালককে পড়া শিখিয়ে দিতেন যে, তারা বলত, 'পণ্ডিত মশাই, তুমি আমাদের ক্লাসে এস, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।'[৩] ভারত-আশ্রমের ছাত্রীদের তিনি মুখে মুখে মেণ্টাল সায়েন্স ও লজিক বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১, পৃ: ২৪৪-৪৫। এই প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্গদেশের সামাজিক উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে।'

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ১১৪-১৫।

২। রজনীকান্ত গুহ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ৫৫৩।

ছাত্রীরা[১] সেগুলি নোট[২] করে নিত। এঁদের পড়াতে শিবনাথের আনন্দের সীমা থাকত না।

শিক্ষার পাঠক্রম যাই হোক, তার সঙ্গে ধর্ম ও নীতি যুক্ত না থাকলে শিক্ষা পূর্ণ হয় না, এই ধারণাকে শিবনাথ বরাবরই পোষণ করে এসেছেন। সে কারণে যেখানেই ধর্মযুক্ত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হত, সেখানে শিবনাথের উৎসাহের অন্ত থাকত না। সেদিক থেকে বলা যায়, শিক্ষকতা বৃত্তি তাঁর ধর্মজীবনেরই একাংশকে উজ্জ্বল করেছিল।

॥ ২ ॥

সমাজ সেবা।

সমাজ সেবার কেন্দ্র বিস্তৃত ও বহুবিধ। শিক্ষকতা তার একটি অঙ্গ মাত্র। শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত শিবনাথ নানাবিধ সমাজসংস্কার-মূলক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই সকল আন্দোলনের প্রকার ত্রিবিধ। এক, সাধারণ ভাবে আমরা যাকে Social Service বা সমাজ-সেবা বলি ; দুই, বিধবা-বিবাহমূলক আন্দোলন এবং তিন, আশ্রয়দান।

শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাছাড়া পিতার প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বকে তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি বলে বাল্যকালে গ্রামের উন্নয়ন-মূলক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করতে পারেন নি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে শিবনাথ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের আহ্বানে হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক হয়ে সেখানে যান। এখানে থাকা কালে গ্রাম সংস্কারের কার্যে নিজেকে লিপ্ত করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হরিনাভি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে রয়েছে। কিন্তু ধার্য কর দেওয়া সত্ত্বেও গ্রামগুলির উন্নয়নে পৌর সংস্থার কোন উদ্যোগ নেই। 'সোম-প্রকাশে' এ সম্পর্কে আন্দোলন তুলেও শিবনাথ এর কোন বিহিত না করতে

১। ছাত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী খাস্তগীর ও প্রসন্নকুমার সেনের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সেন।

২। এই নোটগুলি 'বামাবোধিনী পত্রিকার' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রঃ, শ্রাবণ ১২৮০, মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১, বৈশাখ ১২৮২, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ সংখ্যা।

পেরে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। শিবনাথ হরিনাভি থেকে কিছুদিন পরে চলে এলেও এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ হরিনাভিতে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়েছিল। তাছাড়া সরকারের কাছে দরখাস্ত করে হরিনাভিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়েরও সূত্রপাত তিনি করেছিলেন। এর পূর্বে হরিনাভিতে ম্যালেরিয়া-পীড়িত দীনদরিদ্রগণের চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না।

মদ্যপান-রহিত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ শিবনাথের জীবনের এক প্রধান কর্ম। হিন্দু স্কুল স্থাপিত হওয়ায় আমরা যেমন কয়েকটি মনীষার সাক্ষাৎ পেয়েছি, তেমনি তাঁদের বহুজনের মধ্যে পাশ্চাত্য-প্রীতি বড় হয়ে দেখা দেওয়ায় মদ্যপানে তাঁদের গভীর আসক্তি দেখা দিয়েছিল। ফলে সমাজের একাংশের চরিত্র ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হয়ে পড়ছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু কলেজেরই একজন প্রতিভাধর ছাত্র রাজনারায়ণ বসুই প্রথম সুরা পানের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুললেন। এ ধরণের কয়েকটি 'সুরাপান-নিবারণী সভা'র মধ্যে প্যারীচরণ সরকারের সভার সঙ্গে শিবনাথের অতি বাল্যকাল থেকেই যোগ ছিল। মাতুল দ্বারকানাথের আদর্শ চরিত্রও শিবনাথকে মদ্যপান বিরোধী করে তুলেছিল।[১] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন যে 'ভারত-সংস্কার সভা' স্থাপন করেন, তার মধ্যে 'temperence movement' একটা বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল। এই সভার মুখপত্র 'মদ না গরল?' শিবনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত।[২] তাছাড়া কৃষ্ণকুমার মিত্র-সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা থেকে যেমন খোলাভাটি' (out-still system) সম্পর্কে নোট নিতেন, তেমনি মদ্যপানের কুফল বিষয়ে প্রবন্ধও রচনা করতেন।[৩] ইংলণ্ড প্রবাসকালেও এই চিন্তা তাঁর মনে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। 'কোনো ইংরাজের সহিত আলাপ হইলেই আমি সুরা পানের বিরুদ্ধে ভজাইবার চেষ্টা করিতাম।' এক একদিন মদ্যপ ইংলণ্ডের নৈশ চরিত্র দেখে তিনি অন্তরে

১। অবশ্য একবার কুসঙ্গে পড়ে মাত্র দুদিন শিবনাথ মদ্যপান করেছিলেন, আত্মচরিতে সেকথা গভীর পরিতাপের সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ আত্মচরিত, পৃঃ ৬৬।

২। এতে প্রকাশিত 'সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া পদ্যগদ্যময় প্রবন্ধ সকল'-এর অধিকাংশ শিবনাথ নিজে লিখতেন। দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১০৭।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ২৭ এবং ২৯।

ব্যথা পেতেন। 'পানাসক্তির অবৈধতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতাও তিনি ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের সভায় করেছিলেন।[১] মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে কয়েকটি কবিতাও শিবনাথ রচনা করেছিলেন।[২]

শিবনাথ পাঠ্যাবস্থা থেকেই বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় মাতুলের বাসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ফলে শিবনাথ শৈশব থেকেই 'বিধবাবিবাহের পক্ষ' হয়ে পড়েছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এল, এ, পরীক্ষা দেবার আগেই শিবনাথ একটি বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে জড়িত হয়ে পিতার বিরাগভাজন হন। বিবাহটি সংঘটিত হয় বন্ধু বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে (পরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নামে পরিচিত) অপর এক বন্ধু ঈশানচন্দ্র রায়ের বিধবা ভগ্নী মহালক্ষ্মীর। মাত্র স্কলারশিপের টাকার উপর ভরসা করে এই বিবাহের ষোল আনা দায়িত্ব শিবনাথকে বইতে হয়েছিল।[৩] অপর এক বন্ধু উপেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে একটি অপরিচিতা কন্যার 'খিচুড়ী বিবাহেও' শিবনাথ জড়িয়ে পড়েছিলেন।

শিবনাথ যে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে এত উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন, এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর মধ্যে সংস্কারের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল ; পরন্তু বলা যায়, এ-ও সেই একই মানববৎসলতার প্রকাশ। বিদ্যাসাগরের মত তিনিও 'স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী' ছিলেন। নারীজাতির পরম সুহৃদ্ শিবনাথ যে বিধবাবিবাহে অগ্রসর হবেন, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।[৪]

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ২১১-১২।

২। উদাহরণ স্বরূপ 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'জল ঝড়ে' ও 'বাবা তুমি ঘরে এস না' কবিতা দুটি দ্রষ্টব্য।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ৭৫-৮১।

৪। 'In these days (1884-85) Brahmo Samaj actively threw itself into the cause of social reform and particularly of widow re-marraige. Many a young Hindu widow found shelter in Brahmo families from where they subsequently got married. We also sometimes helped young Hindu widows to run away from their home and the protection of their families, and gave them shelter

স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর এই গভীর প্রেম সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পারিবারিক জীবনে বহুসংখ্যক নিরাশ্রয়া বালিকাকে আশ্রয় দানে। এঁদের সকলেই যে সমাজের উচ্চস্তর থেকে এসেছিলেন, এমন নয়। জীবনপথে চলতে চলতে নিরাশ্রয় ও পতিত হয়েছে, এমন মানুষের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহানুভূতি ছিল অসীম।' ফলে অন্যে যাঁদের পায়ে দলে যেতে চেয়েছে, শাস্ত্রী মহাশয় তাঁদের গভীর আগ্রহে বুকে তুলে নিয়েছেন।[১] যে পতিতাদের স্থান দিতে অন্যের মনে স্বাভাবিক সঙ্কোচ জাগত, শিবনাথের কাছে এসে তারা শান্তির নীড়ের সন্ধান পেত। মানুষের মধ্যে যে অনেক দোষ থাকে, একথা শাস্ত্রী মহাশয় জানতেন। তবুও তাদের মধ্যে তিনি ভালটুকুকেই লক্ষ্য করতেন। বলতেন, 'দেখ, মানুষকে পাষাণের মত না হইয়া আকাশের মত হইতে হইবে।'[২]

শিবনাথের উদার হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল ছুতোর জাতীয় একটি কন্যা,[৩] হরিনাভিতে তাঁর আশ্রয়ে এসে বাস করেছিল (মোট চার বছর) পতিতা নারীর কন্যা লক্ষ্মীমণি,[৪] থাকমণি,[৫] বিধবা কুসুমকুমারী।[৬] ...'ক্রমেই আমাদের গৃহে নিরাশ্রয়া বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।... এইরূপে অতঃপর আমাদের গৃহে সর্বদাই পাঁচ ছয়টি করিয়া উপরি বালিকা থাকিত। ইহাদিগকে লইয়া আমরা পরম সুখে বাস করিতাম।'[৭] আশ্রয়দান করে শুধু কি শিবনাথই সুখ পেতেন! আশ্রিতজনেরও এমন নিরাপদ ও নিশ্চিত আশ্রয় ছিল না। আশ্রিতা লক্ষ্মীমণি একটি পত্রে লিখেছেন, '...পূর্বের

and education and, if possible, opportunities of re-marraige in the Brahmo Samaj.'—Bipin Chandra Pal, Memoirs of My Life and Times.

১। এই ধরণের পতিতা নারীদের বহু কাহিনী আমি শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনেছি। এঁদের সন্তানেরা বহু উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে সেগুলি অপ্রকাশ্য ভেবে তাদের বিস্তারিত উল্লেখে বিরত থাকলাম।

২। অমৃতলাল গুপ্ত, আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ৮৭-৮৯।

৪। তদেব, পৃ: ১২২-২৩।

৫। তদেব, পৃ: ১৩৪-৩৬।

৬। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ: ১৪৪।

৭। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ১৬৫।

ন্যায় এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। ইঁহাদের ভালবাসায় আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। শিবনাথবাবুর সততায় আমি অনেক সময় ভাবি তিনি মানুষ না দেবতা। রাগ নাই, সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই, আপন পর ভেদ নাই; আমাকে ঠিক নিজের কন্যার মত ভালবাসেন। এরূপ সাধুলোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে আমি আর কোন সুখ চাই না।'[১] শিবনাথের নারী-স্নেহের এটি একটি মূল্যবান দলিল।

এই সকল আশ্রিত সম্পর্কে আরও একজনের অন্তঃশায়ী স্নেহের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি শিবনাথের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী। আশ্রিত নারীগণকে তিনি সন্তান স্নেহে পালন করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোন আলস্য বা বিরাগ ছিল না। কন্যারা এইজন্য তাঁকে অভিযোগ করে বলতেন, 'মা যীশুখ্রীষ্ট পরকে আপনার ন্যায় ভালবাসিতে বলিয়াছেন, আপনার চেয়ে বেশী ভালবাসিতে বলেন নাই। তুমি আমাদের চেয়ে তোমার ঐ সব মেয়েকে নিশ্চয় বেশী ভালবাস, তুমি ওদের জন্যই ব্যস্ত—এটা তোমার অন্যায়।'[২]

॥ ৩ ॥

স্বদেশ-সাধনা ॥

'স্বরাজ' শব্দটি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কলিকাতা কংগ্রেসে প্রথম ব্যবহার করেন উক্ত সভার সভাপতি দাদাভাই নৌরজী। এর অর্থ এই নয় যে, এই প্রথম ভারতবর্ষে স্বদেশ প্রেমের সূচনা দেখা দিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সূত্র করে যে চিন্তাধারা ভারতসমাজে প্রবাহিত হয়েছিল—এই সময়ে তার তুঙ্গ স্পর্শ করলেও ভারতবোধের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন রামমোহন রায়। '···The father of modeon Indian Nationalism.' রামমোহন ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, ব্রাহ্মসমাজেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল। শিবনাথ এই ব্রাহ্মসমাজেরই একজন প্রতিভূ। তাঁর স্বদেশপ্রেম

১। দ্রঃ, হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ১৩৪-৩৫
২। তদেব, পৃঃ ২০৩।

ও রাজনৈতিক চিন্তাবলী ব্রাহ্মসমাজে পুষ্টিলাভ করেছিল এবং প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছিল। শিবনাথের দেশপ্রেম কোন ছিন্নমূল ধারণা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কিভাবে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করে তার পটভূমিকায় দেশপ্রেমিক শিবনাথের স্বদেশ-সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক ইচ্ছা সংগুপ্ত ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারীর একটি পত্রে রামমোহন লিখেছেন,—'I regret to say that present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests ..It is I think, necesary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort'.[১]

ভারতের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই রামমোহন ইংলণ্ডে বসবাসকালে পার্লামেন্টের সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তৎকালীন ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা সি. ডব্লু. উইলিয়মকে একটি পত্রে লেখেন,—'It is not for any ambition to assume so arduous an office but from a desire to pave the way for his countrymen for which object R. R for a few months undertake this task ;[২] রামমোহন স্পষ্ট করেই তাঁর একান্ত সচিব মিঃ আর্নটকে বলেছিলেন, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হলে, 'British rule in India would last for about forty years'[৩] রামমোহনের এই বিশ্বাস ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের অসার অভ্যুত্থানের ফলে রূপায়িত হয়নি। রামমোহনের এই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা অখণ্ড ভারতবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বরং বলা ভাল, বিশ্বমানবতায় শ্রদ্ধাবান রামমোহন সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

১। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া' (১৩৫৫ সং) পুস্তকে উদ্ধৃত। দ্রঃ, পৃঃ ৭-৮।

২। তদেব, পৃঃ ৯।

৩। Bipin Chandra Pal, The Brahmo Samaj and the Battel for Swaraj pp. 6.

বন্ধনবেদনা থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ইংরেজ-পদানত ভারত-বাসীর বেদনা রামমোহনের রাষ্ট্র-চিন্তার প্রথম উপাদান ছিল। এই বোধ রামমোহনের সার্থক উত্তর সূরী দেবেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। মিশনরীদের প্রচারের মূলে 'কুঠারাঘাত'[১] করতে এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর পশ্চিম-সর্বস্ব চিন্তাকে তিনি যে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর অখণ্ড ভারতসত্তাবোধই সক্রিয় ছিল। তাঁর 'আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ' বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচার ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাকে শাস্ত্রাদির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে একটি পত্র লিখে সেটিকে মাদ্রাজ, অযোধ্যা ও বোম্বাই-এ প্রেরণ করেন। এই পত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে মাদ্রাজে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, 'Improvement and efficiency of British Indian Government by every legitimate means in its service'[২]

শুধু তাই নয়। দেবেন্দ্রনাথ বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ বা উপাধি লাভের জন্য বিন্দুমাত্র লালসা প্রকাশ করতেন না। বিপিনচন্দ্র পাল একথার উল্লেখ করেছেন।[৩] এদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ 'was really the first and the most persistent non-co-operator among the leaders of our thought and life'[৪] তবে এ প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দেবেন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ছিল না, বরং অধিক পরিমাণে ধী-গত, নীতিগত ছিল।

নবযুগের বাংলার স্বাধীনতার প্রথম সাধনা ছিল ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজা। জাতিভেদ, আহারাদি, বিবাহ সম্পর্কে পুরনো ধারণাকে বদলে

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (৪র্থ সং, ১৩৬২), পৃঃ ৬৫।

২। C. F. Andrews and Girija Mukherjee, The Rise and Growth of the Congress in India. pp. 105-6.

৩। 'The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans' বলেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল লব সাহেব, দ্রঃ, বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, (২য় সংস্করণ, ১৩৬৪), পৃঃ ১৩৩।

৪। Bipin Chandra Pal, The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj, pp. 18.

ফেলে ব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। অবশ্য এই চিন্তা রাষ্ট্রিক-বিরোধজাত ছিল না। পরন্তু বিরোধটা ছিল ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় পর্যায়ে এই স্বদেশচিন্তা সামাজিক বিদ্রোহের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সত্যাসত্য নির্ধারণে ব্যক্তিবোধ, শাস্ত্র ব্যাপারে ব্যক্তিচিন্তা ও ধর্মমন্দিরে গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে কেশবচন্দ্রই প্রথম এই আন্দোলনকে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' অভিধায় অভিহিত করেছিলেন।[১]

কেশবচন্দ্র 'Jesus Christ: Europe and Asia' শীর্ষক বক্তৃতার[২] একাংশে ইউরোপীয়ন-দের সঙ্গে নেটিভ-দের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'Indeed, many a native is so afraid of a European, that he would never, if he could avoid it travel in the same railway-carraige with him And this fear, be it said, is not the fear due to a superior nature, but that which brutal ferocity awakens. Thus while the European hates the native as a cunning fox the latter fears the former as a ferocious wolf.'[৩]

ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি যে 'England's duties to India' নামে বক্তৃতা দেন তাতেও ব্রিটিশ সাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন, 'This discourse being general in character, dealing with administrative and educational questions largely, made the most widespread sensation both, in England and India—It was also critical and national.'[৪] সুতরাং কেশবচন্দ্রও যে কোন কোন দিক থেকে স্বাধীনতা মন্ত্রের সাধক ছিলেন, এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না।

১। Ibid, pp. 26.

২। মিঃ স্কট মনক্রিফ নামক একজন ভারত-বিদ্বেষী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যবসায়ীর মনোভাবের প্রতিবাদ-স্বরূপ এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়েছিল।

৩। বিপিনচন্দ্র পালের' The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj' গ্রন্থে উদ্ধৃত, দ্রঃ, pp 41.

৪। তদেব, পৃঃ ৪৯।

কেশবচন্দ্রের উপর্যুক্ত বক্তৃতা দু'টি যথাক্রমে ১৮৬৬ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হয়েছিল। এর পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি সমাজের (কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ) সভ্য রাজনারায়ণ বসু এ দেশে নব স্বাদেশিকতার সূত্রপাত করেছিলেন। ১৮৬১[১] খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। বাংলা ভাষার প্রতি এই সভার প্রীতি তৎকালে সভাটিকে বিশিষ্ট স্বদেশীয়রূপ দান করেছিল।[২] এর কার্যবিবরণী পুস্তিকা 'Prospectus of a Society for the promotion of national feeling among educated natives of Bengal' পাঠে, বন্ধুবর নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার ভাব পান। তিনি ঐ মেলা ও তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।[৩] আরও অনেক পরে (১৮৭৭?) স্থাপিত একটি গুপ্ত স্বাদেশিক সভার উদ্যোক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।[৪]

নবগোপাল মিত্র দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে ও 'Grandfather of Indian Nationalism' রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে 'চৈত্র মেলা' (পরে হিন্দু মেলা) নামে একটি স্বদেশ-ভাবোদ্দীপক মেলার অনুষ্ঠান করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ঐক্য

১। রাজনারায়ণ বসু অবশ্য ভুলক্রমে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সালটিকে ১৮৬৬ বলে উল্লেখ করেছেন।

২। 'জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভার সভ্যেরা "গুড নাইট" না বলিয়া "সুরজনী" বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখ করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা জরিমানা হইত।'—রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃঃ ৫২।

৩। তদেব, পৃঃ ৫২।

৪। বিপ্লবী মাৎসিনির 'কার্বোনারি' আন্দোলনের অনুসরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠনঠনের এক পোড়ো বাড়ীতে 'হামচুপামুহাফ' বা 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করেন। 'জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো-বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্ম-পরিচয় (১৯৬১), পৃঃ ৭৯।

প্রতিষ্ঠা, 'পরানুচিকীর্ষার পরিবর্তে' আত্মনির্ভরতা স্থাপন এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল।[১] ইহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।[২]

হিন্দুমেলার এই ভারতচিন্তা সে সময়ের কয়েকটি তরুণের মনেও গভীর রেখাপাত করে। এঁদের মধ্যে শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রধান। এঁরা হিন্দুমেলার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন কোন একটা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজই সর্বপ্রথমে একটা পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে এগিয়ে আসে। 'The Brahmo Samaj was not a political movement but its rationalism, its universalism, its concept of the religion of humanity, and its ideal of synthesis of the east and the west, prepared the intellectual foundations for future national movements. It was deeply individualistic protest and signified the rise of individual reason, heart and conscience against what, it considered, degrading and barbarizing customs. Thus the Brahmo Samaj was akin to the movements of rationalistic enlightment and free thought of Europe.'[৩]

যাই হোক, এই হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনে[৪] (১৮৬৭) তরুণ বয়সেই দেশপ্রেমদ্যোতক কবিতা রচনার জন্য শিবনাথ আহূত হন এবং

১। 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কেবল আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা কেবল স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য।...যাহাতে আত্মনির্ভর ভারতে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।'—হিন্দু মেলার দ্বিতীয় কার্যবিবরণী—গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা, যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, দেশ, ১২ই পৌষ ১৩৪২। পৃঃ ৪২৩।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু. সাহিত্যসাধক চরিতমালা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২।

৩। V. P. Verma, Modern Indian Political Thought, pp. 39-40.

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে ভ্রমক্রমে লিখেছেন যে, শিবনাথ দ্বিতীয় অধিবেশনে এই কবিতা পাঠ করেছিলেন। অথচ 'সোমপ্রকাশ' থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কবিতাটি ১২ই এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে পঠিত হয়েছিল।

একশত শ্লোকব্যাপী[১] এক সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। সম্ভবতঃ এই প্রথম প্রকাশ্যে শিবনাথ স্বাধীনতা-মূলক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তবে এরও বহু পূর্বে বাল্যকালে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার মধ্যে শিবনাথের স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করেছি।[২]

জাতীয়তার ভাব শিবনাথের অন্তরে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতাবোধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রগতি প্রথমে সার্থকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা, 'মহাপুরুষবাদ' ইত্যাদি ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে উগ্র স্বাধীনতাকামীদের শীঘ্রই বিরোধ উপস্থিত হল। ক্রমে সেই বিরোধ প্রকাশ্যে কেশবচন্দ্রকে অপসারণের দাবী নিয়ে এগিয়ে এল। ব্রাহ্মসমাজে যখন এই আন্দোলন চলছে, তখন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে[৩] 'ভারতসভা' (Indian Association) স্থাপিত হল।[৪] শিবনাথ এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। এলবার্ট হলে প্রকাশ্যে সভা করে এই সভা স্থাপিত হল। শিবনাথ এই সভার প্রথম চাঁদা আদায়কারী সভ্য হলেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য শিবনাথকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত।

ইতিমধ্যে বিশ্বের রাজনীতিতে এক প্রবল আন্দোলনের ঢেউ এসে উপস্থিত হয়েছিল। ইতালীর স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এদেশের স্বাধীনতাকামীদের মনকে পরিপ্লাবিত করেছিল। 'ম্যাটসিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্মচেষ্টা, যূন ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland)

১। দ্রঃ, সোমপ্রকাশ, ১৮ই শ্রাবণ ১২৭৪ ও ৫ই কার্তিক ১২৭৪ সংখ্যাদ্বয়।

২। 'আমি স্বদেশী ভাবাপন্ন'—শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৬৫-৬৬।

৩। ২৬শে জুলাই ১৮৭৬।

৪। এই সভা স্থাপনের পূর্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর Zaminder s Association বা Land Holder's Association (12. 11. 1837) নামক একটি রাষ্ট্রিক সমিতি স্থাপন করেছিলেন। পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত Bengal British Indian Society এই ধরণের একটি সভা ছিল। সভা দুটি পরে একত্রিত হয়ে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ অক্টোবর তারিখে British Indian Association নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এই সভাগুলি কয়েকজন প্রভাবশালী ও বিত্তবান ব্যক্তির আশ্রয়স্থল ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার রক্ষায় এই সভার তেমন একটা দৃষ্টি ছিল না।

আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্যা'র কথা 'ভারত সভার' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথই এদেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেন। 'ভারত সভা' মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকার স্থাপনের জন্য সর্বাংশে আন্দোলনে লিপ্ত হল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বরিশাল থেকে দুর্গামোহন দাস এসে শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তির আন্দোলন শুরু করে দিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই শিবনাথ সরকারী কর্মত্যাগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সরকারী চাকুরী করে স্বদেশের প্রতি কর্তব্য পালন করা যায় না—এই ছিল তাঁর ধারণা।[১]

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কুচবিহার বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিচ্ছেদ এল। ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। অত্যুগ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা এর অন্তরালে সক্রিয় ছিল। এই বিচ্ছেদ আসার পূর্বেই শিবনাথ চাকুরী ত্যাগ করলেন (১লা মার্চ ১৮৭৮)। চাকুরী ত্যাগের পূর্বে শিবনাথ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বরানগরের একটি উদ্যানের অন্ধকার গৃহে কাঠের আগুন জ্বালালেন। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিয়েছেন—"শাস্ত্রী মহাশয়ের বুক চিরিয়া রক্ত দ্বারা একখণ্ড কাগজে লিখিলেন—'একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিব না। সরকারী চাকুরী করিব না।...ব্রহ্মোপাসনান্তর বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।'[২] এই প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম কথা ছিল, 'স্বায়ত্ত-শাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।'

কাজেই দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শিবনাথের স্বাধীনতাবোধের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'Sadharan Brahmo Samaj opened a new chapter in the history of the present freedom movement or Swaraj movement...'[৩] শিবনাথ এই সাধারণ

১। এই প্রসঙ্গে 'উৎসর্গ' (পুষ্পমালা) কবিতাটি পাঠ্য। কারণ এই কবিতাটি রচনা করার পরই তিনি চাকুরী ত্যাগের সংকল্প করেছিলেন।

২। কৃষ্ণকুমার মিত্র, তত্ত্বকৌমুদী, ১লা অগ্রহায়ণ ১৮৭৮ সংখ্যা।

৩। Bipin Chandra Pal, The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj. pp. 52.

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে স্বাধীনতাকামীদের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়লেন।[১]

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে শিবনাথ কয়েকবার সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। প্রচারকালে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সঙ্গে শিবনাথ ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতেন[২] এবং বহুস্থানে এ বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমরা দেখেছি ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজে 'Bengal as it is', ১৬ই সেপ্টেম্বর আমেদাবাদের Hembhai Institute-এ 'India's Greatest Need', ২৭শে সেপ্টেম্বর বরোদাতে 'The Sources of National life' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।[৩] ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে শিবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

শুধুমাত্র ভারত ভ্রমণের সময়ই নয়, ইংলণ্ড প্রবাসকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা শিবনাথের মনকে বহুল পরিমাণে চঞ্চল করে রেখেছিল। ইংলণ্ডের ডায়েরির বহুস্থানে আমরা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে মুদ্রিত দেখি। মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি সম্পর্কে শিবনাথের উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাই তিনি লিখেছেন, 'ভারতবর্ষও অগ্রে 'ইউনাইটেড' ভারতবর্ষ হওয়া চাই, তৎপরে 'ফ্রী' ভারতবর্ষ হইবে।'[৪] ইংলণ্ড অবস্থানকালে শিবনাথ 'আসামকুলী'[৫] সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত করেন। Mr. Maclaren M.P.-র সঙ্গে 'সাক্ষাৎ করিয়া আসামের কুলীদিগের বিষয় অনেক কথা' শিবনাথ তাঁকে বলেন।[৬] বিলাতে তিনি W. T. Stead-এর সঙ্গে Self Govt. in India ও Burmese Question নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিলাতেই দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে তিনি আসামকুলী আইন ও লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় এজেন্সী সম্বন্ধে কথা বলেছেন। এবং Prof Stewart-এর কাছে

১। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪, পৃঃ ৪৮০।

২। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজি ও শিবনাথের সাক্ষাৎকারের ঘটনাও স্মর্তব্য।

৩। দ্রঃ, হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ১৮৮ ও ১৯১।

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৫। 'আসাম কুলী আন্দোলন' সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দ্রঃ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ৬৭-৬৮ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ২১৫-১৬।

৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ১১৬।

বারবার গিয়ে যাতে পার্লামেন্টে আসাম কুলী আইন নিয়ে আলোচনা হয়, সেজন্যে ঐ বিষয়ে বহু নথিপত্র দিয়ে এসেছেন।[১] প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'পেলমেল গেজেটে' প্রকাশের জন্য 'A Plea for Slavery in India' প্রবন্ধের 'ওয়েপন সাপ্লায়ার' হয়েছিলেন।[২]

যাঁদের অন্তর স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ থাকে তাঁরা বিদেশে গিয়ে স্বদেশের প্রতি আরও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বিবেকানন্দেরও এই উপলব্ধি ঘটেছিল। বিলাত থেকে ফিরে আসার পথে জাহাজে বসে কন্যা হেমলতাকে শিবনাথ একটি চিঠি[৩] লিখেছিলেন। স্বদেশের চিন্তা শিবনাথের চিত্তকে কিভাবে উদ্বেলিত করে তুলেছিল, চিঠিটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'যতই বাড়ীর দিকে যাইতেছি, ততই দেশের দুর্ভিক্ষ, প্রজাদের দারিদ্র্য অজ্ঞতার কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষন্ন হইতেছে। আবার গিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে।' ভারতবর্ষের প্রজাদের গভীর দরিদ্রাবস্থার বিষয়ে ইংলণ্ডে বক্তৃতাদিও দিয়েছিলেন।[৪]

ক্রমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। বাংলা সরকার ঠিক করলেন ৩০এ আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) তারিখে বঙ্গদেশে দ্বিখণ্ডিত শাসন প্রবর্তিত হবে। জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার্থে রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসব পালন করেন। কিন্তু এর পরিকল্পনা ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য মৃত্যুশয্যায় শায়িত আনন্দমোহন বসুর।[৫] ছাত্ররাও এই আন্দোলনে মেতে উঠলেন। অধ্যাপক শশিমোহন বসাকের নেতৃত্বে জগন্নাথ কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিদেশী-বর্জন প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাত্র-দলন যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে যায়। ২২এ অক্টোবর তারিখে সরকার পক্ষ থেকে মিঃ কার্লাইল স্কুলে স্কুলে ইস্তাহার পাঠিয়ে ছাত্রগণকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ পাঠালেন। রংপুরের ছাত্রদিগকে রাজনীতিতে যোগদানের অপরাধে বহিষ্কৃত করা হয়েছে—এই সংবাদ সংবাদপত্রে

১। তদেব, পৃঃ ১৪১।
২। তদেব, পৃঃ ১৩৫।
৩। দ্রঃ হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২২৮। পত্র রচনার তারিখ ১৯-১১-১৮৮৮।
৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ১৬৫ ও ১৬৮।
৫। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া। পৃঃ ১৪২-৪৩।

প্রকাশিত হওয়ামাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একটি 'Anti Circular Society' স্থাপন করিলেন। ছাত্র-দলন নিবারণের জন্য একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ঐ সভায় করা হল। 'ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ধর্মাচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদিগকে স্বদেশের জন্য প্রয়োজন হইলে এক বৎসরের জন্য পড়াশুনা স্থগিত রাখিতে আহ্বান করিলেন।'[১] ছাত্রসমাজে শিবনাথের প্রভাব এত সুদূর-প্রসারী ছিল যে, এই দেশের ডাকে কয়েকজন P. R. S ও এম. এ. পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় উপস্থিত না হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।

আমরা জানি যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই বিদেশী-দ্রব্য বর্জন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু এর পূর্বে ব্রাহ্মসমাজেও (এবং হিন্দু মেলাতেও) এই মানসিকতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। শিবনাথ লিখেছেন, 'এই সময় (১৮৭৮) হইতে আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম যে, স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করা আবশ্যক। আমরা যেখানে সেখানে এই বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। তাহার ফল স্বরূপ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী দেখা দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশই স্থায়ী হইল না। আমরা বঙ্গব্যবচ্ছেদের বহুদিন পূর্ব হইতেই যথাসাধ্য স্বদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম।'[২] 'Brahmo Public Opinion ও তত্ত্বকৌমুদীর কয়েকটি সংখ্যায় এই বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। Brahmoism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically and politically.'[৩] পাক্ষিক তত্ত্বকৌমুদী এই একই জাতীয় ভাবকে প্রকাশ করে লিখেছে, '(ব্রাহ্মসমাজ) অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া পৃথিবীব্যাপী একটি মহা সাধারণতন্ত্রের আয়োজন করিতেছেন।'[৪] শিবনাথ ছিলেন এই জাতীয়-যজ্ঞের সার্থক হোতা।[৫]

শিবনাথের দেশপ্রেম তৎকালীন বঙ্গসমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার

১। তদেব, ১৪৮।

২। সুপ্রভাত, ১৩১৪। [পত্রিকাটির ছিন্নাবস্থা হেতু এর তারিখ ইত্যাদি সংগৃহীত হয়নি।]

৩। Brahmo Public Opinion, March 21, 1878, pp. 2.

৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩ই ফাল্গুন, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। এ সময়ে রচিত শিবনাথের দেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধগুলি এ প্রসঙ্গে পাঠ্য।

করেছিল, তার একটি প্রমাণ বিবেকানন্দানুজ বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ, ১২ই মার্চ ১৯০৬) 'যুগান্তর' নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' (১৮৯৫) উপন্যাস থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

শিবনাথের দেশপ্রেম পরম নির্ভীকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'কারবোনারি' দলের অনুপ্রেরণায় যিনি 'অগ্নিমন্ত্রে' দীক্ষা নিয়েছিলেন, স্বদেশের জন্য তিনি যে দুঃসাহসিক হবেন, তা অস্বাভাবিক নয়। এর প্রমাণ শিবনাথ বৃদ্ধাবস্থাতেও দিয়ে গেছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয়জন স্বদেশীকে নির্বাসিত করা হয়। এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সভা আহূত হয়, রাজভয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় দেশনায়কগণও সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত হন নি—পাছে গভর্ণমেণ্টের কু-দৃষ্টিতে পড়তে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সাগ্রহে সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

দেশপ্রেমিক শিবনাথ দেশবাসীর সঙ্গে 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা' অর্জন করেছিলেন; ঈশ্বরানুরক্তির পরেই তাঁর জীবনে দেশপ্রেম প্রাধান্য লাভ করেছিল। কবিতায়, উপন্যাসে ও প্রবন্ধাবলীতে তার স্বাক্ষর শিবনাথ গভীরভাবে রেখে গেছেন। ধর্মকে তিনি স্বদেশের উন্নতির উপায় ভেবেছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মোপাসনাকালে সমুদয় জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু শিবনাথই প্রথম স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার রীতি প্রবর্তন করেন। তিনিই প্রথম স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বাংলা উপাসনা-সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করেন। গানটির শুরু এই প্রকার—'তব পদে লই শরণ। আর্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি, অবসন্ন আছে, অচেতন হে।'[২] এই প্রকার বহু কবিতার মধ্যেও শিবনাথ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই স্বদেশ প্রেমের বাণী গ্রথিত করে গেছেন।[৩] বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মধ্যে তাঁর স্বদেশ বিষয়ক গভীর চিন্তা বিধৃত রয়েছে।

১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (২য় সংস্করণ ১৯২৮) পৃঃ ৮।

২। দ্রঃ, বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত চিত্র (১৯৫৮), পৃঃ ২৬৭-৬৮।

৩। যথা, 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের 'বহুদূর নয়' কবিতাটি। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীত রচনার ছত্রিশ বছর পূর্বে শিবনাথ ভারতের সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বদেশ-নিমিত্ত প্রাণোৎসর্গের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ভারত সভার প্রতিষ্ঠা (১৮৭৬) থেকে বর্তমান শতকের স্বদেশী-আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয় আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে শিবনাথ প্রমুখের চিন্তা, উদ্দীপনা ও আদর্শ বাংলাদেশ থেকেই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাদেশিকতার বীজপ্রসবিনী বাংলাদেশের প্রতি শিবনাথের গভীর মমতার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম বঙ্গদেশের গণ্ডীকে অতিক্রম করে সারা ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। শিবনাথের স্বাদেশিকতা অখণ্ড ভারতবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কবি শিবনাথ

প্রথম অধ্যায়

কবিতার প্রথম পর্য্যায়ঃ কবিজীবনের উন্মেষ ও অগ্রগতি

শিবনাথ আবাল্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মাতা গোলোকমণি দেবীর কাছে তাঁর সকল শিক্ষার হাতে খড়ি। গোলোকমণি দেবী সে সময়ের তুলনায় অনেক বেশী লেখা-পড়া জানতেন। 'মা প্রায় প্রতিদিন দুপুরবেলা রামায়ণ পড়িতেন। দুপুরবেলা তিনি নিজে পড়িতেন ও আমাকে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতেন।'[১] রামায়ণের পয়ার ছন্দে বালক শিবনাথের ছন্দের কান তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া পাশের বাড়ীর এক গৌরাঙ্গী বিধবা যুবতী শিবনাথের কাছে রামায়ণাদি গ্রন্থ পড়তেন।[২] বাল্যকালে রামায়ণের দল খুলে ছড়া কেটে বাড়ী বাড়ী গান শুনানোর ব্যাপারে বালক শিবনাথের প্রচুর আগ্রহ দেখা যেত।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নয় বছর বয়সে পড়াশুনোর জন্য শিবনাথ কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এখানে অবস্থান কালেই কবিতায় শিবনাথের হাতে খড়ি হয়। সহপাঠী 'স্ফীতকায় গঙ্গাধর' একবার ক্লাসে প্রথমস্থান অধিকার করলে ঈর্ষ্যান্বিত শিবনাথ কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা রচনা করে সহপাঠীদের পড়ে শোনান। তার চার পঙ্‌ক্তি শিবনাথ আত্মচরিতে উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইজার চাপকান গায় ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতি,
বড় তার অহঙ্কার ধরা দেখে সরাকার
চলে যেন নবাবের নাতি।

—'নবাবের নাতি' নালিশ করল। ইংরেজি শিক্ষক রাধাগোবিন্দ মৈত্র

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২১ ও ৪৫।

২। তদেব, পৃঃ ২৮।

৩। তদেব, পৃঃ ৫৪। এর সঙ্গে 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির ছন্দ-সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

মহাশয় কবিতার বিষয়বস্তুকে তিরস্কার করলেও রচনাটির প্রশংসা করায় শিবনাথের 'কবিতা লিখিবার উৎসাহ বাড়িয়া গেল।' 'ফলত, আমি যে কত ছোট বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই।' কবিতাটির মধ্যে রামায়ণের ত্রিপদীছন্দের প্রভাবের চেয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ত্রিপদী ছন্দের প্রভাবই সমধিক অনুমান করি। কারণ কলকাতায় বসবাসকালে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা 'গিলিয়া' খেতেন। গুপ্তকবির সংবাদ প্রভাকরে শিবনাথের মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সহায়তা করতেন। (হরচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত দুজনেই হাতিবাগানের কাশীনাথ তর্কালংকারের ছাত্র ছিলেন।) পরিবারগত এই যোগের জন্যও সম্ভবতঃ শিবনাথ গুপ্তকবির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ ছাড়া বাড়ীর পরিবেশও শিবনাথের কাব্য রচনায় আনুকূল্য দান করেছিল। বিশেষ করে পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন কবিতার 'রসগ্রাহী মানুষ; তিনি বন্ধুদের সহিত ভারতচন্দ্র প্রভৃতির কবিতার সমালোচনা করিতেন।'[১] এই সব নানা কারণে শৈশব থেকেই শিবনাথের কবিতা রচনার 'বাতিক' জেগেছিল। পরিণত বয়সে শিবনাথের একটি মন্তব্যের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বছর দশেক বয়সে তিনি একটি খাতায় বহু কবিতা লিখে রাখতেন। সেগুলি যদি পরের কবিতার নকলও হয়ে থাকে, তবুও শৈশব থেকে যে তাঁর একটা কাব্যরুচি গড়ে উঠেছিল, এটি তার উপযুক্ত প্রমাণ।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশ' আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকায় ও প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত[২] 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় শিবনাথের ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। উভয় পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় এ ব্যাপারে শিবনাথকে উৎসাহ দান করতেন।

পূর্বেই বলেছি বাল্যকালে শিবনাথ গুপ্তকবির ভক্ত ছিলেন সম্ভবতঃ তাঁর কবিতার ব্যঙ্গাত্মক ভাবকেই তিনি বিশেষ করে আত্মীয়করণের চেষ্টা

১। স্মর্তব্য, হরানন্দ ভট্টাচার্য কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে তাঁর 'নলোপাখ্যান' কাব্যগ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। শিবনাথের কাব্যের উপর এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

২। প্যারীচরণ সরকার মার্চ ১৮৬৬ থেকে ৩১এ জুলাই ১৮৬৮ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনা করেন। বহু সন্ধানেও এই সংখ্যাগুলি পাইনি।

করতেন। একটি বাঙালী ডাক্তারের সাহেবিয়ানা বালক শিবনাথের ব্যঙ্গের খোরাক হয়েছিল। 'বাঙালীর প্রিয় যাহা তাহার উপরে বিদ্রূপ বর্ষণ' করে 'এস. এন. ডট্' ছদ্মনামে শিবনাথ 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক কবি এর প্রত্যুত্তর দেওয়ায় 'কাব্যচর্চা ও কবিতা যুদ্ধ' বেশ জমে উঠেছিল, গুপ্তকবির ঢঙে শিবনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,—

ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল-লোচনা,
বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ-ললনা।[১]

বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, 'তাঁহার কবি-প্রতিভা প্রথমে "সোমপ্রকাশে" ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্যঙ্গরসাত্মক কাব্য-সৃষ্টিতে তিনি ইতিমধ্যেই নতুন যুগের বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।' ঈশ্বর গুপ্তের 'কাব্যরস বহুল পরিমাণে গ্রাম্যভাব-প্রধান ছিল। কিন্তু শিবনাথের ব্যঙ্গরস সুমার্জিত এবং বহুল পরিমানে শিষ্ট রুচি সঙ্গত ছিল।'[২] এই প্রসঙ্গে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও শিবনাথের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'[৩] 'বৈষ্ণব কবিদিগের অনুসরণে' 'সুন্দরী সুন্দর' নামে ('কেন না হইনু আমি যমুনার জল রে' ইত্যাদি শীর্ষক) একটি কবিতা প্রকাশ করেন। শিবনাথ কবিতাটির একটি প্যারোডি রচনা করেন। সেখানে তিনি বৃন্দাবনলীলার পরিবর্তে "বাংলার কূলবধূদিগের গৃহস্থালীর সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত 'রসোদ্গার'" রচনা করেন (যথা, 'কেন না হইনু আমি মাছের ধুনুচি' অথবা 'কেন না হইনু আমি শলিতার কানি' ইত্যাদি)।

শিবনাথের এই কবিতাটি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি 'তাঁহার কবি-প্রতিভা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।'[৪] অবশ্য এ ব্যাপারে নবীনচন্দ্র সেন ভিন্ন প্রকারের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বঙ্কিম-চন্দ্র' 'মুগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে ক্রুদ্ধই হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,

১। দ্র:, শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ৬৭।

২। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪।

৩। 'আকাঙ্ক্ষা', বঙ্গদর্শন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১২৭৯, পৃ: ১০৭-৯ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ)।

৪। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪।

নবীনচন্দ্র লিখেছেন,—'সে (শিবনাথ) উহা maliciously (অসরলভাবে) করিয়াছিল।[১] এবং সেকারণেই শিবনাথকে কখনও বঙ্গদর্শনে লিখতে দেননি।[২]

এই প্রসঙ্গে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে শিবনাথের পরিচয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। শিবনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সহপাঠী উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নবীন কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নবীনচন্দ্র সেনের একটি কবিতা শিবনাথ ইতস্ততঃ রং-রিপু করে দিয়ে 'এডুকেশন গেজেটে' ছাপাবার বন্দোবস্ত করে দেন (নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'-র অন্তর্গত 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' (১৮৬৪ রচনাকাল) কবিতাটি)। নবীনচন্দ্র লিখেছেন,[৩] 'তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা ছাত্র। সেই বয়সেই কবি বলিয়া পরিচিত।' তাঁকে কাব্যক্ষেত্রে উৎসাহদানের ব্যাপারে শিবনাথের ভূমিকার কথা নবীনচন্দ্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে শিবনাথ 'সোমপ্রকাশে' কতকগুলি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। শিবনাথ স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন যে, 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রেরণাতেই তাঁর কবি জীবনের বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করে।—'I can clearly trace the growth of my poetical talents to the encouragement given by my uncle.'[৪] বেনামীতে ও ছদ্মনামে প্রকাশিত (অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত) এই কবিতাগুলির কিছু কিছু নমুনার উল্লেখ করে আমরা শিবনাথের সেই সময়কার কাব্য-স্বরূপ আলোচনা করছি। পরে প্রথম কাব্যগ্রন্থ-'নির্বাসিতের বিলাপের' আলোচনা করব। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে (২২. ৮. ১৮৬৯) শিবনাথের কবি-জীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কবিতাগুলির স্বাদে ও ভাবে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পূর্বের কবিতাগুলিকে

১। নবীনচন্দ্র রচনাবলী (সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৬), আমার জীবন, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২-৬০।

২। বঙ্কিম-শিবনাথ-সম্পর্ক নিয়ে রচিত একটি প্রবন্ধ বর্তমান সমালোচক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র, তত্ত্বকৌমুদী, ৯১ বর্ষ, ১৭-১৮ সংখ্যা, ১লা ও ১৬ই পৌষ ১৩৭৫।

৩। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, আমার জীবন, পৃঃ ১০৫।

৪। Shivanath Sastri, Pandit Dwaraknath Vidyabhusan, Men I Have Seen, pp. 28.

প্রথম পর্যায়ভুক্ত ও তার পরের কবিতাগুলিকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত 'আলিপুরের মেলা'[১] নামক কবিতাটি কবির নামপরিচয়হীন রচনা হলেও এটিকে শিবনাথের লেখা বলে অনুমান করতে বাধা নেই। কারণ কবিতাটি 'খেড়োপোস্তা' থেকে প্রেরিত। শিবনাথ এ সময়ে (১৮৬৪) 'খেড়োপোস্তা' অঞ্চলে বাস করছিলেন। তাছাড়া, 'সোম-প্রকাশে' শিবনাথের বেশির ভাগ রচনা 'শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু' এই সম্ভাষণে প্রেরিত হত। এই কবিতাটি সেই 'প্রেরিত'-শ্রেণীভুক্ত। আর কবিতাটিতে ভাব-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাৎ অনুসরণও লক্ষ্য করা যায়। আলীপুরের মেলাস্থলে আগত বিচিত্র জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী লেখককে সর্বাধিক পরিমাণে আকর্ষণ করেছে। শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে 'মগেদের শিল্পকার্য বঙ্গে টেক্কা দিতেছে।' এবং 'মুঙ্গেরের তুরগেয় বামনিয়া' গঠন দেখে 'মেয়েদের খুসী ঢের ধরে নাকো বদনে।' এছাড়া নূতন 'ধানভানা কল' দেখে কবির সামাজিক অবস্থার কথা মনে হয়েছে। কারণ কৃষকদের সে কল কেনার সাধ্য নেই। কবি জমিদারের কাছে দরবার করেছেন,—

'জমিদার, অত্যাচার, প্রকাশ না করিয়া
কটা কল, কটা হল,'—যদি চাষীদের কিনে দেন তাহলে,
পেট্রিয়ট, পত্রপাঠে পটাপট লিখিবে॥
বীডনের, শাসনের, তবে শিঙা বাজিবে।
এই মেলা ছেলে খেলা, কেহ নাহি বলিবে॥

মেলার স্বাভাবিক বর্ণনার মধ্যে একটু সামাজিক চিন্তার সংমিশ্রণ কবিতাটিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে। ছন্দ ও বর্ণনার দিক থেকে কবিতাটিতে গুপ্ত-কবির ভক্ত তরুণ কবির শিক্ষানবিশী ফুটে উঠেছে। আবার ক্রিয়াপদের এই প্রকারের মিল দেখে হেমচন্দ্রের প্রভাবের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়।

অপর একটি কবিতা 'এস এস বিদেশিনী'।[২] কবিতাটিতে ভারতহিতৈষিণী মিস মেরী কার্পেন্টারকে স্বাগত জানান হয়েছে। 'অভাগিনী বঙ্গবালাকে'

১। সোমপ্রকাশ, ২০এ মাঘ, ১২৭০।
২। সোমপ্রকাশ, ১২এ অগ্রহায়ণ, ১২৭৩।

উদ্ধার করতে 'বঙ্গসখী' আসছেন। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে লেখক নবাগতাকে 'ভক্তিগুণে প্রীতিপুষ্পে' গাঁথা হার উপহার দিয়েছেন। কবি-পরিচয়হীন এই কবিতাটি 'ভবানীপুর, ১৮৬৬ ২৭এ নবেম্বর' এই ঠিকানায় ও তারিখে রচিত। এছাড়া এ কবিতাটিও পূর্ববৎ 'মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু' সম্ভাষণে সম্ভাষিত।[১] কাজেই অনুমানে বাধা নেই, এটিও শিবনাথের রচনা।

শিবনাথ 'শ্রী শিঃ', এই ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। 'আত্মচরিত'ও 'সমদর্শী' পত্রিকায় এর প্রমাণ পেয়েছি। 'জাষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত'[২] শীর্ষক কবিতাটি এই 'শ্রী শিঃ' ছদ্মনামে লিখিত (ভবানীপুর ৪ঠা শ্রাবণ ১২৭৪ সালে)। কবিতাটি জাষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ। দীনহীন অবস্থা থেকে সূর্যরশ্মির মত আপনাকে প্রকাশ করে শম্ভুনাথ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু,

'উচ্চপদে কিছুকাল না থাকিতে পোড়া কাল
তোমা ধনে হরণ করিল।'

—মহাদানী শম্ভুনাথের অকাল মৃত্যুতে 'নিরাশ্রয় অশরণ' ব্যক্তিরা গভীর দুঃখে পতিত হল। আপন অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি বলেছেন, এই যে সামান্য অবস্থা থেকে তিনি এত বড় হয়েছেন, এর পিছনে ঈশ্বরের সদিচ্ছা সক্রিয়।—'ঈশ্বর বাড়ান যারে কে তারে রোধিতে পারে'। (এই পঙক্তিটিকে শিবনাথ উত্তর জীবনে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ধ্রুবপদ হিসাবে বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন)।

ত্রিপদীতে রচিত এই কবিতাটি বিশেষ কারণে উল্লেখ যোগ্য। এটিই সম্ভবতঃ প্রথম কবিতা, যেখানে শিবনাথ সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এনেছেন, ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন। শিবনাথ আবাল্য আস্তিক ছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই (১৮৬৭) শিবনাথের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। ভবানীপুরে বাস কালেই তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে সংগোপনে প্রায় নিয়মিত বক্তৃতাদি শুনতে যেতেন।[৩] এই অর্ধস্ফুট ঈশ্বর-

১। স্মর্তব্য, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ছিলেন শিবনাথের পূজনীয় জ্যেষ্ঠ মাতুল।

২। সোমপ্রকাশ, ৭ই শ্রাবণ ১২৭৪।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৫৭।

বোধযুক্ত কবিতাটিকে আমরা শিবনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করতে পারি।

'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'চৈত্র মেলা'।[১] স্বাদেশিক শিবনাথের স্বাদেশিকতায় প্রথম হাতে খড়ি হয়েছিল নবগোপাল মিত্রের চৈত্র মেলায়। চৈত্র মেলার প্রথম অধিবেশনে শিবনাথ একশত শ্লোকে নিবদ্ধ একটি দীর্ঘ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। 'গত চৈত্র সংক্রান্তির মেলাতে যে পদ-প্রবন্ধটী পঠিত হয়, তাহাই প্রকারান্তরিত করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ পাইতেছে। রাজা বৈদ্যনাথের চিৎপুরের উদ্যানে সামাজিক উন্নতি সাধন উদ্দেশে এই উৎসবটি সম্পাদিত হয়।'[২] বিজয় সিংহের লঙ্কা-বিজয়ের দীর্ঘ কাহিনী অবলম্বনে বিংশতিবর্ষীয় কবি বাংলার পূর্ব গৌরব স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'বঙ্গের সে শুভদিন আসিবে কি আর রে?' বঙ্গমাতাকে ডেকে বলেছেন, 'মাথা তোল বঙ্গভূমি।' ক্রমে ক্রমে পাল বংশ, সেন বংশের কথা প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের কথাও লিখেছেন। শিবনাথের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী চিত্ত সেকথা স্মরণ করে ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে,—

ধিক্ রে লক্ষ্মণ সেন ধিক্ শতবার
থাকিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে আপনার
যদি পাত্রমিত্র সনে প্রবেশিতে হুতাশনে'

—তাহলে বঙ্গের গৌরব অক্ষুন্ন থাকত। এরপর বঙ্গের সংকটকালে প্রতাপাদিত্য 'নিজ বীরত্বের সাক্ষ্য করিল প্রদান ' ভক্তিনম্রচিত্তে কবি প্রতাপাদিত্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অসমাপ্ত এই কবিতাটির মধ্যে কবির স্বাধীনতার প্রতি আকর্ষণ ও স্বাধীনতাবোধে জাতিকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটির ছন্দে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচতে চায় হে' ইত্যাদি ছন্দের সাক্ষাৎ প্রভাব লক্ষণীয়। হেমচন্দ্রের স্বদেশমূলক কবিতার প্রভাবও অনতিক্রান্তী নয়।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা আরও দুটি কবিতার উল্লেখ এখানে

১। সোমপ্রকাশ, ২৮এ শ্রাবণ ১২৭৪, ৯ম ভাগ ৩৯ সংখ্যায় ১-৪৫ সংখ্যক ও ৪ই কার্তিক ১২৭৪, ৪৮ সংখ্যায় ৪৬-৮৭ সংখ্যক শ্লোক মুদ্রিত হয়েছে। বাকী ১৩টি শ্লোক সম্ভবতঃ 'প্রকারান্তবিত' হওয়ায় মুদ্রিত হয় নি।

২। সোমপ্রকাশ, ২৮এ শ্রাবণ ১২৭৪, পৃঃ ৬২১, কবিতাটির ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্টে সমগ্র কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

করছি। 'দুর্গাবতী'[১] নাম্নী কবিতায় বীরপত্নী দুর্গাবতীর যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। এখানেও জাতিচিত্তকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। 'উত্তেজনা'[২] নামক কবিতাটি একই ভাবের বাহক। মধুসূদনের পত্রকাব্যের অনুকরণে দ্রৌপদী নিষ্ক্রিয় যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়ে বস্ত্রহরণের অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

'নির্বাসিতের বিলাপে' স্বদেশের প্রতি মমতা এবং ঈশ্বরের প্রতি আকূতি —উভয় ভাবই সুপ্তভাবে রয়েছে লক্ষ্য করি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে অধ্যাত্ম-চেতনা ও স্বদেশ-চেতনায় শিবনাথ উত্তরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত, এই প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিতে তার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছে। কিন্তু এ-ও সত্য যে, কবিতাগুলি এখনও একান্ত ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে ওঠে নি।

১। প্রথম প্রকাশ, বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৭৩। পরে 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।

২। প্রথম প্রকাশ, বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৩। পরে 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের মাত্র প্রথম সংস্করণে সংকলিত (দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পরিত্যক্ত)।



শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৯৮ সালে)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম কাব্যগ্রন্থ : নির্বাসিতের বিলাপ

॥ ১ ॥

শিবনাথ ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ'[১] ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এটি প্রথমে অংশত: 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকাশ-কালে পাঠকগণ ও সম্পাদকের অনুরোধক্রমে খণ্ডকাব্যটি শিবনাথ ক্রমাগত লিখতে আরম্ভ করেন এবং পরিশেষে গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন। 'সোম-প্রকাশে' তিনি 'শ্রী শিঃ' ছদ্মনামে লিখতেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয়' দিয়েছেন।[২]

'নির্বাসিতের বিলাপ' একখানি 'উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য'।[৩] এর সমগ্র আখ্যানটি নায়ক কর্তৃক স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে নিবেদিত। আখ্যানের পশ্চাদ্‌পটটি এইরূপ ; 'প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্র-সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চির-জীবনের মত নির্বাসিত হন। তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল।' ভবানীপুরের এই নির্বাসিত যুবকটির চিন্তা সতেরো বছরের কবির মনে আলোড়ন তোলে এবং তা থেকেই 'নির্বাসিতের বিলাপ'-এর জন্ম।[৪]

॥ ২ ॥

কাব্যটি চারটি কাণ্ডে বিভক্ত। সেগুলি যথাক্রমে :

প্রথম কাণ্ড—আন্দামানের সমুদ্রতট ; কাল—গোধূলি।

দ্বিতীয় কাণ্ড—আন্দামানস্থ এক কুটীর ; সময়—সন্ধ্যা।

১। আখ্যাপত্রটি এইরূপ : নির্বাসিতের বিলাপ। শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রণীত। Calcutta : Das and Sons, No. 45, Muden Bural's Lane, Wellington Street, 1868.

২। দ্রঃ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

৩। 'খণ্ডকাব্য', এই শব্দটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমলতা দেবী উভয়েই ব্যবহার করেছেন।

৪। দ্রঃ, ভূমিকা, নির্বাসিতের বিলাপ।

তৃতীয় কাণ্ড—কুটীর ; স্বপ্নদর্শন ; তৃতীয় প্রহর রজনী।

চতুর্থ কাণ্ড—কুটীর ; স্বপ্নদর্শন ; সময়—উষা।

শিবনাথ যে যুগে এই কাব্যটি রচনা করেছেন, সে সময়ে আখ্যানকাব্য রচনার চর্চা অব্যাহত ছিল এবং আখ্যানকাব্যের একটা আদর্শ-ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিগণের কাব্য চর্চার ফলে। 'নির্বাসিতের বিলাপে' আখ্যান থাকলেও পূর্ববর্তী আখ্যান রচয়িতা-গণের আখ্যান-কাব্যগুলি থেকে এটি স্বতন্ত্র ছিল। কারণ এর মধ্যে কোন জটিল বা বাস্তবাহুগ কাহিনীর সন্ধান আমরা পাই না। আকৃতিতে আখ্যানকাব্য হলেও প্রকৃতিতে এটি খণ্ডকাব্য ; কারণ এতে বাস্তব ঘটনার সামান্য ভূমির উপর আগাগোড়া কল্পনার একটি প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। বাস্তব ঘটনাটুকু খুবই সামান্য। তা হল, নির্বাসনের দণ্ডাদেশ, আর বাকি অংশটুকু কল্পনা মাত্র। প্রথম কাণ্ডে সমুদ্রতীরে উপনীত নায়ক সমুদ্র, সূর্য ও সমীরণকে আহ্বান করে তার মনের দুঃখ নিবেদন করেছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার কেউ নেই, কেউ নেই—

'এক বিন্দু নেত্রজল আমার রোদনে,
মিশাতে হৃদয়-ব্যথা হৃদয় বেদনে।'

—নির্জন নির্বাসনে তার মনে দুঃখিনী মাতা, 'রূপে নিরুপমা' পত্নী এবং পুত্রের কথা মনে হওয়ায় চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। দ্বিতীয় কাণ্ডে মোহিনী নিদ্রার মায়ায় আচ্ছন্ন নায়ক স্বপ্নে অনিন্দ্য-সজ্জায় সজ্জিত এক নারীমূর্তিকে দেখেছে। শুচিস্মিতা বলেছেন যে, তিনি তাকে 'বিপদ জলধি' থেকে উদ্ধার করবেন। দ্বিধাগ্রস্ত নায়কের মনে প্রশ্ন 'এ কে বামা বিনোদিনী সুধাংশু বদনা?' কবি তার উত্তর দিয়ে বলেছেন,

'চিনেছি তোমারে মোরা চিনেছি কামিনী
ভুবন মোহিনী তুমি আশা মায়াবিনী'।

—যাই হোক আশার সঙ্গে নায়ক বহির্গত হল। তৃতীয় কাণ্ডে আশার সনে কম্পিত হৃদয়ে' নায়ক এগিয়ে চলল 'মোহন তরীতে'। পথে এল নানা বিপর্যয়। সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে নায়কের·········'নয়নের জল
দুই গণ্ডে মুক্তা-সম বহে অবিরল।'

—সেই সংকটের মধ্যে বন্দীকে ফেলে আশা অন্তর্হিত হয়েছেন। কবি বলেছেন, 'কোথা আশা লুকাইল আজি এ দুস্তারে?' চতুর্থ কাণ্ডে রজনী

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। যুবক তখনও স্বপ্ন দেখে চলেছে—তরী বেয়ে সে তার 'হৃদি রাজেশ্বরী' ও পুত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছে আশার কৃপায়। এমন সময়ে তার স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছে। জেগে উঠে দেখেছে সে তার আন্দামানের কুটীরেই শয়ান। দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'দুরাশা'কে বিদায় দিয়ে বন্দী আবার চরণে শৃঙ্খল পড়েছে। এই নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কবি 'বিভু-পদাশ্রয়' করার উপদেশ দিয়েছেন,—

'তাই বলি মন-প্রাণ করি সমর্পণ।
অদ্যাবধি পদে তাঁর লওরে শরণ।'

ভগবদ্‌ভক্তিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

॥ ৩ ॥

'নির্বাসিতের বিলাপ' যখন প্রকাশিত হয়, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের চর্চা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। তবুও আখ্যানমূলক রচনাতে সে সময়ের কবিগণের প্রতিভা সমধিক স্ফূর্তি পেয়েছিল। আসলে আধুনিক কাব্যের প্রথম যুগে এই কাহিনীমূলক কবিতা রচনার রীতিই ছিল সুলভ। মধুসূদনের কাব্যে পাশ্চাত্য আখ্যান, রঙ্গলালের কাব্যে দেশীয় আখ্যান, ইংরেজি ন্যারেটিভ ও ঐতিহাসিক রোমান্স এবং হেমচন্দ্রের কাব্যে আখ্যায়িকার চর্চা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। বলা বাহুল্য, এঁদের হাতে এবং নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতিদের সাধনায় গীতি-কাব্যেরও একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত আখ্যায়িকা-মূলক রচনাধারার বাহক ছিলেন না। সুতরাং আখ্যানচর্চার ব্যাপারে শিবনাথের উপর ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে মধুসূদন-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের প্রভাবই বেশি বলা যায়। উক্ত কবিগণের লিরিক-চর্চার সূচনাপর্বেই 'নির্বাসিতের বিলাপে'র প্রকাশ। অবশ্য এই কাব্যটি যে তাঁদের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র চরিত্রসম্পন্ন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাব্যখানি কাঁচা হাতের লেখা হলেও এর মধ্যে 'তখনকার কবিদের নকলনবীশী ছিল না।'[১] কাব্যটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর কল্পনাসর্বস্বতা ও এর রূপক-ধর্মিতা। শিবনাথ বলেছেন যে, কাব্যটির অন্তর্গত 'স্বপ্নাংশটি একটি ধারাবাহিক রূপক।

১। জীবনময় রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪।

আশার সাহায্যে বিষাদ সাগর ও বিপদের ঝটিকা উত্তীর্ণ হইয়া মনুষ্য কিরূপে মনে মনে কল্পিত সুখভোগ করে এবং পরে যুক্তির বলে সে সুখের স্বপ্নভঙ্গ হইতে কিরূপে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।' (ভূমিকা)। যত্নশীল পাঠকের কাছে কবির এই ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু 'কাব্যের সঙ্গে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের আভাস' দেবার জন্যই কবির পক্ষে এমন ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন ছিল—অন্তত: সেই যুগে, যে যুগ উদ্দেশ্যহীন রোমান্স সৃষ্টির যুগ ছিল না।

আসলে এই রোমান্টিক স্বপ্নই 'নির্বাসিতের বিলাপ' কাব্যগ্রন্থের কাব্য-রসের উৎসভূমি। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুতীরে' কবিতার অবগুণ্ঠিতা নারীর রহস্যময়তার গভীরত্ব এই কাব্যে না থাকলেও সে সময়ে প্রকাশিত রোমান্টিক রূপক কাব্যগুলির মধ্যে[১] এমন স্বাতন্ত্র্য অন্যত্র কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। সে দিক থেকে কাব্যটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এ কথা ঠিক যে, এই রূপক ব্যবহার নিছক কাব্যরসসৃষ্টির জন্য নয়, নীতিপ্রচারের জন্য। কারণ কাব্যের প্রারম্ভে কবি বলেছেন, 'সে শিক্ষা কুশিক্ষা—মাগো! যাতে ধর্মভয়, না শিখায়', আবার কাব্যের পরিশেষে ভগবদ্‌প্রীতির ও ঈশ্বর নির্ভরতার বিশ্বাসটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তখনও পর্যন্ত শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন নি। সুতরাং অধ্যাত্ম-চেতনা এখনও কাব্যগুণকে গ্রাস করতে পারে নি। সে কারণেই আবার রচনাটি কাব্যগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। রমেশচন্দ্র দত্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'Nirbasiter Bilap is a work of great merit, feeling and pathos.'[২]

বিপিনচন্দ্র পাল শিবনাথের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'ফলতঃ তাঁহার আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, ভগবদ্‌ভক্ত নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিক নহেন, মুমুক্ষু সাধক নহেন কিন্তু অসাধারণ সম্পদশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি।'[৩] প্রথম কাব্যটি সম্পর্কে এই মন্তব্য অন্তত:

১। উদাহরণ স্বরূপ: বলদেব পালিত, কাব্যমঞ্জরী (১৮৬৮); এই কাব্যটির মধ্যে রূপক কবিতাও ছিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যৌবনোদ্যান (১৮৬৮)।

২। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩।

৩। বিপিনচন্দ্র পাল, চরিতকথা, পৃঃ ১৬৪।

কিছু পরিমাণে উদ্ধৃতিযোগ্য। ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা তখনও শিবনাথকে আকর্ষণ করে নি বলে কবির মনে ছিল 'তরুণ কল্পনার নিশ্চিন্ত বিলাস'। কবি তাই এই কাব্যে ভাষা, ছন্দ ও শব্দব্যবহারের প্রতি কথঞ্চিৎ মনোযোগসম্পন্ন।

'নির্বাসিতের বিলাপ' সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। এতে প্রতি দুই চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাস আছে এবং সেদিক থেকে মিলের পদ্ধতি মিত্রাক্ষর পয়ারের অনুরূপ। তবে, কবি ভাব-যতি ব্যবহারে কতকটা স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন। ফলে চরণগুলির মধ্যে ভাবের প্রবহমানতা আছে। তবে, লক্ষণীয় এই যে, তিনি চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও ও চতুর্দশ মাত্রার পর ছেদ বা ভাব-যতি ব্যবহার করেছেন, মধুসূদনের মত দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ, দ্বাদশ মাত্রার পর ভাব-যতি প্রয়োগ করেন নি। আরও লক্ষণীয় যে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অষ্টম ও চতুর্দশ মাত্রার পর পূর্ণ ভাব-যতি ব্যবহার করেছেন, চার বা ছয় মাত্রার পর ভাব-যতির ব্যবহার খুবই কম। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবের প্রবহমানতা দ্বিতীয় বা তৃতীয় চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, বিরল ক্ষেত্রে চতুর্থ বা ততোধিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ফলে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে বিচিত্র যতি-পাত-জনিত যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে এবং যে পরিমাণ প্রবহমানতা দেখা দিয়েছে, তা শিবনাথের অমিত্রাক্ষরে অনুপস্থিত। পূর্ণ বা অর্ধ ভাব-যতি প্রয়োগ প্রায়শঃই অষ্টম ও চতুর্দশ মাত্রার পর পড়ায় (শ্বাস-যতিও বিশেষভাবে এই দুই স্থানে পড়ে) পয়ারের ধ্বনি-প্রকৃতির সঙ্গে শিবনাথের অমিত্রাক্ষরের ধ্বনি-প্রকৃতির গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয় নি (মনে রাখতে হবে, পয়ারেও ভাব-যতি ও শ্বাস-যতি অষ্টম ও চতুর্দশ মাত্রার পর পড়ে)। অন্যদিকে শিবনাথের ভাষাভঙ্গিও ঠিক অমিত্রাক্ষরের ধ্বনি-প্রকৃতির পক্ষে সর্বত্র অনুকূল হয় নি। তিনি অনেক ক্ষেত্রেই গদ্যাত্মক বা কথ্য ভাষা-ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন, যা অমিত্রাক্ষর-সুলভ ধ্বনিস্রোত সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে নি।[১] তাহলেও এই কাব্যে শব্দ ব্যবহার ও ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে শিবনাথ অধিক পরিমাণে মধুসূদনের অনুগামী। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবকে তিনি আশ্চর্যভাবে এখানে অস্বীকার করেছেন। সেদিক থেকে শিবনাথের

১। অবশ্য মধুসূদনের রচনাতে এই প্রকারের গদ্যাত্মকভঙ্গি একেবারে দুর্লভ নয়।

কৃতিত্ব অনেকখানি। মধুসূদনের ধ্বনিপ্রাচুর্য এবং ছন্দোপ্রতিভা শিবনাথের ছিল না; কিন্তু স্বকীয়তাও কম ছিল না। কাব্যটির ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবির ধারণাও কিরূপ ছিল তা উল্লেখ করি, 'বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই জন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।'

বিশ বছরের যুবক কবির পক্ষে মধুসূদনের প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়া যেমন সহজ ছিল না, তেমনি সহজ ছিল না আজন্মলালিত পয়ার ছন্দের সংস্কারকে অস্বীকার করার। প্রধানতঃ এই কারণেই অমিত্রাক্ষর কবিতায় শিবনাথ অন্ত্যমিল রক্ষা করেছেন। শুদ্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত শিবনাথের একটি কবিতা এখানে উল্লেখযোগ্য। 'চুয়াত্তরের ঝড়'[১] নামক কবিতাটিতেও আমরা মধুসূদনের সাক্ষাৎ প্রভাব লক্ষ্য করি। যথা,

'............বর্ণিতে সে ঝড়
হে মাতঃ কবিতা দেবি! করেছে মানস
তব দাস, এ অধীন, মূঢ়মতি অতি;
করি কৃপা বিতরণ, উরিয়া মানস
সরস সরসীরুহে, পুরাও কামনা।'

ভাবের প্রবহমানতা ও অন্ত্যমিলের মধ্যে সর্বত্র যে অন্ত্যমিলের শুদ্ধিতা রক্ষিত হয়েছে, তা নয়। মাঝে মাঝে পঙ্‌ক্তি যোজনার ত্রুটি লক্ষ্য করি। যেমন,

প্রথম কাণ্ডে:

(১) <u>কিরূপে এ হেন রূপ? যতেক বচন</u>
শুনেছি শিখেছি আমি সমস্ত জীবনে,
(২) <u>অনিবার বারি-ধারা করি বরিষণ।</u>
জেন হে মারুত তাঁকে দুঃখিনী জননী

১। সোমপ্রকাশ, ১-ই অগ্রহায়ণ ১২৭৪।

দ্বিতীয় কাণ্ডে :

তথাপি আমার কথা থাকিবে সমান।

গ্রহতারা, রবি, শশী, জঙ্গম, স্থাবর,

তৃতীয় কাণ্ডে :

শক্তি-হীন হয়ে আমি পড়িত যখন,

তখন তোমাকে আমি ডাকি বার বার

চতুর্থ কাণ্ডে :

বলিছে পতত্রিগণে ডাকি উচ্চস্বরে ;—

'উঠরে উঠরে ভাই! নিশি অবসান ইত্যাদি।

অর্থাৎ নিম্নরেখ পঙ্‌ক্তিগুলির হয় পূর্বে না হয় পরে কোন একটি সমমিলযুক্ত পঙ্‌ক্তি-যোজনার প্রয়োজন ছিল।

শুধুমাত্র ছন্দের ক্ষেত্রে নয়, শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রেও মধুসূদনের প্রভাব কাব্যটিতে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। পূর্বেই বলেছি, শিবনাথ মধুসূদনের মত স্বকীয় শব্দসম্পদের অধিকারী ছিলেন না। তাই স্পষ্টতঃই মধুকবির কাছে ঋণী হয়েছেন। আমরা এই প্রকারের কয়েকটি শব্দ ও বাক্যাংশ চয়ন করছি।

প্রথম কাণ্ড : শাখী, অভ্রভেদী চূড়া, নভঃস্বন, সম্বর, ইন্দীবর, বৈদেহী-নাথ, সদাগতি (পবন), নক্র, গন্ধবহ ;

দ্বিতীয় কাণ্ড : 'অম্বরে অম্বরমণি', নাহক, সুমুখি, কল্লনে, বাখানি, সৌদামিনী, উরঃস্থল ;

তৃতীয় কাণ্ড : 'উগারিছে তেজোরাশি', সাবাসি, সুধাংশুমুখী, 'চুম্বিছে কুন্তল আসি সুচারু নয়ন', 'সপ্তস্বরা বীণা যেন বাজিয়া উঠিল', সদাগতি, পোড়াবিধি ;

চতুর্থ কাণ্ড : তাম্রচূড় (মোরগ), 'দাঁড়াইলা স্থিরভাবে', উঠিলা, চলিলা প্রভৃতি নামধাতু, সুশাণিত, সুস্বর, কতক্ষণে ইত্যাদি।

এছাড়া 'সপ্তস্বরা বীণা যেন বাজিয়া উঠিল' শীর্ষক ব্যবহার মধুসূদনের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ আলোচনার সময় আমরা মধুসূদনের নানা প্রভাব লক্ষ্য করব। হেমচন্দ্রের প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

কাব্যটিতে যেমন কয়েকটি সুসংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি তাদের

পাশাপাশি বেশ কিছু সংখ্যক লৌকিক শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। মধুসূদন ব্যবহৃত তৎসম শব্দগুলি যে গাম্ভীর্য ও শব্দার্থের সম্পৃক্তি ঘটিয়েছে, শিবনাথের কাব্যে যে সর্বত্র তা হয়েছে, তা নয়। আবার 'জাঙাল' ইত্যাদি লৌকিক শব্দে যে আলঙ্কারিক ভাব প্রকাশিত হয়েছে, শিবনাথ-ব্যবহৃত লৌকিক শব্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পরিবর্তে কাব্যদুষ্টি ঘটেছে। তৎসম ও লৌকিক শব্দকে তুল্য মর্যাদায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি বহুলাংশে বিহারীলালের (১৮৩৫-৯৪) সমগোত্রীয়।

॥ কয়েকটি তৎসম শব্দ ॥

উদ্যাপন (উদ্‌যাপন), তারাম্ময়ী নিশি,[১] প্রেমাভাসে রসোল্লাস, হুঙ্কার, পতত্রি (জয়দেব), পালী-গৃহ (পারাবত), 'বিকচ-চকল-কান্তি'।

॥ লৌকিক শব্দ ॥

আধু আধু স্বর, ঝিঁ ঝিঁ, জুজুর ভয়, ছি ছি, খাবি, পিঁক পিঁক, উহু উহু, মরি মরি, 'এস এস একবার করসে রোদন', হোঁক হোঁক ইত্যাদি।

ছন্দের ত্রুটি এবং শব্দ-ব্যবহারের অপটুত্ব থাকলেও কাব্যটিতে মাঝে মাঝে যে কবিত্বের ছোঁয়া লাগেনি, এমন নয়। কবিত্বময় কয়েকটি স্তবক আমরা উদ্ধার করছি।

(১) নীলজলে পড়ি আভা ইন্দ্রধনু-প্রায় ;
বিচিত্র বাখানে কেবা ! শাখীর শাখায়
মৃদু মৃদু কাঁপাইয়া বহে সমীরণ ;
প্রণমিছে রবিপদে যেন তরুগণ। —প্রথম কাণ্ড।

(২) রজনীর সখী ! দেবী ! বিশ্রাম-দায়িনি
অয়ি সুখময়ি নিদ্রে ! —দ্বিতীয় কাণ্ড।

(৩) খেলিছে মোহন বাপী, বহিছে লহরী
চরিছে সারস হংস লয়ে সহচরী

দুলিছে পবন-ভরে, শত শতদল,
ভ্রমিছে নিয়ত তথা মধুপ চপল, —ঐ।

১। শব্দটির গঠনে ব্যাকরণগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

(৪) গভীর রাত্রির রূপ বর্ণনা—

এ ঘোর তামসী, দেখ সুষুপ্ত ধরণী ;
স্পন্দহীন চরাচর ; মারুত আপনি,
ছাড়িয়া চপলভাব বসেছেন ধ্যানে ;
নড়ে না শাখীর শাখা ; কাঁপে না এখানে
দেখ না দীপের শিখা ; —ঐ।

(৫) 'তারাময়ী নিশি' বর্ণনা—

ভাসিছে সুস্নিগ্ধ তারা নয়ন-গগনে
ঝরিছে শিশির বৃষ্টি—অমৃত কিরণে।

(৬) উষা বর্ণনা—

বুঝিবা ধরণী খুলি তমোবগুণ্ঠন,
লইছে দিবস নাথে আদরে ভরিয়া

এছাড়া চতুর্থ কাণ্ডের শুরুতেই যে দীর্ঘ উষাবন্দনা আছে, তার সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সপ্তম সর্গের উষাবন্দনাটি তুলনীয়। মধুসূদনের 'চিত্রগুণ-সম্পন্ন' বর্ণনার অনুকরণ শিবনাথ করেছেন। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-জগতে যে সাড়া ও চেতনা জাগে তার আলঙ্কারিক বর্ণনামাত্র শিবনাথ দিয়েছেন, মধুসূদনের মত তা ক্লাসিক হয়ে ওঠে নি। তবুও এর অকৃত্রিমতা লক্ষ্য করার মত।

এর পরে শিবনাথ যে কাব্য-গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন, তাদের সঙ্গে তুলনায় 'নির্বাসিতের বিলাপ' শ্রেষ্ঠতম। কাব্যটিতে অনেক ত্রুটি আছে ; কারণ এটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু "'নির্বাসিতের বিলাপ' তাঁহার প্রথম কাব্য হইলেও অকৃত্রিম আন্তরিকতাগুণে উহা প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছে।"[১]

॥ ৪ ॥

শিবনাথের জীবৎকালে কাব্যটির যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ কালে পাঠকগণ কর্তৃক কাব্যটি যে প্রশংশিত হয়েছিল, শিবনাথ তার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর জীবৎকালের মধ্যে কাব্যটির অন্তত: তিনটি সংস্করণ হয়েছিল।

১। মনোমোহন ঘোষ, বাংলা সাহিত্য (১৩৬১), পৃ: ৫১৪

প্রথম সংস্করণ ১৮৬৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮১ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে আর একটি কারণ হল এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষার পাঠ্য[১] হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল।

১। হেমলতা দেবী, আমার পিতৃদেব, তত্ত্বকৌমুদী, ১লা কার্তিক ১৮৫১ শক।

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ভূমিকা

শিবনাথ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট তারিখে (৭ই ভাদ্র) কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই তারিখের অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি কবিতার নাম 'পরিত্যক্তা রমণী'।[১] পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত এক রমণীর শিশু সন্তানের প্রতি গভীর মমতার কথাই কবিতাটিতে বিবৃত। ঈশ্বর প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। পূর্বের কবিতাগুলিও যে ঈশ্বরসর্বস্ব হয় নি, সেকথা বলেছি। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই শিবনাথের অন্তর কিভাবে ব্যক্তিক চিন্তায় জর্জরিত ও ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে উঠেছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত কয়েকটি কবিপরিচয়হীন কবিতায়। কবিতাগুলিতে রচয়িতার নাম না থাকলেও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সহযোগে সেগুলি যে শিবনাথেরই রচনা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। 'প্রেরিত' এই স্তম্ভে 'বিপন্নের প্রার্থনা'[২] নামক অষ্টাদশ স্তবকসম্বলিত কবিতাটিতে কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রার্থনা যুগপৎ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে লেখা হয়েছে,

> সংসারের গুরুভার
> সহিতে না পারি আর
> দুদিক রাখিতে ধর্ম না থাকে বজায়।
> জগদীশ কি হবে উপায়?
> বুঝি নাথ! হারাই তোমায়!

কবি এরপরে লিখেছেন,

> হে নাথ তোমার তরে
> পিতামাতা পরিহরে,
> দুর্বল বালক আমি একা ভেসে যাই হে!
> শেষে যদি তোমারে না পাই হে
> কি হইবে বলদে দেব তাই হে!

কবি 'একে ত নিজের ভার' তার উপর 'সংসারের ভার পুন' গলায়

১। সোমপ্রকাশ, শ্রাবণ ১২৭৬ সংখ্যা। পরে 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত।
২। ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই শ্রাবণ ১৭৯২ শক, পৃ. ১৫৮-৫৯।

নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এমতাবস্থায় ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করে কবি লিখেছেন, 'এস মোর সামান্য কুটিরে দেখা দিবে অভাগা দুখীরে'। 'দুর্বল বালক' শিবনাথের জীবনে এই প্রকার দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। পিতা-পরিত্যক্ত শিবনাথকে পাঠ্যজীবনে মাত্র স্কলারশিপের টাকার উপর ভরসা করে সংসারের ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কবিতাটি পরে পরিবর্তিত আকারে 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পরবর্তী কবিতাটিতে এই একই ভাব প্রস্ফুট। এই কবিতাটি[১] হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবে (৭ই ফাল্গুন ১৭৯২ শক) পঠিত হয়। প্রথম কবিতাটিতে যে আধ্যাত্মিক সংশয় প্রকাশিত হয়েছে, এটিতে সেই সংশয় দূরীভূত হওয়ায় নির্ভর অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে দেখি; কারণ ইতিমধ্যে শিবনাথ দীক্ষাগ্রহণ করেছেন।

'ভেব না ভেব না আর
ঘুচাও হৃদয় ভার;
দুঃখের রজনী বুঝি পোহাইল ভাই রে,
চারি দিক পরিষ্কার দেখিবারে পাই রে।'

ঈশ্বর কবিকে দয়া করেছেন, 'শিশু বলে মুখ তুলে বুঝি ভাই চান্‌রে'। এই ঈশ্বরকে একবার ভজনা করলে তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যায় না;—

আমরা বালক কালে
পড়েছি তাঁহার জালে
ছাড়িব কি ছাড়িবার শক্তি আর নাইরে।'

এতে আত্মীয়-স্বজন মিছিমিছিই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। 'জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায়', 'পিতার গর্বিত শির ভূমিতে লোটায়', কিন্তু কবির জীবনের সেই ধ্রুবপদ,

'কর্তব্য বুঝিব যাহা
নির্ভয়ে করিব তাহা
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন মান প্রাণ রে
পিতাকে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।'

এই পঙ্‌ক্তিটি শিবনাথ জীবনে বহুবার উদ্ধৃত করেছেন।[২]

১। ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই ফাল্গুন ১৭৯২ শক, পৃ. ৩২৪-২৫।
২। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ. ৩৩৫।

এই একই প্রকার দৃঢ়তা 'নিশাবসানে ব্রাহ্মের মনের ভাব'[১] নামক কবিতাটিতেও প্রকাশিত। 'বাহিরের ধর্ম লয়ে' 'কবির 'প্রাণ ভোলে না তাহায়।'

এই তিনটি কবিতায় কবির যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ঠিক পূর্বে ও পরে শিবনাথের ঈশ্বর-চিন্তা ও মানসিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে রেখায় রেখায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'আত্মচরিতের' পাঠকের তা অজানা নয়। তাই কবিতাগুলিকে শিবনাথের রচনা ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় ও কাব্যপ্রকৃতিতে যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কর্তৃক ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনায় শিবনাথ 'ভারতাশ্রমবাসিদিগের প্রতি'[২] নামে একটি কবিতা-সম্ভাষণ রচনা করেন। ধর্মভাবের 'প্রেম সাগরে' যে 'তুফান' লেগেছে, সেই স্রোতের স্পর্শে 'মহাপাপী স্বর্গে যায়'। সুতরাং 'ব্রহ্মনাম হৃদে ধরে, ব্রহ্মতে নির্ভর করে' সাধন-তরীতে নিষ্ঠাভরে এগিয়ে গেলেই ঈশ্বর-সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রহ্মনামের স্বর্গ 'ধরায়' এসেছে ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবে। কবি তাই অন্তরে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ভারতবাসীকে 'পিতার প্রেমের জয়' প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রায় আড়াই বৎসর বিগত হয়েছে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের কিছুকাল পূর্বের কবিতাগুলিতে শুধুমাত্র ঈশ্বরপ্রসঙ্গের উল্লেখ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ঠিক পরের কবিতাগুলিতে যে সংশয়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল, এর মধ্যে সেই সংশয় বিদূরিত হওয়ায় অধ্যাত্ম-চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে বলা যায়। পরবর্তী কাব্যগুলিতে এর স্ফটিকীকৃত রূপ লক্ষ্য করি।

১। ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক, পৃঃ ৫৯৮।

২। ধর্মতত্ত্ব, ১লা ফাল্গুন ১৭৯৫ শক, পৃঃ ৫৯৫-৯৬। '...আশ্রমের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখি, তাহা বোধ হয় ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।' —শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১০৯।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ : পুষ্পমালা

॥ ১ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে (হরিনাভি, ১২৮২ সাল)। এর প্রথম সংস্করণ মোট সতেরোটি কবিতার সংকলন। দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৭ সাল) 'প্রথম বারের অনেক কবিতা······পরিত্যক্ত হইল এবং তৎস্থানে অনেক নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইল।' পরিত্যক্ত হয়েছে তিনটি কবিতা[১] এবং আরও আটটি[২] নূতন কবিতা সংযোজিত হয়েছে। পঞ্চম সংস্করণে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) লক্ষ্য করি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের 'দ্বীপান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত মাতাল' নামক কবিতাটির নাম 'হরিষে বিষাদ' দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রথম থেকে পঞ্চম—এই পাঁচটি সংস্করণের সমগ্র কবিতাগুলি এখানে আলোচনা করছি।

॥ ২ ॥

'পুষ্পমালা'র কতকগুলি কবিতা (মোট পঁচিশটির মধ্যে দশটি) 'সমদর্শী' নামক শিবনাথের স্ব-সম্পাদিত মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পুষ্পমালা'র কবিতাগুলির রচনার ইতিহাস সম্পর্কে হেমলতা দেবী লিখেছেন, 'শিবনাথ প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক নির্জন উদ্যানে গিয়া বসিতেন এবং এই সকল কবিতা লিখিতেন। অনেকদিন প্রাতে হেমলতাকে সঙ্গে করিয়া বাগানে যাইতেন, তাকে বাগানে বেড়াইতে বলিয়া নিজে একান্তে বসিয়া কবিতা লিখিতেন।'[৩] 'পাখী', 'ফুল' ইত্যাদি কবিতাগুলির নীচে বন্ধনী মধ্যে 'নির্জন উদ্যানে লিখিত' কথাটিও এ প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে কালপার্থক্য সবিশেষ লক্ষণীয় (১৮৬৮-১৮৭৫)। যদিও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা

১। দুঃখিনী, উত্তেজনা এবং ভাবনা।

২। মোহিনী, ভীরু, বিদায়, 'আসক্তি. বিরক্তি ও ভক্তি', ব্রহ্মবিদ্যা, চাতক বিদায়, বিধবার হরিণ এবং উন্মাদিনী।

৩। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ, ১০০।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত, তবুও কাব্য রচনার এই কালগত ব্যবধানের একটা কারণ আছে। প্রথম কাব্য প্রকাশের পর শিবনাথের ধর্মজীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং আত্মনিগ্রহ দ্বারা তিনি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। যা কিছুতে তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক, তার নিগ্রহে শিবনাথ হলেন দৃঢ়সংকল্প। সেজন্য কাব্যচর্চাও সাময়িকভাবে শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রচনাশক্তিকে তিনি 'কানমলা' দিয়ে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি 'আত্মচরিতের' ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবি-জীবনের মধ্যে এই ছেদের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। কারণ এর পর থেকেই তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিকতা। 'আমার রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমালা একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।'[১] কবিকথিত 'পুষ্পগুলির বাস্তব সৌরভ'[২] আসলে আধ্যাত্মিকতারই সৌরভ। 'প্রাণের কথাগুলির মধ্যে অনেক সামাজিক প্রশ্ন আছে—বিশেষ করে স্ত্রী-জাতির অবস্থা সম্পর্কিত। ভদ্রাঙ্গনাগণের পাঠোপযোগী একখানি বিশুদ্ধ কাব্যগ্রন্থের যে অভাব তৎকালে অনুভূত হত 'শিবনাথবাবুর এই পুস্তক দ্বারা তাঁহারদিগের ক্ষোভের কারণ নিরাকৃত'[৩] হয়েছে। 'ইহাতে স্ত্রী চরিত্র ও ধর্মজীবনের ছবি যেরূপ অধিক পরিমাণে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা স্ত্রীলোকদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী।...ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ...উচ্চ অঙ্গের এরূপ পদ্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।'[৪]

॥ ৩ ॥

'পুষ্পমালা'র প্রধান 'সৌরভ' আধ্যাত্মিকতা হলেও বিষয়ানুযায়ী 'মালা'টিকে পাঁচটি 'পুষ্পে' ভাগ করা যেতে পারে—দেশপ্রেমমূলক, পৌরাণিক, সামাজিক, প্রকৃতি ও সংগীতবিষয়ক এবং আধ্যাত্মিক।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪১।
২। ভূমিকা, পুষ্পমালা (২য় সংস্করণ, ১২৮৭ সাল)।
৩। উমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত 'পুষ্পমালা'র প্রথম সংস্করণের (১২৮২ সাল) ভূমিকা।
৪। 'পুস্তকাদি সমালোচনা বিভাগ', ভারত সংস্কারক, ৩য় বর্ষ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃঃ ২৪২-৫০।

॥ প্রথম পুষ্প : দেশপ্রেম ॥

উৎসর্গ,[১] বহুদূর নয়,[২] দুর্গাবতী,[৩] এবং প্রকৃত সাহস[৪] —'পুষ্পমালা'র এই কবিতা চতুষ্টয়ের মধ্যে শিবনাথের স্বদেশচিন্তার বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে।

'উৎসর্গ' নামক কবিতাটিতে 'পর পদতলে' লাঞ্ছিত ভারতমাতার স্বাধীনতা যে আশু ফলবতী হবে, কবি এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন। কবির ধমনীতে 'ভারত-রুধির' প্রবহমান। তাঁর মত ভারতের 'ত্রিশ কোটি সুতের' প্রচেষ্টায় ভারতগগনে 'নব সূর্যোদয়' হবে। এর জন্য তথাকথিত সভ্যতার প্রয়োজন নেই। কারণ যে সভ্যতা মনে ধর্মভাব ও নীতিভাব জাগিয়ে তোলে না, সে সভ্যতা কোন ফল বহন করে না।—'চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি! / দেও ধর্মধন প্রাণে পুরে রাখি।' বিদেশীর এই সভ্যতার প্রতি কবির বিষোদ্গারের কারণ, কবি দেখেছেন, 'সভ্যতার নামে আর্যধামে' ইংরেজরা এদেশে 'ডাকাতি'ই করেছে। তাই কবি তথাকথিত সভ্যতার পরিবর্তে 'বিশ্বাস', 'নির্মল হৃদয়-আকাশ' ও বৈরাগ্য প্রার্থনা করেছেন। চিত্ত পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হলেই তবে দেশোদ্ধার সম্ভব,—'ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস,/দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়।' আর চাই আত্মোৎসর্গের দৃঢ় সংকল্প।

শিবনাথের স্বদেশচেতনা এই কবিতায় বঙ্গদেশকে ছাড়িয়ে ভারত-চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবিতাটি সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, 'তাঁহার (শিবনাথের) পুষ্পমালায় বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, যে কবিতায় তিনি স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।'[৫] কবিতাটি পাঠে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির কথা আমাদের মনে পড়ে।[৬]

১। প্রথম প্রকাশ, সমদর্শী, চৈত্র ১২৮১ সাল।

২। নতুন রচিত, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। প্রথম প্রকাশ, বামাবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৭৩ সাল।

৪। ঐ, সমদর্শী, ফাল্গুন ১২৮১ সাল।

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাঙ্গালার সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৭ সাল।

৬। এই পর্যায়ের আর একটি বিখ্যাত কবিতা 'শ্রমজীবী' শিবনাথ কর্তৃক ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রমজীবীদের নিয়ে রচিত বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম কবিতা।

'বহুদূর নয়' কবিতাটিতেও এই একই ভাব প্রকাশিত। দেশের কথা কবির প্রাণে আগুন জ্বেলেছে। উনিশ শতকের শিক্ষাদীক্ষা দেশে যে নব-নাগরিক সভ্যতা এনেছে, এখানেও কবি সেই 'সভ্যতা' ও 'ইন্দ্রিয় সেবা'কে তীব্র তিরস্কার করেছেন। কবির মতে নারীর স্নেহ-প্রেমই দেশের উদ্ধারে সাহায্য করবে—'তোরা না উঠিলে দেশ যে জাগে না।' দেশোদ্ধারের জন্য, 'বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,/তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান।' গভীর স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা কবিকে জাতিভেদ প্রথার উর্দ্ধে নীত করেছে। ভারতের সব প্রদেশের 'প্রাণপ্রিয় ভাই ভারত সন্তানের' সঙ্গে মুসলমান ভাইদেরও উদাত্ত কণ্ঠে দেশোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়ে কবি বলেছেন, 'তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের।' এই ঐক্যবোধে জাগ্রত হলেই স্বাধীনতা অচিরে আসবে,

'সাহসে মাতিয়া, যাই উড়াইয়া
বিজয় নিশান। আর কারে ভয়?
মোদের সদ্গতি বহুদূর নয়'

গভীর নিশীথে লিখিত এই কবিতাটিতে কবি 'তাঁহার হৃদয়োদ্বেলিত ভাবরাশি···অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।'[১] কবিতাটি নিঃসন্দেহে হেমচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতাগুলির সমগোত্রীয়।

বীর্য ছিল শিবনাথের জীবনের অন্যতম সাধনা। এজন্য যেখানেই তিনি বীরত্বের সন্ধান পেয়েছেন, সেদিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। 'দুর্গাবতী' নাম্নী কবিতায় দুর্গাবতী পতির প্রতি যে সম্ভ্রম প্রদর্শন করেছেন, তা সর্বদা অনুকরণীয় হলেও দুর্গাবতীর বীরত্ব, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদা কবিকে সর্বাধিক পরিমাণে মুগ্ধ করেছে। এই বীরত্ব স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যই প্রদর্শিত হয়েছে। দুর্গাবতীর সৌন্দর্য ও বীরত্ব আমাদের মধুসূদনের 'প্রমীলা' ও রঙ্গলালের 'কর্মদেবী'র (১৮৬১) কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

বীরত্বকে অঙ্গভূষণ করার সাধনায় নানা বিপদ এসে বার বার ব্রতচ্যুতি ঘটায়। পৌরুষকে অর্জন করতে হলে এই উত্থান-পতনকে স্বীকার করতে হয়। বিদ্যুতেই 'নব জলধরের' রূপ প্রকাশ পায়। অন্তরের ঈশ্বর-বিশ্বাস সকল দুঃখকে সহ্য করার শক্তি দেয়। সচ্ছল জীবনে এই ব্রতসাধন বহুল

১। অমৃতলাল গুপ্ত, কাব্যে লোকশিক্ষা, ভারত মহিলা, ফাল্গুন ১৩১৪, পৃঃ ২৫৯-৬০

পরিমাণে দুঃসাধ্য। 'ঘোর দারিদ্রতা'র মধ্য থেকেই জন্ম হয় দেশপ্রেমিকের। 'রক্তবিন্দু হতে' রক্তবীজের মত ভারতে 'শতপুত্র বীর অবতার' জন্মগ্রহণ করে 'ভারত আঁধার ভারতের ভার ঘুচাইবে তারা।' 'প্রকৃত সাহস'[১] কবিতার বক্তব্য হল এই। জীবন সম্বন্ধে জাতীয় নৈরাশ্যকে দূর করার জন্য সেকালে এই জাতীয় বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল বলেই মনে করি।

॥ দ্বিতীয় পুষ্প : পৌরাণিক আখ্যান ॥

এ পর্যায়ের আটটি কবিতা—চৈতন্যের সন্ন্যাস, মাতৃদর্শন, ভর্ৎসনা, মার্জনা, বিদায়, সতার পরাক্রম, ব্রহ্মবিদ্যা এবং উত্তেজনা।[২]

'বীরত্বের ন্যায় পবিত্রতা ও ধর্মপ্রাণতা তাঁহার হৃদয়কে অতি সহজেই আকুল করিয়া তুলিত।'[৩] পৌরাণিক আখ্যানমূলক কবিতাগুলি এই ভাবত্রয়ের আশ্রয় হয়ে উঠেছে।

কবিতার বিষয়গুলি চৈতন্যজীবনী (চৈতন্যের সন্নাস, মাতৃদর্শন), রামায়ণ (ভর্ৎসনা, মার্জনা, বিদায়) এবং মহাভারতের (সতীর পরাক্রম, ব্রহ্মবিদ্যা, উত্তেজনা) বিভিন্ন আখ্যায়িকা থেকে আহৃত।

'চৈতন্যের সন্ন্যাস' একটি বহুল প্রচারিত কবিতা। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত এই কবিতাটি বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। কেশব ভারতীর কাছে গোপনে দীক্ষা নিয়ে নিমাই নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে 'হরিনাম প্রচারার্থ দেশভ্রমণে নির্গত হন।' নিমাই-এর গৃহত্যাগের প্রসঙ্গে কবির নিজের গৃহত্যাগের কথা মনে পড়েছে। 'লোকে ত বলিবে নিমাই নির্দয়' কিন্তু লেখনী 'কি জানিবে' সেই গোপন ব্যথা। পরিশেষে কবি ভারতচন্দ্রীয় ঢঙে

১। এই কবিতাটির পাণ্ডুলিপির একাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রদর্শনী গৃহের কাঁচাধারে রক্ষিত আছে।

২। কবিতাগুলি যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত পত্রিকাগুলিতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

(ক) সমদর্শী, অগ্রহায়ণ ১২৮১, (খ) সমদর্শী, মাঘ ১২৮১, (গ) নতুন রচিত, (ঘ) সুলভ সমাচার, ৮১ সংখ্যা, (ঙ) দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ও নতুন রচিত, (চ) বামাবোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১২৮১, (ছ) দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ও নতুন রচিত, (জ) বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭০।

৩। সরোজেন্দ্রনাথ রায়, কবি শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪।

মন্তব্য করেছেন, 'কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর ! / দেখে শুনে কবি হতবুদ্ধি প্রায় ।'

গৃহত্যাগ করে চৈতন্যের বৃন্দাবন যাত্রার পথে 'নিত্যানন্দ কৌশলক্রমে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের ভবনে' নিয়ে আসেন। সেখানে শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময়ে তাঁদের মনের ভাবের একটি সুস্পষ্ট চিত্র 'মাতৃদর্শন' কবিতায় অঙ্কিত আছে।

নারীর মনোভাবের অন্য দুটি ভিন্ন রূপ প্রতিফলিত হয়েছে 'ভৎ'সনা' কবিতায়। সীতা-ধর্ষণে উদ্যত রাবণকে প্রতিহত করার প্রসঙ্গে মন্দোদরীর সাধুতা এবং সীতার কোমল ও কঠোর রূপটি কবি সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

'মার্জনা' কবিতাটিতে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তাধীন রামের ছবিটিকে নূতন করে দেখেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত রাবণ এখানে সীতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং রাম সে প্রার্থনা পূরণ করেছেন। পরে রাবণের মৃত্যু হলে সকলের হাহাকারের সঙ্গে 'কাঁদিছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।' এ দৃশ্য আমাদের 'তরণী সেন বধ' পর্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। বক্তব্যের দিক থেকে এই কবিতাটি পূর্ববর্তী কবিতায় চিত্রিত রামের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র।

অশ্রুসজল আর একটি গভীর চিত্র 'বিদায়' কবিতা। বিষয়বস্তু প্রাচীন, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনগমন। তবুও কবিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে লক্ষ্মণ কর্তৃক উর্মিলার কাছে বিদায় গ্রহণের বর্ণনায়। 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র প্রতি কবি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

'সতীর পরাক্রম' কবিতায় কবি নল কর্তৃক বনমধ্যে পরিত্যক্ত ও দুষ্টজনের অশিষ্টতায় উত্যক্ত দময়ন্তীর মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যবোধ সঞ্চারিত করেছেন। এই স্বাতন্ত্র্যবোধে দ্রৌপদীকে উদ্দীপ্ত দেখি 'উত্তেজনা' শীর্ষক কবিতায়। মধুসূদনের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা'র ঢঙে এই কবিতাটি রচিত। দ্যূত-সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নিষ্ক্রিয় স্বামী যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে চেয়েছেন। অনুনয় ও তিরস্কার যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন নিজেই যুদ্ধে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ-যোগ্য। পরিশেষে দ্রৌপদীর 'স্বাধীনতা দেও যেই, এত বলিয়াছি তেঁই,/

নতুবা কে কহে এত হয়ে অনুগত ?' ইত্যাদি উক্তিতে যথেষ্ট নাটকীয়তা সঞ্চারিত হওয়ায় কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

'ব্রহ্মবিদ্যা' কবিতায় বৃত্রের মৃত্যুর কারণ কোন বিশেষ দেবতার শক্তি নয়, পরাপুরুষের ঐশী শক্তি—সে কথাই বলা হয়েছে।

॥ তৃতীয় পুষ্প ঃ সামাজিক ॥

শিবনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মুক্তির জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। দেশের তৎকালীন নানা অবস্থা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিত। তাঁর স্বদেশমূলক কবিতাতে আমরা স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করেছি যে, নারী জাতিকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে কোন প্রকারের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর সমাজ হিতৈষণার মূল কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল নারীজাতির মুক্তিচিন্তা। বহু গদ্যরচনার সঙ্গে কবিতাতেও এই ভাবটি তিনি নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। 'পুষ্পমালা'র সামাজিক কবিতাগুলিতে কবি নারীজাতির অন্তর্বেদনার রূপটি সমাজের কতকগুলি সমস্যার আলোকে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অন্যতম মদ্যপানের কুফল। পুরুষের অপরিমিত মদ্যপান ঘনিয়ে আনে অকালমৃত্যু, সংসারে বয়ে আনে অনিশ্চয়তা, আর তার পূর্ণ ফলভোগ ক'রে নারীকে অকাল বৈধব্যের নারকীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কেশবচন্দ্রের ভারত সংস্কার সভার মদ্যপান নিবারণী শাখার মুখপত্র 'মদ না গরল ?' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ। তাছাড়া উত্তর জীবনে তিনি নানাপ্রকার সুরাপান-নিবারণী আন্দোলনের সঙ্গে যে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, তার মূলে নারীর এই অসহায় অবস্থার প্রেরণাই ছিল সমধিক। 'দ্বীপান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত মাতাল'[১] কবিতাটি এই ভাবের বাহক। বৈধব্যের প্রাক্-মুহূর্তে নারীর মানসিক অবস্থা এবং পতি-পরিত্যক্তা নারীর মানসিক অবস্থার দুটি অপূর্ব চিত্র যথাক্রমে 'দুঃখিনী'[২] ও 'পরিত্যক্তা রমণী'[৩] কবিতাদ্বয়। পরিত্যক্তা রমণী যখন একমাত্র শিশু-পুত্রের জন্য জীবন ধারণের

১। প্রথম প্রকাশ, মদ না গরল ?, আষাঢ় ১২৭৮।
২। ঐ , ঐ , ঐ ।
৩। ঐ , সোমপ্রকাশ, শ্রাবণ ১২৭৬।

কথা ভেবে বলেছেন, 'তোমারি মায়ায় প্রাণ আর যেতে চায় না, অনলে কি বিষপানে আর মন ধায় না।' তখন আমাদের মনে টেনিসনের 'হোম্ দে ব্রট্ হার ওয়ারিয়র ডেড্' কবিতাটির বীর-পত্নীর উক্তির কথা মনে পড়ে 'Sweet my child I live for thee.' আমরা জানি শিবনাথ টেনিসনের গভীর ভক্ত ছিলেন। সন্তান-স্নেহ-বুভুক্ষু বিধবা নারীর হৃদয়ে পশুর স্থান ও পশুর প্রতি স্নেহ প্রকাশের অনিন্দ্য ছবি 'বিধবার হরিণ' কবিতাটি। আজন্ম পশুপ্রেমিক শিবনাথ মানবজীবনে পশুরও যে একটা ভূমিকা আছে, কবিতাটিতে সেই কথা বলতে চেয়েছেন। সাময়িকভাবে পতি-বিচ্ছিন্ন হলে প্রেমিকার মনে যে বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তার মনস্তত্ত্বমূলক চিত্র 'ভাবনা[১] কবিতাটি। কবিতাটিতে চিরন্তন প্রেমিকার মনোভাব ফুটে উঠেছে। বিদেশগামী যুবকের রমণী পতি-আসঙ্গ-লিপ্সায় ভাবনা করেছে,

'ডানা পেলে পরী হয়ে
পুত্রটিকে কোলে লয়ে
উড়ে যাই শূন্যে একাকিনী'—

একথা জেনে আমাদের শ্রীমতী রাধার কৃষ্ণপ্রেমের কথা মনে হয়েছে, 'পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশে উড়ি যাও, সব দুঃখ কঁহো তছু পাশে'। বিবাহিতা রমণীর পক্ষে হয়ত স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পর লোকলজ্জা ত্যাগ করে পতির বক্ষোলগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু পতি-প্রত্যাখ্যাত বা বিধবা রমণীর অন্তরের স্বাভাবিক প্রেমক্ষুধা মেটাবার মত সামাজিক ব্যবস্থা এদেশে নেই। বঙ্গসমাজে নারীর অন্তরের স্বাভাবিক কামনা সমাজের নানাবিধ অনুশাসনে প্রকাশ পায় না। কবি'ভীরু'[২] নামক কবিতায় বঙ্গবালাকে 'প্রণয়ের শিক্ষা'দানে এগিয়ে এসেছেন। প্রেম মানুষকে মনুষ্যত্বের সন্ধান দেয়,—'স্বার্থ দূরে যায়'। কাজেই প্রণয়মন্ত্রে দীক্ষিত হলেই নর-নারী 'বিমল আনন্দ স্রোতে' ভাসতে পারবে।

১। প্রথম প্রকাশ, অবলাবান্ধব, আষাঢ় ১২৭৭।
২। ষষ্ঠ সংস্করণে এই কবিতার নাম 'বঙ্গবালার প্রতি'।

॥ চতুর্থ পুষ্প ঃ প্রকৃতি ও সংগীত ॥

স্বাধীনতাবোধ শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত নয়, সমগ্র প্রকৃতি এই স্বাধীনতার সুখ উপভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। সামান্য এক চাতককে যদি পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখা হয়, তা হলে সে আকাশের জলবিন্দুর কামনায় 'দে জল, দে জল' বলে আর্তস্বরে ডেকে চলে। মুক্ত করা মাত্রই সে প্রকৃতির উদারবক্ষে উড়ে গিয়ে অনন্ত স্বাধীনতার সুখ ভোগ করে। 'চাতক বিদায়'[১] কবিতাটির মর্ম এই। অপর দিকে রয়েছে ঈশ্বরের মহান্ অবদান সংগীতের 'মোহিনী' শক্তির কথা। সংসারে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ আছে। কিন্তু যাদুতে সকলেই বশীভূত হয়। এক অন্ধ রমণীর গীতের বিষয় ছিল, যশোদার কাহিনী। 'গাইছে রমণী আজ সেই সে কাহিনী; কাঁদে নিজে যশোদার দুখে'। 'যোগীবর-ব্রহ্মাস্বাদ সম' এই সংগীত মনে পড়িয়ে দেয় শিবনাথের প্রিয় কবি ওয়ার্ডস্বার্থের 'Solitary Reaper' কবিতার কথা। মনে পড়ে যায় শেলীর কথা— 'our sweetest songs are those, that tell of the saddest thought.'

॥ পঞ্চম পুষ্প ঃ আধ্যাত্মিকতা ॥

কবি-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে শিবনাথ মুখ্যতঃ আধ্যাত্মিক কবি হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত কবিতার মধ্যে অধ্যাত্ম-চর্চাই অব্যাহত ছিল। 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার সূচনা লক্ষ্য করেছি। সেখানে কবির মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়েছে, ঈশ্বর-সর্বস্ব হয় নি। 'পুষ্পমালা'র ঈশ্বরচেতনা-মূলক কবিতাগুলিতে সেই সর্বাঙ্গীন ঈশ্বর-নির্ভরতা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেদিক থেকে এগুলিই 'পুষ্পমালা'র শ্রেষ্ঠ 'পুষ্প'।

শিবনাথ রচিত ঈশ্বরানুভূতি-মূলক কবিতাগুলি মাঝে মাঝে রূপককে আশ্রয় করেছে। আসলে আধ্যাত্মিক ভাবনার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় রূপক। 'ফুল'[২] 'উন্মাদিনী'[৩]

১। প্রথম প্রকাশ, সমদর্শী, আশ্বিন ১২৮২।
২। ঐ , ঐ , জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।
৩। ঐ , ঐ , আষাঢ় ১২৮৪। 'পাগলিনী রাজকন্যা বা জীবাত্মার ঈশ্বরান্বেষণ' নামে প্রকাশিত।

এবং 'আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি'[১] শীর্ষক কবিতাত্রয়ে রূপকের সাহায্যে ঈশ্বরচেতনার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'এ পাপ ভুবনে' ফুলের পবিত্রতার সঙ্গে মানবজীবনের তিনটি অবস্থার কিছুটা তুলনা হতে পারে, লেখকের এই মত। পতিপ্রাণা রমণীর রূপ 'আছে তব সম হয়ে'; নিদ্রাভঙ্গে শিশুর সুকুমার মুখখানি এমনই নিষ্কলঙ্ক; সাধু-ব্যক্তির চরিত্র এই প্রকার—'নিজের সৌরভে আমোদিত করে।'

ফুল থেকে সূর্য বহুদূরে থাকে। কিন্তু 'উষার না হ'তে সঞ্চার' ফুল 'আনন্দিত মনে' ফুটে ওঠে। এই রূপক ও উপমার আড়ালে কবি অধ্যাত্মতত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বর ও 'হীনমতি নরের' মধ্যে এমনই পার্থক্য। কিন্তু মন ঈশ্বরাভিমুখী হলে 'প্রাণ-পদ্ম ফুটে' এবং 'তারও তনু সিক্ত হয় প্রেমভক্তি-জলে।' ফুলকে মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। কিন্তু 'আর্যসুতগণ' যে তাকে দেবতাচরণে নিবেদন করে, ফুলের তথা জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ সদ্গতি।

স্বপ্নাবস্থায় কবি এক উন্মাদিনীকে তার 'প্রাণেশ্বর'কে সন্ধান করতে দেখেছেন। নিদ্রাভঙ্গে ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে ঐ রূপকের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এক উন্মাদিনী নারী 'প্রাণেশ্বরের' সন্ধানে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে শূন্যাকর্ষণ করে সাশ্রুনেত্রে কেঁদে চলেছে। কবির প্রশ্নের উত্তরে সে প্রাণা-রামের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছে, তিনি 'কি উজ্জ্বল, কেমন পবিত্র', তিনি 'সুপ্রসন্ন সদানন্দ প্রেমিক সুজন', তাঁর 'সুন্দর বদন' 'প্রীতি পবিত্রতাপূর্ণ', তাঁকে স্মরণ করলে চিত্ত উন্নত হয়। তিনি 'রূপে লোকাতীত, গুণে সর্বগুণাধার'—সমগ্র চরাচরে ব্যাপ্ত।

জাগ্রতাবস্থায় কবি ভেবেছেন, জীবাত্মার গতিও সংসারে এইরূপ। সমগ্র বিশ্ব এমনই 'অজ্ঞান আঁধারে চিরমগ্ন'। 'জ্ঞানবুদ্ধি সব পরাহত' হয় বিশ্ব-পিতার চিন্তায়। 'নীচ-দৃষ্টি-বিষয়ী' অবাক বিস্ময়ে দেখে ঈশ্বরপ্রার্থীর শূন্যের সঙ্গে প্রণয়। শূন্য কিভাবে পূর্ণ হয় সে কথা একমাত্র ভক্ত জানেন। নিরাকার ব্রহ্মোপাসক শিবনাথের মনে হয়েছে, তাঁর প্রাণারাম তো নিরাকার নন—রূপে-রসে তাঁকে আস্বাদন করা যায়, ঈশ্বর প্রেমের বাঁধনে ধরা পড়েন। সেই নিরঞ্জন 'প্রাণের চন্দন', বিষাক্ত সংসারে 'অমৃত-তুলিকা'; দেহের

১। প্রথম প্রকাশ, সমদর্শী, ভাদ্র ১২৮২।

অবসন্নাবস্থায় ঈশ্বর প্রাণ-স্বরূপ। ঈশ্বর-উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিবনাথের এই কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কারণ ঈশ্বরের এটি রূপরসগত উপলব্ধির কথা এবং সেকারণেই সেই উপলব্ধির কাব্যত্ব অনস্বীকার্য।

রূপকাশ্রিত তৃতীয় কবিতা 'আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি'। কবিতাটিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করি। আসক্তি নয়, বিরক্তি নয়, ঈশ্বর-চরণে লীন হবার একমাত্র উপায় হল সাধনাবলে ভক্তি পথ অবলম্বন করা। 'ভক্তি' এখানে Personified. 'তত্ত্বজ্ঞান' ও 'সাধনা' থেকেই ভক্তির জন্ম, 'আরাধনা' দ্বারা তাকে লাভ করা যায়। 'মোক্ষদুর্গে' এই ভক্তির বাস। ঈশ্বরকে পেতে হলে এই ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে ঈশ্বরারাধনার ক্ষেত্রে কবি ছিলেন ভক্তিমার্গী।

'নির্জন উদ্যানে' বসে কবির মনে হয়েছে জগতে পাখী বিভুর প্রেমের কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এজন্য কবিমন ঈর্ষান্বিত। ক্ষণেক পরে মনে হয়েছে বিহঙ্গজীবন ক্ষণস্থায়ী। কবিকে দীর্ঘজীবন সংগ্রামে অতিবাহিত করতে হবে। পাখীর জীবনের 'কোন আশা নাই', তাই সংগ্রাম নাই। আবার মানব জীবনেও আছে প্রচুর নৈরাশ্য। সেজন্য কবির প্রতিজ্ঞা, 'খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব/এই আশা এবে প্রাণে উদিত'। কর্মযোগী কবির ব্যক্তিক-চিন্তা এর পরে স্বদেশ-চিন্তায় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সমগ্র ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলার জন্য কবি পাখীকে অনুরোধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি একটি গ্রীক myth-এর আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে ভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে তিনি 'পাখী'[১] কবিতাটিকে সমাপ্ত করেছেন।

'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'গভীর নিশীথে'-র[২] আলোচনা সব শেষে করছি। কারণ 'ঈশ্বরানুভূতির এইরূপ উচ্চভাবের অকৃত্রিম কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে ত বড় বেশি দেখিতে পাই না। ধর্মরসজ্ঞ কবির চমৎকার বর্ণনার গুণে বক্তব্য বিষয়টি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।'[৩] —এই ভাবই 'পুষ্পমালা'র কেন্দ্রীয় ভাব। আত্ম-স্বরূপদর্শনের পটভূমিকায় বিশ্বরূপের

১। প্রথম প্রকাশ, সমদর্শী, বৈশাখ ১২৮২।

২। ঐ , ঐ অগ্রহায়ণ ১২৮১।

৩। অমৃতলাল গুপ্ত, কাব্যে লোকশিক্ষা, ভারত মহিলা, ফাল্গুন ১৩১৪।

গভীর উপলব্ধি হল এর মূল বক্তব্য। এই উপলব্ধি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও ঘটেছিল, '·· আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম।'[১] 'আঁধার-সাগর-গর্ভে' মগ্ন কবির মনে আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠেছে—'কে আমি?' মনে হয়েছে বিশ্বলীলায় তিনি 'কীটানু হয়ে রেণু-কণা মাঝে প'ড়ে আছেন। আর ঈশ্বর—'কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্রতারা, / কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যাঁর ভয়ে, / সেই তুমি' তিনি বুদ্ধির অগম্য। একথা ভেবে কবির দৃষ্টি সহজ হয়ে গেছে।

কবি বিশ্বের রূপরহস্য জেনেছেন—বিশ্ব 'প্রাণরূপে / বিরাজিত। প্রাণরূপে অন্তর বাহিরে। / প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে, / গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোকে ভূলোকে'। কবি জেনেছেন, এই বিশ্বজননীর তিনি স্নেহের সন্তান।

'এই যে আঁধার ইহা তব স্নেহ-ছায়া।
ঢেকেছে আমারে, যথা মাতা বিহগিনী
আপন শাবকে ঢাকে। ঢেকেছে আমারে
প্রাণ-বাসে।'

॥ ৪ ॥

আধ্যাত্মিক কবিতাগুলি বাদ দিলে শিবনাথের প্রায় সকল কবিতার মধ্যে একটা আখ্যায়িকা সন্ধান করা যায়। এ দিক থেকে শিবনাথ উনিশ শতকের কবিদের পর্যায়ভুক্ত। সিদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের সমগোত্রীয় নন। কিন্তু হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পাশে স্থান পাবার উপযুক্ততা তাঁর ছিল। তবুও কাব্যজগতে তিনি যে বিস্মৃতপ্রায় কবি, তার মূল কারণ প্রায় সকল কবিতার একমুখী গতি—আধ্যাত্মিকতা। নীতিভারে কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যই ব্যাহত হয়েছে। মধুসূদনের সমাজনিরপেক্ষ আর্টের সাধনা শিবনাথের করায়ত্ত ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না। কিন্তু হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যে কবিতাগুলিতে সৌন্দর্যবিলাস মুখ্য নয়, সেই কবিতাগুলির পাশে শিবনাথের কবিতা অবশ্যই স্থান পেতে পারে,—বিশেষতঃ, স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি।

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬২), পৃঃ ১৮-১৯।
আরও দ্রষ্টব্য উক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট ৬, পৃঃ ২৬০-৬১।

'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থে মধুসূদন, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের প্রভাব সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়। 'দুর্গাবতী' কবিতায় রঙ্গলাল, 'ব্রহ্মবিদ্যায়' হেমচন্দ্র এবং 'গভীর নিশীথে', 'উন্মাদিনী' ও 'উত্তেজনা' কবিতাত্রয়ে মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ্য করি। অবশ্য সে প্রভাব সচেতন অনুসরণের ফল নাও হতে পারে, কাব্যের যুগগত রীতিনীতির অনতিক্রমণীয় ফল হতে পারে। ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে কবির মৌলিকতাও এই প্রসঙ্গে আলোচিতব্য।

শিবনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ কেবলমাত্র সমিল অমিত্রাক্ষরে রচিত। কিন্তু পুষ্পমালায় যে খণ্ড কবিতাগুলি গ্রন্থিত হয়েছে, তাতে ছন্দোবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। 'গভীর নিশীথে' শীর্ষক প্রথম কবিতায় তিনি অমিল অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন। অন্য কবিতাগুলির মধ্যে এখানে পূর্ণ-ভাব-যতি প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতা দেখা যায়। কারণ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি চার মাত্রার পর পূর্ণ-ভাব-যতি ব্যবহার করেছেন। হরিষে বিষাদ, ব্রহ্মবিদ্যা, উন্মাদিনী, বিদায় প্রভৃতি কবিতা সমিল অমিত্রাক্ষরে লিখিত। অবশ্য তাদের মিলের পদ্ধতি এক নয়। এই অমিল বা সমিল অমিত্রাক্ষরে লিখিত কবিতাগুলিতে ছন্দের ওজোগুণ ও গতিময়তা তেমন পরিস্ফুট হয় নি এবং এদের মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন দুর্নিরীক্ষ্য নয়। 'উৎসর্গ' কবিতার স্তবক বিন্যাসের সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'খণ্ড কবিতাবলী' ও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'র স্তবক বিন্যাসের মিল লক্ষ্য করা যায়। এতে ছয় মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে, কোন চরণের পর্বের সংখ্যা দুই, আবার কোন চরণের পর্বের সংখ্যা চার। ছন্দ অক্ষরবৃত্ত কিন্তু পর্ব ছয় মাত্রার।

প্রকৃত সাহস, চৈতন্যের সন্ন্যাস, মাতৃদর্শন, ফুল, বহুদূর নয়, 'আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি' ইত্যাদি কবিতার প্রতি চরণের পরিমাপ হচ্ছে বার মাত্রা। এই কবিতাগুলির ছন্দোভঙ্গি একাবলী ছন্দেরই নিকটবর্তী। নবীনচন্দ্র সেনও এই ছন্দে কবিতা লিখেছেন,

সোনার পুতুলে অঙ্গ সুশোভন,
শিরে পতি শিব চন্দ্রের মতন।
('প্রতিকৃতি')।

'পুষ্পমালা'র কবিতাগুলি কতখানি কাব্যগুণসম্মত সে কথা তর্কসাপেক্ষ হলেও সামগ্রিক বিচারে কবিতাগুলি মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়। "...'পুষ্পমালা' কাব্যে শিবনাথ বাবুর নিসর্গের সৌন্দর্য, ধর্মের গাম্ভীর্য,

হৃদয়ের সৌকুমার্য, চরিত্রের ঔদার্য, কল্পনার মাধুর্য ও দেশভক্তির প্রাচুর্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।…শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতা সমূহের মধ্যে দুষ্টপ্রণয়ের আবিলতা ইংরাজী কবির নিকৃষ্ট অনুকরণ প্রবণতা দেশহিতৈষিতার ভাণ ও আলো-আঁধারে কবিতার লেশমাত্রও নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ যারপরনাই সুরুচিসম্পন্ন ও সদ্ভাবপূর্ণ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী একজন প্রকৃত হৃদয়বান্ ধার্মিক কবি।"[১] রসের দিক থেকে না হলেও তথ্যের দিক থেকে সমালোচকের এই মন্তব্য অনস্বীকার্য।

১। হেমনাথ মিত্র, ইংরাজশাসনে বঙ্গ সাহিত্য (৪র্থ প্রস্তাব), নব্যভারত, আষাঢ় ১২৯৫, পৃ: ১৫৩।

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ : হিমাদ্রি কুসুম

॥ ১ ॥

'হিমাদ্রি কুসুম' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মশেষে শিবনাথ অপর তিনজন বন্ধুসহ 'হিমালয় শিখরে' (কার্সিয়ঙ্) যান। উদ্দেশ্য ছিল, সহরের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে 'নির্জনে ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে আত্ম-সমর্পণ।' প্রায় এক মাস ধরে অধ্যাত্ম-চর্চার ফলে তাঁর মনে নানাভাবের উদয় হয়েছিল। 'প্রতিদিন উপাসনা ও চিন্তার দ্বারা প্রাণে যে সকল ভাব' তিনি উপলব্ধি করতেন, তা গ্রন্থাকারে লিখে রাখতেন। 'হিমাদ্রি কুসুম' কাব্য সেই ভাবনিচয়ের বাণীরূপ। গ্রন্থটি কন্যা হেমলতাকে উৎসর্গীকৃত।

॥ ২ ॥

'হিমাদ্রি কুসুমের' দীক্ষা নামক দীর্ঘ কবিতায় দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি ঘটনার সাক্ষাৎ প্রভাবের কথা কবি স্বীকার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যানমালাতে লিখেছেন,—'প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা কি জ্যোতি।' শিবনাথ লিখেছেন, 'এই মহাসত্যই আমি দীক্ষা নামক গ্রন্থে যথাকথঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি ···মানবের প্রীতি আমাদিগকে অনেক সময়ে সত্য-স্বরূপে লইয়া যায়। তাঁহাকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া সেই প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া বসুধাকে ধৌত করিতে থাকে, এই সত্যটি প্রদর্শন করাই উক্ত গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য।'[১]

দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত কবি ওয়ার্ডস্বার্থের জীবনেরও পরোক্ষ প্রভাব কবিতাটিতে পড়েছে। এ কথা প্রসঙ্গক্রমে জানা যাবে।

॥ ৩ ॥

কাব্যগ্রন্থটি চারটি ভাগে বিভক্ত :—দীক্ষা, সৌন্দর্য, বিচ্ছেদ, বৈধব্য। এবং পরিশেষে হিমালয় পরিত্যাগের পূর্বে বিদায় গ্রহণোপলক্ষ্যে 'বিদায়'

১। ভূমিকা, হিমাদ্রি কুসুম (১৮৮৭)।

নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতা সংযুক্ত হয়েছে। সেকালে সর্গবদ্ধ কাব্য রচনার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। লক্ষণীয় এই যে, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ইত্যাদির মত সর্গবদ্ধ আখ্যান-কাব্য রচনার একটা চেষ্টা শিবনাথ অংশতঃ এই কাব্যে করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, কাব্যের রীতিগত প্রথা তিনি স্থানবিশেষে অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন নি। অবশ্য এখানে সর্গবদ্ধ রচনাগুলিও আবার বিভিন্ন স্তবকে বিভক্ত।

'দীক্ষা': পদ্যে বিরচিত এই দীর্ঘ কথিকাটির নায়ক নরেন্দ্র ধনী ও বিদ্বান্। কিন্তু তাঁর পত্নী তাঁর ভালবাসার মূল্য না দিয়ে গৃহত্যাগ করলে নায়কের মনে গভীর বিরাগ উপস্থিত হয়। তিনি লোকালয় ছেড়ে বনে বাস করতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন ভগ্নী বিনোদিনী। বনবাসের প্রথমাবস্থায় নরেন্দ্রের মনে প্রবল নর-দ্বেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। ধীরে ধীরে 'নরেন্দ্র ভুলিছে পূর্বকথা; প্রসন্নতা আসিছে জীবনে।' নায়কের চিত্ত সহসা গভীর আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পেয়েছে। বিনোদিনীর মধ্যেও সেই ভাব সঞ্চারিত হয়েছে। এদিকে 'বঙ্গে ঘোর হাহাকার' উপস্থিত। দুর্ভিক্ষের কথা ভেবে কবিমন পীড়িত। নরেন্দ্রের মনেও ধীরে ধীরে 'নরপ্রীতি' জেগে উঠেছে। তাঁরা দেশে ফিরে এসে সমাজের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নকর্মে আত্মোৎসর্গ করলেন। পলায়িতা পত্নীও এসে সেই মহান্ ব্রতের অংশীদার হবার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে।

প্রকৃতির সান্নিধ্যে অন্তরে ঈশ্বরভাবের উদ্বোধন, ভগিনীর প্রীতিতে অন্তরে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব এবং মানব-সেবাতেই ঈশ্বরপ্রীতির পরাকাষ্ঠা—'দীক্ষা' অংশের মূল বক্তব্য হল এই। 'ভগিনীর প্রীতিকে ভ্রাতার নবজীবন লাভের সেতুস্বরূপ' করা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে নূতন। কবিতাতে সেই ভাব-প্রকাশ আরও নতুনত্বের দ্যোতক। 'ভাই ভগিনীর প্রগাঢ় প্রীতি···এ দেশের পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইবে'—একথা কবি জানেন বলেই চিন্তাশীল পাঠকের দরবারে এর স্বাভাবিকতা নিরূপণের আবেদন জানিয়েছেন। এই ভাব কবি তাঁর প্রিয় কবি ওয়ার্ডস্বার্থের জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন বলে অনুমান করি। ভগ্নী ডরোথিও একসময়ে জীবনের ঘোরতর দুর্দিনে ভ্রাতা ওয়ার্ডস্বার্থের পাশে থেকে প্রকৃতির মধুর স্পর্শের মধ্য দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

'দীক্ষা' কবিতাটি চারটি 'দলে' বিভক্ত। সাধকের জীবনেও চারটি অবস্থা আছে। 'প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্য, দ্বিতীয় অবস্থায় সাধন, তৃতীয় অবস্থায় ভক্তিলাভ, চতুর্থ অবস্থায় মানব-প্রীতিতে সেই ভক্তির পূর্ণতা।'[১] দেবেন্দ্রনাথের সাধক-জীবনেও এই চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়,—শ্মশানে বৈরাগ্যের উদয়, হিমালয় গমন ও সেখানে দু'বছরের কঠোর সাধনায় ব্রহ্মদর্শনান্তে ভক্তিলাভ এবং অন্তরের প্রীতি সংসারের প্রতি ধাবিত, সংসারে পুনরায় আগমন ও লোকহিত সাধন। দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিহারীলালের অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে মনে করি। কিন্তু এই দুটি ভাব ছাড়াও এই কাব্যের '···আর একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।' সেই উদ্দেশ্য কবি প্রকাশ করেন নি। কবি এ সময়ে নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে একটি 'সাধন আশ্রম' স্থাপনের ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। 'দীক্ষা' কবিতার শেষে যে আশ্রম স্থাপনের কথা দেখি—তাকেই কবির 'গূঢ় উদ্দেশ্য' বলে অনুমান করি।

আরও একটি ব্যাপার প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়। শিবনাথ গ্রন্থের উৎসর্গে 'দীক্ষা' ভিন্ন অন্য কবিতাগুলি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি। সম্ভবতঃ এই কবিতাটির মধ্যে কবির আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের ইতিহাসটি সর্বাধিক পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে।

সৌন্দর্য কবিতাটি আখ্যায়িকাহীন। কতিপয় বন্ধুর মুখে জগতের শ্রেষ্ঠ 'সুন্দর সুরম্য দৃশ্য'গুলি বর্ণিত হয়েছে। অরণ্য, পর্বত, সাগর ও বাসন্তী পূর্ণিমার অপূর্ব দৃশ্যসমূহের বিচিত্র বর্ণনা এঁরা দিয়েছেন। প্রকৃতি ব্যতীত রমণী ও সাধুতার মধ্যেও যে সৌন্দর্য আছে তা-ও বিশ্লেষিত হয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে বিহারীলাল প্রমুখেরা বাংলা কাব্যজগতে যে সৌন্দর্যবাদের সূত্রপাত করেছিলেন, শিবনাথ সেই প্রকারের সৌন্দর্যচর্চা করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে কবি একটি সামাজিক প্রথার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গুজরাটে 'নাহি অবরোধ-পীড়া বঙ্গের মতন'। এ দৃশ্য কবিকে আনন্দ দিয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কবি অবরোধপ্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন।

১। অমৃতলাল গুপ্ত, কাব্যে লোকশিক্ষা, ভারত মহিলা, ফাল্গুন ১৩১৪।

'বিচ্ছেদ' কবিতাটিতে প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের ভাব নিয়ে দুটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'প্রথম দলে' পুরুষ তাঁর বন্ধুকে মাতুলালয়ে মৃণালিনী নামক এক বিধবার প্রতি তাঁর আসক্তির কাহিনী জানিয়েছেন। কিন্তু 'বৈধব্য' নামক সামাজিক প্রথা তাঁদের মিলনে বাধাসৃষ্টি করেছে। অপরদিকে 'দ্বিতীয় দলে' মৃণালিনী তাঁর সখীকে তাঁর প্রেমিকের ঔদার্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সামাজিক বাধা তাঁদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলেছে। মৃত্যুর পরপারে তিনি প্রেমিকের সাথে মিলিত হতে পারবেন, এই তাঁর বিশ্বাস।

অকাল বৈধব্য ও সামাজিক শাসন কবিচিত্তকে চিরদিন পীড়া দিয়ে এসেছে। 'বিদ্যাসাগরের চেলা' শিবনাথ তাই নায়কের মুখ দিয়ে নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছেন,—

'করেছি প্রতিজ্ঞা ভাই, সেই দেশাচারে
সরলা নারীর প্রাণ পিষে এ প্রকারে,
তাহার উচ্ছেদ-ব্রতে সঁপিব জীবন ;
নিব না এ কণ্ঠে আমি দাম্পত্য বন্ধন।'

—এই ব্রত তাঁর স্মৃতিতে নিত্য হোমাগ্নির মত জ্বলবে।

'বৈধব্য' কবিতাটিতে পত্নীর হৃদয়ে পতির প্রতি যে ভালবাসা পতির মৃত্যুর পরেও অম্লান থাকে, তার কথা এক পক্ষী-দম্পতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

॥ ৪ ॥

শিবনাথ এই কবিতা চতুষ্টয়কে 'চারিটি ফুল' বলেছেন—যার সৌরভ অফুরন্ত এবং যা শুকিয়ে ঝরে যাবে না। এর গন্ধে আছে আধ্যাত্মিকতা, প্রেম ও শান্তির পরশ। আধ্যাত্মিকতা কবিতাগুলির সাধারণ লক্ষণ হলেও প্রতি কবিতারই মূলে এক একটি বিশেষ সত্য বা নীতি নিহিত আছে। পতিতা-উদ্ধার, বিধবাবিবাহ, মদ্যপান, আশ্রম স্থাপন, অবরোধ প্রথা, জাতিভেদ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলিও কবি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন। সে দিক থেকে "দীক্ষা হইতে বিদায় পর্যন্ত এমন একটা কবিতা নাই, যাহা পড়িয়া উঠিলে সৌন্দর্য-সম্ভোগ-সুখের সঙ্গে সঙ্গে সৎভাব ও

সাধুসংকল্প হৃদয়ে উদিত হয় না।"[১] এটিই কাব্যের উদ্দেশ্য ও পরিণতি। কাব্যে বর্ণিত নিসর্গবর্ণনায় শিবনাথের দক্ষতা সহজেই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়।

কবিত্বের দিক থেকে 'হিমাদ্রি কুসুম' 'পুষ্পমালা'র সমকক্ষ নয়। কারণ লোকশিক্ষার ভাব কবিত্বের যথেষ্ট হানি ঘটিয়েছে। তবুও কাব্যটিতে মাঝে মাঝে যে কবিত্ব ফুটে উঠেছে, তা থেকে মনে হয়, নানা প্রকার সামাজিক আন্দোলনে কবিচিত্ত ভারাক্রান্ত হলেও তাঁর কবিত্ব শক্তি নষ্ট হয়ে যায় নি। ঈশ্বর-দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের বর্ণনায় শিবনাথ আশ্চর্য সিদ্ধি অর্জন করেছেন। 'দীক্ষা'র অন্তর্গত 'দ্বিতীয় দলে'র ৩৫ থেকে ৪২ স্তবক এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। পুনরায়, ধ্যান-মগ্ন বিনোদিনীর ('দ্বিতীয় দল' ৭০ সংখ্যক স্তবক) রূপটিও আশ্চর্য কবিত্বের সঙ্গে বর্ণিত।

ধ্যানে মগ্ন বিনোদিনী, মুকুতা গলিয়া
বহে যেন দুকপোলে। বায়ু দিবাকর
উভয়ে ঝগড়া করে, সে মুখ চুম্বিয়া
কে আগে শুখাবে অশ্রু। ভক্তিতে সুন্দর,
প্রস্ফুটিত মুখ-পদ্ম দেয় ছড়াইয়া
কি এক অপূর্ব ভাব! বনের বানর
বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেই মুখ হেরে ;
বন-পশু যায় আর চায় ফিরে ফিরে।

শিবনাথের অক্ষুণ্ণ কবিত্বশক্তি আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে। 'হিমাদ্রি কুসুমের' প্রথম ১৫৪ চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত। এখানে সেখানে ভাব-যতির ইতস্তত: প্রয়োগ সত্ত্বেও ছন্দের ঢঙ্ পয়ারেরই। মাঝে মাঝে হেমচন্দ্রের ঢঙে কবিকে ছত্র রচনা করতে দেখা যায়। যেমন,

একি হলো প্রাণে বিষ কে ঢালিল তার রে!
সাধের সংসার তার হলো কারাগার রে!
বিরস, বিষয়-কাজে আর মন বসে না ;
যে হাসিত দিবানিশি আর সে তো হাসে না!

১। গ্রন্থ সমালোচনা, নব্যভারত, শ্রাবণ ১২৯৪ সাল পৃ. ২২২।

১৫৫ পঙ্ক্তি থেকে প্রথম দলের পূর্ব পর্যন্ত অংশটি ভিন্নতর ছন্দে রচিত। এখানে স্তবকের পরিচয় হচ্ছে,—

৮+৬
১০
৮+৮
১০
৮+৬

'দীক্ষা'র অবশিষ্টাংশ আট চরণের স্তবক-বন্ধের দ্বারা গঠিত। সেই স্তবক-বন্ধগুলি রচনায় শিবনাথ অবশ্য যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। স্তবকগুলিতে প্রথম ছয় চরণে দুটি মাত্র একান্তর মিল আছে—কখ, কখ, কখ এবং শেষ দুটি চরণে আছে পয়ারের মিল—চচ। এই ধরণের মিল বিন্যাসের দ্বারা স্তবকগঠন অবশ্য খুব সহজ নয়।

কাব্যগ্রন্থের 'সৌন্দর্য' ও বিচ্ছেদ' শীর্ষক অংশদ্বয় সমিল অমিত্রাক্ষরে রচিত। এই অংশ শিবনাথের নিজস্ব ঢঙে রচিত এবং তাঁর এই ছন্দে লিখিত অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। 'বৈধব্য' শীর্ষক কবিতাটি চার চরণের স্তবক-বন্ধের দ্বারা গঠিত। এতে হেমচন্দ্রের ঢঙে ক্রিয়াপদ ও নেতিবাচক শব্দ দ্বারা মিল গঠনের প্রয়াস দেখা যায়। যেমন, আসিল-বলিল, বাঁধিল-রহিল, শুনিয়া-মিশিয়া, যায় না-হয় না ইত্যাদি।

কাব্যগ্রন্থটির শেষ কবিতা 'বিদায় বিদায়' সনেটের রূপবন্ধে রচিত। এর মিলের পদ্ধতি হচ্ছে কখ কখ, গঘ গঘ, পফ পফ, চচ। স্পষ্টতঃই মিলের দিক থেকে এটি শেক্সপীরীয় সনেট। প্রথম বারটি চরণে কবি একটি তুলনার সাহায্যে হিমালয় ভ্রমণে বন্ধু চতুষ্টয়ের আনন্দের বর্ণনা দিয়েছেন এবং শেষ দুটি চরণে বলেছেন সেই ভ্রমণের অবিস্মরণীয়তার কথা। সুতরাং কবিতাটির গঠনের মধ্যে একটা logical deduction-এর ভঙ্গি আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেক্সপীরীয় রীতির সনেট হিসাবে কবিতাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

কাব্যটিতে মধুসূদনের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয় (দ্রষ্টব্য, 'দ্বিতীয় দল' ৬০ সংখ্যক স্তবক ও 'প্রথম দল' প্রথম স্তবক)। 'তৃতীয় দলে'র অষ্টম সংখ্যক স্তবকের শেষ পঙ্ক্তি 'নয়নের ঠুলি/খুলে দে মা অনন্তের শোভা দেখে ভুলি' পাঠে রামপ্রসাদের বিখ্যাত শাক্তগীতির কথা মনে পড়ে।

কিন্তু কাব্যটির মাঝে মাঝে এমন বর্ণনা ও শব্দ ব্যবহার আছে যে, স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে সেগুলি গভীর বিরক্তি উৎপাদন করে। 'প্রথম দলের' ৩৯ থেকে ৫২ সংখ্যক স্তবকে যে পশুপ্রীতির বর্ণনা আছে, তাতে পাঠকের মন বিরক্ত হয়। নবীনচন্দ্র নাকি তাঁর ছাগলবধ কাব্য নিয়ে রসিকতা করেছিলেন।[১] 'বৈধব্য' নামক কবিতাটিতে বিধবা বিহঙ্গিণীর সতীধর্মের পরকাষ্ঠা নীরস ও আপাত হাস্যকর বলে মনে হয়। রূপকের অসঙ্গত প্রয়োগ ও বাস্তববোধের অভাবের জন্য বর্ণনাটি পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে নি।

লৌকিক শব্দ ব্যবহারেও এই অমনোযোগিতা ও অসঙ্গতি লক্ষিতব্য। ভেঙ্গে, রেতে, চোকে, ঐ যা, 'চিনি-অণু, জল-অণু' প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার কাব্যভাবের পক্ষে যেমন উপযুক্ত হয় নি, তেমনি ছন্দের পক্ষেও সুখশ্রাব্য হয় নি।

১। নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন (বসুমতী সংস্করণ), ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ : পুষ্পাঞ্জলি

॥ ১ ॥

চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাব্যটি এবং 'হিমাদ্রি কুসুম' কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে 'জীবন কাব্য'[১] নামে একটি ৩৬ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র কাব্যসংকলন 'অন্য কয়েক জনের লিখিত পদ্যসহ' প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। এই সংকলনে মোট নয়টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'হায় হায় কি হবে আমার', 'অনুতাপ', 'এ মোর কামনা', 'অশ্রুজল' ও 'বাসনাষ্টক' শীর্ষক কবিতাগুলি পরে 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্য মোট কুড়িটি কবিতার সংকলন। এর মধ্যে তিনটি কবিতা[২] 'পুষ্পমালা' থেকে পুনঃসংকলিত হয়েছে। 'বিচ্ছেদে রোদন'[৩] নামক কবিতাটির কথা আমরা পূর্বেই কবিজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকায় আলোচনা করেছি। এই চারটি কবিতা বাদ দিয়ে বাকী ষোলটি 'পুষ্পের' আমরা 'আঘ্রাণ' গ্রহণ করছি।

॥ ২ ॥

'বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে আর এক অঞ্জলি পুষ্প উপহার দেওয়া যাইতেছে। যে সকল ফুল ধনীদের বাগানে ফোটে ও যাহা বাবুদিগের বিবীদিগের করপল্লবে সুশোভিত হইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাতে সে জাতীয় পুষ্প অধিক নাই। যে সকল ফুল সচরাচর ঠাকুর-পূজার জন্য ব্যবহার হয়, ইহাতে সে জাতীয় পুষ্প অধিক। মধ্যে মধ্যে দুই একটি অন্য ফুল আছে।'

১। আখ্যাপত্রটি এইরূপ : জীবন-কাব্য। / সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার/বিভাগ হইতে প্রকাশিত। / কলিকাতা। / ৮১নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে./ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১২৯১/ মূল্য ৵০ আনা।

২। 'দুখিনী', 'উত্তেজনা' এবং 'সুমতি ও সুগতি'।

৩। প্রথম প্রকাশ, ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই শ্রাবণ ১৭৯২ শক।

অর্থাৎ কবিতাগুলিতে ভোগসর্বস্ব চিন্তার পরিবর্তে ভগবৎ ভক্তি বা ধর্মবোধই প্রধান স্থান পেয়েছে। 'অন্য ফুল'গুলিতে মানববোধই প্রবল। আমরা 'পুষ্পাঞ্জলি'র কবিতাগুলিকে ধর্মরস ও মানবরস—এই দুই ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করছি।

॥ ৩ ॥

'ধর্মরস' পর্যায়ের এগারটি কবিতার মধ্যে আত্মবিচারণা, আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, আবেদন ও নিবেদনের বিভিন্ন ভাব ফুটে উঠেছে।

অনুতাপ ও প্রার্থনা

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম লগ্নে মনে জাগে কৃতকার্যের প্রতি অনুতাপ এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার আশঙ্কা। 'হায় হায় কি হবে আমার'[১] কবিতাটিতে কবির আত্মসমীক্ষা, অনুতাপ ও ঈশ্বরনিষ্ঠার গভীর প্রকাশ রয়েছে। 'অনুতাপ' কবিতায় শৈশবের স্মৃতি কবিকে দগ্ধ করেছে অনুতাপাগ্নিতে। তিনি শৈশব থেকে ঈশ্বর ভজনা করতে পারেন নি—এই পাপবোধে ক্লিষ্ট কবির কণ্ঠে প্রার্থনা ঝরে পড়েছে, 'দুর্গতিরে বিতর সুমতি'। সবশেষে নির্ভরতা,—'তব কৃপা-সুবাতাস/যার লাগে, কিবা ত্রাস,/ তরে সিন্ধু গোষ্পদ সমান।' আফ্রিকার এক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত 'সেন্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ'[২] নামক দীর্ঘ কবিতার মূল বক্তব্যও বঞ্চনা এবং অনুতাপ। ধর্মহীন শিক্ষার যে কি কুফল, তা পরিত্যক্তা মাতার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বাঙ্ময় রূপ ধারণ করেছে।

অনুতাপদগ্ধ কবিমন সান্ত্বনা পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিবিধ প্রার্থনা করেছে। সংসারে বিভিন্নরূপে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন কবি 'এ মোর কামনা' কবিতায়। এ থেকে কবিহৃদয়ের আধ্যাত্মিক ঔদার্য ও সাধুতা সুনিশ্চিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বাসনাষ্টক' কবিতায় আটটি বাসনার মূল বক্তব্য হল ঈশ্বর প্রেমে যেন কবির মতি স্থিরনিবিষ্ট হয়। কবিতাটি কিছু পরিমাণে বৈষ্ণবভাবনা জারিত।

আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে রূপকের আধার গ্রহণ 'ধার্মিক কবি'

১। প্রথম প্রকাশ, তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা, ১৬ই আশ্বিন ১৮০২ শক।
২। ঐ , বামাবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৮৯।

শিবনাথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ‘পুষ্পমালা’য় সে কথা আমরা আলোচনা করেছি। ‘পুষ্পাঞ্জলি’র রূপকাশ্রয়ী কবিতা দুটি যথাক্রমে ‘ভাইবোন’ ও ‘প্রভাতের ফুল’। ভাই-বোন নৌকা বেয়ে জলঝড় অতিক্রম করে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছেচে। ভাই এখানে ‘জ্ঞান’ ও বোন ‘ভক্তি’ রূপে কল্পিত।

‘এইরূপে জ্ঞানভক্তি একত্রে মিলিয়া,
মন-তরি যদি যায় লয়ে,
তবে তো এ ভব-ঘোর জলধি তরিয়া
যেতে পারি ব্রহ্ম-পদাশ্রয়ে।’

প্রসঙ্গক্রমে কবি বঙ্গরমণী ও পুরুষের যুক্ত উদ্যোগে যে সমাজ সংস্কার সম্ভব, সে কথার উল্লেখ করেছেন। ‘প্রভাতের ফুল’ কবিতাটিতে ঈশ্বর-প্রার্থনায় জীবনাতিবাহিত করার সংকল্প আছে। বনমধ্যে উড়ন্ত ভ্রমর ‘পূর্ণসুধাভারে’ একটি ক্ষুদ্র পুষ্পের কাছে এসে নানা ছন্দে স্তুতি জানিয়েছে—

কোথা সে ভকত সাধু প্রেমিক সুজন,
প্রাণপাত্রে ভক্তি-সুধা ভরিয়া যে জন
রূপক ও প্রকৃতি আপনা লুকায়ে, আছে দীন হ’য়ে,
গেলে যাঁর পাশ প্রাণের পিয়াস
জনমের তরে মোর হবে নিবারণ’—

কবি সংবাদ পেলে সেখানে যান। এখানে ফুল=ভক্তি, ভৃঙ্গ=সাধকের চিত্ত।

এই প্রকৃতিভাবনা স্পষ্টত: প্রকাশিত হয়েছে ‘সুখ’ ও ‘নিশান্তে ভজন’ নামক কবিতাদ্বয়ে। ‘হিমাদ্রির কোলে’ বসে কবির মনে গিরির সৃষ্টিতত্ত্বের কথা জেগেছে। সৃষ্টি রহস্যের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কবি তত্ত্ব ও বিজ্ঞানকে একত্রিত হতে দেখেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বের এক অপূর্ব মনোময় ব্যাখ্যা কবি ‘সুখ’ কবিতায় দিয়েছেন,—

‘অন্তরে উত্তাপ পূরি’ প্রকাশে মেদিনী,
তাপে হৃদি উঠে উচ্ছলিয়া ;
উছলিত হৃদি তার—অপূর্ব মোহিনী,
ডাকে লোকে পর্বত বলিয়া।’

প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ কবিচিত্ত ঈশ্বর সন্ধানে মগ্ন হয়ে পরম উপলব্ধির সাক্ষাৎ পেয়েছে : ‘ডুবেছি ঈশ্বর দেখি হৃদয় আগারে।’ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর নিত্য

লীলাময়। 'নিশান্তে ভজন' কবির ঈশ্বররূপাস্বাদনের এক অপূর্ব অনুভূতিময় কবিতা। পরিশেষে আত্মনিবেদনে 'এবার হলাম তোমারি'—ঈশ্বরব্রতের পূর্ণাহুতি।

আত্মনিবেদনের তৃপ্তি অন্তরে এক সংবেদনশীল কম্পনের সৃষ্টি করে—চোখে 'বহে আনে বিমল অশ্রুধার'। সেই 'অশ্রুজল' বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নাবস্থায় স্থাপিত করে। 'পাপীর নয়নের অনুতাপাশ্রু' ভক্তিমার্গী করে তোলে। ভক্ত-আঁখিতে তখন 'ভক্তি-বারির' শোভা অনিন্দ্য-রূপময় হয়ে ওঠে। কবি প্রার্থনা করেছেন, পরদুঃখে 'প্রেম ধারা! থাক সদা আমার নয়নে।' পাষাণ যেমন বিগলিত হয়, ঈশ্বরের করুণার নিদর্শন হয়ে কবিও যেন দ্রবীভূত হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ঈশ্বরের করুণার মূর্ত রূপ। আত্মীয় বিচ্ছেদের তীব্র ব্যথা এর আশ্রয়ে শান্তির সন্ধান পেয়েছে। 'দরিদ্রের বন্ধু' এই ব্রহ্মমন্দির ধীরে ধীরে বৃহৎ হয়ে উঠবে, 'ব্রহ্ম মন্দির' কবিতায় কবির এই প্রার্থনা।

অশ্রু ও উৎসব

॥ ৪ ॥

মানবরস প্রধান কবিতাপঞ্চকে সমাজে ধনীর অত্যাচার, মদ্যপানের কুফল, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুতে শোকের কথা প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে কবিতাগুলি 'পুষ্পমালা'র সমাজমূলক কবিতানিচয়ের সমগোত্রীয়। 'প্রেমের মিলন'[১] কবিতায় ধনীর অত্যাচারে দুটি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অপমৃত্যুর করুণ কাহিনীটি ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটি পাঠে আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটিকে মনে পড়ে। কবিতাটির নায়ক কৈবর্ত মহেশ সর্দার বাংলা কাব্যের বিস্তীর্ণ আসরের একপাশে সম্ভবতঃ প্রথম ঈশ্বর পাটনীর পাশে স্থান পাবার উপযুক্ততা অর্জন করেছে। একটি সামাজিক অব্যবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছে 'বালবিধবার স্বপ্ন' নামক কবিতাটিতে। বাল্যকালে বিধবা হলেও অন্তরের স্বাভাবিক কামনা সমাজ-ব্যবস্থার কারণে চরিতার্থ হয় না। সেই কামনা

১। প্রথম প্রকাশ, বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১২৮৯ সাল, 'সুখের মিলন' নামে প্রকাশিত।

স্বপ্নে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে নৈরাশ্যের বেদনাই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি মনস্তত্ত্বসম্মত।

মদ্যপানের ফলে ভারতের সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবন যে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, 'পুষ্পমালা'র আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথার আমরা উল্লেখ করেছি। 'জল ঝড়ে' কবিতাটি মদ্যাসক্ত স্বামীর অবহেলায় পত্নীর অকালমৃত্যু এবং সেই প্রসঙ্গে এক দয়ালু ব্যক্তি কর্তৃক অনাথ পুত্র-কন্যার ভার গ্রহণের করুণ কাহিনী। আর সুরামদে মত্ত পিতা কর্তৃক সাত বছরের শিশু পুত্রকে প্রহারের মর্মস্পর্শী আখ্যান 'বাবা তুমি ঘরে এস না' শীর্ষক কবিতাটি।

'পুষ্পাঞ্জলি'তে আর একটি অন্য ফুল 'নব শোক' কবিতাটি। এটি কবির শোকাপ্লুত হৃদয়কাননে ফুটেছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কবি যখন মুঙ্গেরে বাস করছিলেন সে সময় সরোজিনী নামে কবির একটি কন্যা গৃহের ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। কবিতাটি সেই উপলক্ষ্যে রচিত।[১]

॥ ৫ ॥

সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 'পুষ্পাঞ্জলি'র কবিতাগুলির প্রধান উপজীব্য। মাঝে মাঝে myth-এর আশ্রয় গ্রহণ করে কবি তাঁর বক্তব্যকে বিস্তার দান করেছেন। তবুও 'পুষ্পমালা'র শ্রেষ্ঠত্ব এ কাব্যে অনুপস্থিত। ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে দুঃস্থ দুর্গত মানুষের প্রতি অনুকম্পার মিশ্রণই কবিতাগুলির পরিণাম।

কাব্যটির কোথাও কোথাও মধুসূদন (প্রভাতের ফুল : রসাল ও স্বর্ণ-লতিকা) ও হেমচন্দ্রের (ঐ : লজ্জাবতী) নীতিগর্ভ কবিতার প্রভাব পড়েছে।

'পুষ্পমালা'র মত 'পুষ্পাঞ্জলি'তেও নানা ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হেমচন্দ্রের 'খণ্ড কবিতাবলী' ও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী'তে যে ধরণের ছন্দোবন্ধ ও স্তবকবন্ধ লক্ষ্য করা যায়, এই কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা অনেকটা সেই ধরণের ছন্দোবন্ধ ও স্তবকবন্ধে গঠিত হয়েছে। কয়েকটি স্তবকবন্ধের মাত্রা-পরিচয় দিচ্ছি,—

এক ॥ ১০	দুই ॥ ৮+৬	তিন ॥ ৮+৬
১০	১০	৮+৮

১। শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিত পৃ: ১৪০।

এক ॥ ৮+৮	দুই ॥ ৮+৮	তিন ॥ ৮+৬
১০	১০	৮+৬
৮+৮	১০ (এ মোর কামনা)	৮+৬ (অশ্রুজল)
১০ (অনুতাপ)		

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছন্দোবন্ধে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে।

মধ্যে মধ্যে লৌকিক শব্দের ব্যবহার কাব্যচিন্তার মহিমা বিনষ্ট করেছে। কুঁদা, চুলে চুলে, টিপিয়া পিষিয়া, ঝাড়ে বংশে, হাবি, ঝিঁকে মার, কবাটী ইত্যাদি তার প্রমাণ। সাধু ও লৌকিক শব্দের সুসঙ্গত মিশ্রণ কবির করায়ত্ত হয়নি, যেমন হয়নি বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীতে।

সপ্তম অধ্যায়

পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ: ছায়াময়ী পরিণয়

॥ ১ ॥

শিবনাথের শেষ বড় কাব্য 'ছায়াময়ী পরিণয়' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে (ভূমিকার তারিখ ২৪.৯.১৮৮৯)। গ্রন্থটি রচনার একটি ইতিহাস আছে। 'ডায়েরিতে দেখিতেছি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নির্জন বাসের জন্য ১৮৮৭ সালে কিছুদিন আলিপুরের বাগানে রামব্রহ্ম সান্যালের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। এখানে নির্জনতা শান্তি পাইয়াই তাঁর কবিত্বশক্তি সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি এই স্থানেই 'ছায়াময়ীর পরিণয়' নামক কবিতাগ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন।'[১] ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিবনাথ ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ডে বাসকালেও শিবনাথ যে এই বইখানি লিখছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'ইংলণ্ডের ডায়েরি'তে— ছায়াময়ী পরিণয় এর যতটুকু লেখা হইয়াছিল, তাহা কপি করিয়া ফেলিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম যে, জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিবার মধ্যে ছায়াময়ী পরিণয় ও নবেলখানি শেষ করিতে পারিব; কিন্তু গত দুই দিন লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইনস্পিরেশন আসে না। ইন্‌স্পিরেশন না আসিলে লিখিব কি? ভাবই ত লেখনীর প্রেরণা। ভাবের উত্তেজনা হৃদয়ে না হইলে, লেখনী সরস দ্রব্য প্রসব করিতে পারে না।'[২] ডায়েরির উক্ত অংশের তারিখ ১৫ই নভেম্বর ১৮৮৮—তিনি তখন কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের মুখে।

আধ্যাত্মিক রূপক সমন্বিত এই কাব্যের নামপত্রে নিউম্যান থেকে উদ্ধৃতি আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কাব্যটি নিউম্যানের প্রভাব-সর্বস্ব। নিউম্যানের অধ্যাত্মচিন্তা কাব্যটিতে প্রভাব বিস্তার করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকায় শিবনাথ লিখেছেন, 'একখানি ইংরেজি রূপক-কাব্য' পাঠে তাঁর মনে এইরূপ গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা জেগেছিল। এই ইংরেজি রূপক কাব্যটি জন বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্‌ প্রগ্রেস' বলে অনুমান করি। তৎকালে প্রচারিত প্রায় সকল ইংরেজি আধ্যাত্মিক গ্রন্থসমূহের সঙ্গে

১। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২১৮।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরি, পৃঃ ২০৪-৫।

শিবনাথের পরিচয় ছিল। 'প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' হইতে জন বানিয়ান-এর জীবনচরিত পাঠ করিলাম।···দুপুরবেলা ও বৈকালে জন বানিয়ানের জীবনচরিত পড়িয়াছি।'[১] ইংলণ্ড বাসের পূর্বেও তিনি এই গ্রন্থটি পড়েছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।

॥ ২ ॥

'ছায়াময়ী পরিণয়' আত্মনিবেদন, বিস্মৃতি, বিচ্ছেদ, প্রস্থান, তীর্থযাত্রা, প্রলোভন ও পরিণয়—এই সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।[২] একটি সরল সুখপাঠ্য কাহিনী-কাব্যের অন্তরালবর্তী রূপকটি সহজেই বোঝা যায়। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনকে রূপকের সাহায্যে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা হয়েছে। 'এক একটি জীবনের যখন শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বের স্বামী তাঁহার স্বরূপ মাধুর্যে চিত্তকে আকৃষ্ট করেন; আত্মীয়স্বজনের মায়া-মমতা ভুলিয়া যায়।···অবশেষে যখন প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে তাহার মিলন হয়, তখনই আপনার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ধন্য মনে করে।'[৩] এই সাধনার জন্য ব্যাকুলতা ও কণ্টকিত পথ অতিক্রমের অন্তে মানব হিতৈষণাতে মানবাত্মার চরম সার্থকতা আসে। পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তাঁর পরামর্শে ছায়াময়ী পুনরায় পৃথিবীতে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করতে ফিরে এসেছে। Philanthropy-তে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

॥ ৩ ॥

'ছায়াময়ী পরিণয়' একটি রূপক কাব্য। রূপকটুকুর 'বাহিরে যে গল্পটী পাওয়া যায়, রূপক ভেদ করিতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারাও পড়িয়াও সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।'[৪] গল্পটি পাঠকের পক্ষে অতিরিক্ত প্রাপ্যস্বরূপ। রূপকটুকুতে সুফী অথবা বৈষ্ণব রূপকচিন্তার মিল লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য

১। তদেব, পৃঃ ২৭, দিনলিপির তারিখ, ৩রা মে ১৮৮৮।

২। দান্তের 'দিভিনা কোম্মোদিয়া'র অনুসরণে লিখিত হেমচন্দ্রের 'ছায়াময়ী'ও (১৮৮০) সাতটি পল্লবে বিভক্ত।

৩। অমৃতলাল গুপ্ত, কাব্যে লোকশিক্ষা, ভারতমহিলা, ফাল্গুন ১৩১৪।

৪। 'সাহিত্য বাজার', নব্যভারত ১২৯৭, পৃঃ ৫৭৫।

মানবহিতৈষণার শিক্ষা বৈষ্ণব সাহিত্যের শিক্ষা নয়, একথাও মনে রাখতে হবে। উনিশ শতকের সংস্কারের যুগে কাব্যটি লিখিত। মানবহিতৈষণা এই যুগের আদর্শ ছিল। সেদিক থেকে কাব্যটিতে যুগাদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। কবি এর আগেও ছোট ছোট কবিতাতে রূপক ব্যবহার করেছেন, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এই প্রথম দীর্ঘকাব্যে রূপকের ব্যবহার করেছেন। রূপক ব্যবহার করতে গিয়ে কবি জীবাত্মাকে নারী করে এঁকেছেন। কারণ, If thou soul is to go on into higher spiritual blesssedness, it must become a *woman* ; yes however manly thou be among men'—Newman. আমাদের বৈষ্ণব কাব্যেও তাই শ্রীমতী রাধার চিত্তে এতো আর্তি আরোপিত হয়েছে।

'ছায়াময়ী পরিণয়ে' বানিয়ানের প্রভাবের কথা আগেই উল্লেখ করেছি ; ছায়াময়ী শঠতা, অহঙ্কার, লালসা, ভীতি প্রভৃতিকে অতিক্রম করে অন্ট-সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েছে। বানিয়ানের 'রূপকের নায়কও Christian মুক্তিলাভের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিশ্বাস (Faithful), আশ্বাস (Hopeful), জ্ঞান (Knowledge) সতর্কতা (Watchful) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া দিব্যধামে (Celestial city) প্রবেশ করে।'[১] বানিয়ানের 'মুক্তি-স্বর্গকামী মানবাত্মা' যেমন নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বহুবিধ প্রলোভন এবং বাধাবিঘ্নাদি অতিক্রম করে বিশ্বাস, বিবেকবুদ্ধি ও নিষ্ঠার সাহায্যে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়েছে, ছায়াময়ীও ঐ সকল পর্যায় অতিক্রম করে পরমপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে। তবে, বানিয়ানের কলাকৌশল ছায়াময়ীতে অনুপস্থিত থাকায় এটি একটি দুর্বল অনুকরণে পর্যবসিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্যের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। 'ছায়াময়ী পরিণয়' ও 'স্বপ্নপ্রয়াণ'—উভয় কাব্যের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। কিন্তু 'স্বপ্নপ্রয়াণে' স্পেন্সারের Faerie Queene-এর যে সৌন্দর্যসৃষ্টির সিদ্ধি আছে, শিবনাথে সে সিদ্ধি অর্জিত হয়

১। প্রিয়নাথ সেন, প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৯৩৪ সংস্করণ) কাব্যের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত, পৃ: ১৬২।

নি। সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিবনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে বহুদূরে সরে গেছেন। এর প্রধান কারণ, ছায়াময়ীর ছায়া শিবনাথের ব্যক্তিগত সাধনার ছায়া। ফলে আধ্যাত্মিকতায় যতই স্বাভাবিকতা থাক, কাব্যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা এসে গেছে। কাব্য-হিসাবে 'ছায়াময়ী-পরিণয়' যে তাঁর অন্য সকল কাব্যগ্রন্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। শিবনাথের কবিপ্রতিভা এখানে নিঃশেষিতপ্রায়।

'ছায়াময়ী পরিণয়ের' কিছু প্রশংসা করা যায় ছন্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে। স্বরবৃত্ত ছন্দ এই দীর্ঘরূপক কাব্যটিতে বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। শিবনাথের পূর্বে ঈশ্বরগুপ্ত ও হেমচন্দ্র এই ছন্দের কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শিবনাথই প্রথম দীর্ঘকাব্যে এই ছন্দের প্রয়োগ করলেন।

'ছায়াময়ী পরিণয়ে' স্বরবৃত্তের ব্যাপকতম প্রয়োগ ঘটেছে। দ্বিতীয় (আংশিক), তৃতীয়, ষষ্ঠ (আংশিক), সপ্তম (আংশিক) পরিচ্ছেদ বাদে অন্যত্র কাহিনী বর্ণনায় কবি যে ছড়ার ছন্দটি ব্যবহার করেছেন, তা সত্যিই অভিনব। এই ধরণের তত্ত্বপ্রধান রূপক কাব্যে গভীর ও গম্ভীর ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ছড়ার ছন্দের প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন কোন কোন কবিতায়, বিশেষ করে 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে গুরুগম্ভীর বিষয়কে উপস্থাপিত করতে গিয়ে যে ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তা শিবনাথের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য এই ছন্দে শিবনাথ পূর্ণ অধিকার যে অর্জন করতে পারেন নি, তার অজস্র প্রমাণ কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে শব্দব্যবহারে ত্রুটির ফলে পর্বের মাত্রা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে নি। ফলতঃ ছন্দপতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যেমন,

বাপ সোহাগী ছায়াময়ী ভাবনা কি জানে
যা চায় তা পায় যতন করি দশ জনে আনে।

এখানে 'দশ' শব্দ দ্বিমাত্রিক ধরা অস্বাভাবিক, কিন্তু তা না ধরলে একমাত্রার অভাব ঘটে। অথবা,

আশা ছিল সন্তানের কাজ তাঁর দ্বারা হবে,
পাবেন আশ্রয়, সময় অসময় সে জন দেখিবে।

—এখানে চার মাত্রার পর্বভাগ করা মুস্কিল। বিশেষতঃ শব্দকে অখণ্ড রেখে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সুস্পষ্ট যতিপাতের অভাব, পর্বের মধ্যে অখণ্ড শব্দ-ব্যবহারে অক্ষমতা ও গদ্যাত্মক ভাষা স্বরবৃত্ত ছন্দের দুরগতি

সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এখানে অনেকটা কবিওয়ালাদের মত স্বরবৃত্ত ছন্দকে ব্যবহার করেছেন, স্খলন-পতন, ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকেন নি।

চলিত গদ্যভাষার কয়েকটি নমুনা আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি :—

একবার যদি ছুটে পালাই, কি ফাঁদ পাতলো বোকা মেয়ে তাতো দেখলো না, শ্রমের শিশির ছায়ার মুখে কি সুন্দর দেখায়, হনু যেমন পালে শিশু বুকের উপরে, খেয়ে উদম ধর্মের ষাঁড় সম, কি বলব কি সমাজ কেমন, স্পঞ্জের মত মনের ভাবটা যায় যেন শুষি, এক এক স্থানে এক এক রকম শোভা ধরেছে, পেট গরমে মনের বিকার, তিনটি চড়ে সোজা করে দিতাম কোনকালে, নাক কাটিয়ে দে তার প্রতিফল, প্রায় প্রতিদিন নৌকাতে বাচ্ বেড়াতাম খেলে ইত্যাদি।

লৌকিক শব্দের ব্যবহারও প্রচুর :

ভা. হেদায়, মা-খেকো, রেতে, বললে, ফাঁপরে, বললাম, কেনে, নাত, পাকাদাড়ি, ফিকির, পোঁচে, সন্ধ, তালাস, অতেব, চোক্, চেলের ভাত, লেঠা, গাঁটরিটি, লালচ্, চারিভিতে, হদ্দ, ওজর, দোনমনা, শুঁটকো, রীত, ভেগে, ফুঁ, ছুঁক্, জেঠা, নিকেষ, ধুপধাপ্, কোয়াসা, যোগেযাগে, তাদিগে, হাঁউ মাঁউ কাঁউ, কসে, ওমা, বোঁচা, দম ফেটে যায় প্রভৃতি।

লৌকিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিবনাথ বিহারীলাল চক্রবর্তীর সমগোত্রীয়। শিবনাথের প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই লৌকিক শব্দের অল্পবিস্তর ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করেছি যে, দীর্ঘকাব্যগুলিতে—অর্থাৎ নির্বাসিতের বিলাপ, হিমাদ্রি কুসুম ও ছায়াময়ী পরিণয় কাব্যত্রয়ে—লৌকিক শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটা কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কাব্য যত দীর্ঘ হয়েছে, শিবনাথের ভাবও তত বাঁধনহারা হয়ে পড়েছে। ভাবের এই বহমানতার সূত্রে শব্দব্যবহারের সংযম ও যত্নের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, ভাবের স্রোতে বহু অবাঞ্ছনীয় লৌকিক শব্দও কাব্যে এসে স্থান পেয়েছে ; কাব্য-রচনায় শিল্পের চেয়ে ভাবের প্রাধান্য স্বীকৃতি পেয়েছে।

কাব্যটিতে প্রাচীন কাব্যের কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায় :—'সব সঁপে হই তব দাসী', 'হরিণ জিনি নয়ন দুটি', 'এই লও তৃণ কর দাঁতে' ইত্যাকার।

বিদেশী শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করার মত :—পরদা, সোয়ার, স্পঞ্জ, গ্রেপ্তার, সরবৎ, কারখানা ইত্যাদি।

কয়েকটি প্রবাদও কাব্যে স্থান পেয়েছে :—যে ভয়েতে পালাই এসে ধরে তাই, উদ্দেশ্যেতে খড়িপাতা, ওঝার ফুঁয়ে অহির মত গেল গুটায়ে, সুখে থাকিতে কিলায় ভূতে, পুঁটিমাছের পরাণ ইত্যাদি।

রূপককাব্যে এই প্রকারের গদ্যঘেঁষা ভাষা ও প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার কাব্যের আঙ্গিকের ও গাম্ভীর্যের হানি ঘটায়।

॥ ৪ ॥

এই সকল ত্রুটির কথা স্মরণ করেই শিবনাথ সম্ভবত: কাব্যগ্রন্থটিকে সংস্কার করে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত রূপটি প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ত্রুটিগুলির প্রতি যে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল, এমন অনুমানে বাধা নেই। ৯ই নভেম্বর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীকে শিবনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'ছায়াময়ী পরিণয়' বইখানি আজিও আরম্ভ করিতে পারি নাই, ত্বরায় করিব আশা করিতেছি। নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে ওসব কাজ হয় না, ইহা হাটের মধ্যে করিবার কাজ নয়।'[১] স্মরণ রাখতে হবে, চিঠিটি 'ছায়াময়ী পরিণয়' প্রকাশিত হবার প্রায় দেড় মাস পরে লিখিত।

এটিই শিবনাথের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ।

১। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত পত্রাবলী (অবন্তী দেবীর সৌজন্যে,), শারদীয় যুগান্তর ১৩৬১।

অষ্টম অধ্যায়

অন্যান্য কবিতা ও শিশু পাঠ্য কবিতা

॥ ১ ॥

পূর্বালোচিত কবিতা ও কাব্যগ্রন্থসমূহ ব্যতীত আরও অনেক কবিতা শিবনাথ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, যেগুলি কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতার আমরা আলোচনা করছি।

ক. এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে—
তত্ত্বকৌমুদী, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৮১০ শক।

খ. জানলাম না মা—	ঐ	১লা ভাদ্র ১৮১০ শক।
গ. তুমি গুরু আমি প'ড়ো—	ঐ	১লা আশ্বিন ১৮১০ শক।
ঘ. বিবাহ—	প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৭ সাল।	
ঙ. কাম ও প্রেম—	প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৮ সাল।	
চ. ভুলচুক দুষ্প্রবৃত্তি—	হেমলতা দেবীর 'শিবনাথ জীবনী' গ্রন্থে শিবনাথের শেষ কবিতা হিসাবে উদ্ধৃত।	
ছ. মুক্ত—	সন্দেশ, কার্তিক ১৩২৬ সাল।	

প্রথম কবিতাটি সম্পর্কে উপরিলিখিত সংখ্যার তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিলাত গমনের সময় জাহাজে তাঁহার সহযাত্রীদের সদ্ভাব ও যত্নে মোহিত হইয়া এই সঙ্গীতটি রচনা করেন।'[১] মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ কবি শাক্ত-কবিগণের অনুকরণে দ্বিতীয় কবিতাটি রচনা করেন। 'যদি বল কি গুণ আছে, বাঁধা রব যার কাছে, আপনার প্রেমে আপনি বাঁধা ও আমার মা চমৎকারা'—এটি বাৎসল্য প্রেমের কবিতা। পূর্বের দুটি কবিতার মত তৃতীয় কবিতাটিতেও ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিবাহ'[২] একটি আখ্যায়িকা

১। এই কবিতার প্রথম চরণটিকে শিরোভূষণ করে কবি ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শিবনাথ-পরিচয়-জ্ঞাপক যে কবিতাটি রচনা করেন, সেটি চাংড়িপোতায় যে স্থানে শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে একটি মর্মর প্রস্তরে খোদিত হয়ে স্থার যদুনাথ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল।

২। কবিতাটি রচনার তারিখ, ২০-৫-১৮৯৯। দ্রঃ অপ্রকাশিত কবিতাবলী।

কবিতা। বঙ্গদেশাগত আসামের চা বাগানে এক কুলি নবদম্পতি ইংরাজ মালিকের লুব্ধ দৃষ্টির শিকার হয়ে কিরূপে নির্মম পরিণতি বরণে বাধ্য হয়েছিল, কবিতাটিতে সেকথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। আসামের চা বাগানের কুলি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে সময়ের পত্র-পত্রিকা মুখর ছিল। শিবনাথ ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে 'নীল দর্পণ' রচনা করেছিলেন। শিবনাথও এই কবিতাটি একটি বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন।[১] কবিতাটির 'আরম্ভ সুন্দর, লেখক শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই।'

'কাম ও প্রেম' কবিতাটিতে কাম এবং প্রেমের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিপাদ্য—কাম স্থূল বস্তু ও 'প্রেম ভগবান'। ডায়েরিতে উদ্ধৃত 'ভুলচুক দুষ্প্রবৃত্তি' নামক কবিতাটিতে পূর্বকৃত কর্মসমূহ বিস্মৃত হয়ে কবি ঈশ্বরের কাছে 'নব প্রেমে' মগ্ন হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন। জীবনের উপান্তে কবির প্রার্থনা :—

অবশিষ্ট দিনটুকু তোমার চরণে,
দেও দেও আপনা ধরিতে ;
করিতে যা বাকি আছে, আনন্দিত মনে—
দেও দেও সেটুকু করিতে।[২]

শিবনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে 'মুক্ত' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয় (রচনা ১৯০৪, দ্রঃ অপ্রকাশিত রচনাবলী) 'সন্দেশ' পত্রিকায়। কবিতাটিতে ঈশ্বর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কবির ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতায় নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে।

॥ ২ ॥

॥ শিশু পাঠ্য কবিতা ॥

পরিশেষে আমরা শিশুপাঠ্য পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত শিবনাথের কবিতাগুলি আলোচনা করছি। অধ্যাত্মসর্বস্ব চিন্তার একমুখীনতা যখন

১। দ্রষ্টব্য, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ৭০।

২। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২৯১—৯২। কবিতাটিকে হেমলতা দেবী শিবনাথের সর্বশেষ কবিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রচনার তারিখ ২৩-৩-১৯১৩।

কবির কবিত্বশক্তিকে 'ঘাঁতায় পিষছিল', তখনও তাঁর কবিমন যে কতখানি সরস ছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই শিশুপাঠ্য কবিতাগুলি।

শিবনাথের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলি প্রধানতঃ 'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাদ্বয় থেকে কয়েকটি কবিতা সংকলিত করে আমরা শিবনাথের কবিজীবনে এগুলির স্থান ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

একমাত্র 'ভরত বিলাপ'[১] কবিতাটি ব্যতীত অন্য কোন কবিতা পৌরাণিক আখ্যানসম্বলিত রচনা নয়। 'ভরত বিলাপ' সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদমূলক। বিষয়, মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর দশরথের মৃত্যু ও রামের বনগমনের সংবাদ শ্রবণে ভরতের বিলাপ। কবিতাটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে 'উদয় ও অস্ত'[২] উল্লেখযোগ্য। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে প্রকৃতির রূপভেদ সুনিপুণভাবে কবিতাটিতে চিত্রিত হয়েছে।

শিবনাথের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলির প্রাণ তার হাস্যরসে। এই হাস্যরস শিশু এবং পশু—উভয়কেই আশ্রয় করে পরিবেষিত হয়েছে। 'আবদারে ছেলে'কে[৩] যখন কোন কিছুতেই ভোলানো মায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখন কাকাতুয়া পাখী দেখে শিশু কান্না থামিয়েছে। শিশুর সঙ্গে প্রকৃতির জীবের স্বভাবে যে একটা সারূপ্য আছে, কবি যেন সে কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। শিবনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ নাতি বিজলীবিহারীকে একখানি ছবির বই উপহার দিয়ে তার প্রথম পাতায় যে কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন, তার নাম 'দাদামশায়ের সাধের নাতি'।[৪] এই প্রকারের বহু কবিতা লিখে দিয়ে শিবনাথ শিশুদের মনোরঞ্জন করতেন। বিশেষতঃ, তিনি যখন ছোটদের চিঠিপত্র লিখতেন, তার মধ্যে শিশুচিত্ত-রঞ্জক এই প্রকারের বহু কবিতা লিখে দিতেন। (আমরা এই প্রকারের একটি কবিতা অপ্রকাশিত রচনাবলী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি)।

১। সখা, মে ১৮৮৭।
২। মুকুল, চৈত্র ১৩০২।
৩। সখা, জানুয়ারি ১৮৮৬।
৪। মুকুল, বৈশাখ ১৩০৭।

'শ্যামচাঁদের পাঁচদশা'[১] নামক কবিতাটির চেয়ে এর সঙ্গে মুদ্রিত চিত্রগুলি বুঝিবা বেশি আকর্ষণীয়। তামাক সেবনের ফলে শ্যামচাঁদের নশ্বর শরীরের 'চুরুটেতে গড়া' অশরীরী-রূপান্তর চিত্র সহযোগে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পশুবর্ণনামূলক কৌতুক-রসপূর্ণ কবিতাগুলিতে বিড়ালই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। 'পেটুক পুষি'[২] কবিতাটিতে খোকার কাছ থেকে বিড়ালের ভুলিয়ে খাওয়ার কাণ্ড, 'রূপী বেড়াল ও ভেলো কুকুর'[৩] কবিতায় লোভী বেড়ালের শাস্তি ও সেই সঙ্গে ভেলোর মুখে কবির শিক্ষা—'খাইতে না পাই ধর্মে থাকি ইহাই জেনো সার', 'মোদের পুষি'[৪] কবিতায় শিকারী পুষির কীটদংশনে দারুণ অস্থিরতা যথার্থই উপভোগ্য। 'চোরের উপর বাটপাড়ি'[৫] কবিতাতে কেলো ও ভেলো নামক দুই কুকুরের কলহের অবসরে তাদের সংগৃহীত মাংসখণ্ডের পক্ষীকর্তৃক অপহরণের কবিতা শিশুদের নিশ্চয় ভাল লেগেছে। এখানে সবচেয়ে চমৎকার চুরি করার সমর্থনে পাখীর সাফাইটি— 'চুরির ধনটা তোমরা খেতে, না হয় আমিই খাই'। ঘোড়া নিয়ে দুটি কবিতা 'রামকান্তের ঘোড়া'[৬] ও 'কাল ঘোড়া'[৭]। অশ্বারোহণের আনন্দে রামকান্ত যখন আহ্লাদে গলে পড়ছিল, তখন হঠাৎ পিছন দিক থেকে কেউ তার কান পাকড়ে ধরাতে রামকান্তের দশা যে কি হয়েছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি আপাতগাম্ভীর্যের সঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন,

'হে শিশু এরূপ ঘোড়া তুমি যদি চাও, / তবে কাণ মলে মলে কাণটা পাকাও।'—শিক্ষক মহাশয়ের এমন আদরের অভিজ্ঞতা বুঝি অনেকেরই আছে বলে কবিতাটি আরও আবেদনময় হয়ে উঠেছে। অপর দিকে, এক বন্যঘোড়া দুটি ইংরেজ শিশুর কিভাবে আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছিল, তার বর্ণনা আছে 'কাল ঘোড়া' কবিতায়।

১। সখা, সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।
২। সখা, জানুয়ারি ১৮৮৭।
৩। মুকুল, মাঘ ১৩০২।
৪। ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।
৫। ঐ, শ্রাবণ ১৩০৩।
৬। সখা, মে ১৮৮৬।
৭। মুকুল, অগ্রহায়ণ ১৩০২।

শিবনাথের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলিতে তাঁর সহজ-সরল প্রাণের ও কবিত্বশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছিল বলেই অনুমান করি। অযথা ঈশ্বর-প্রসঙ্গের উল্লেখ ও অধ্যাত্মচিন্তার তত্ত্বকথা কবিতাগুলির ভার-স্বরূপ হয়ে ওঠে নি। 'মুকুল' পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে শিবনাথের শিশুপাঠ্য রচনার আরও কিছু পরিচয় দান করেছি।

নবম অধ্যায়

শিবনাথ-রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত

॥ ১ ॥

পূর্বালোচিত কবিতাগুলি ব্যতীত শিবনাথ-রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিও সবিশেষ আলোচনার যোগ্য। কবিতা হিসাবে এগুলি কতখানি সফল হয়েছে, সেকথা বিতর্কের বিষয়। অন্যান্য সঙ্গীত যেমন বাণীপ্রধান হতে পারে, তেমনি হতে পারে সুরপ্রধান। সুরপ্রধান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাণী আধার-মাত্র, সুর হচ্ছে আধেয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য থাকলেও বাণী বা ভাবের মূল্য বেশি। সেকারণে আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ভাবমূল্যের নিরিখেই সেগুলির কাব্যমূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

জীবনে যখন অধ্যাত্মক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটল, তখন শিবনাথের কাব্যপ্রতিভা ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। ফলে শেষ বয়স পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সবিশেষ অনুভূত হয়, তা আমরা আলোচনা করেছি। কাজেই শিবনাথ-রচিত আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি তাঁর পরিবর্তিত চিত্তলোকের ফসলমাত্র। সেই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সঙ্গীত সঙ্কলনটির নবম সংস্করণে[১] শিবনাথের মোট তিরাশিটি গান আছে। দ্বাদশ সংস্করণে[২] গৃহীত সঙ্গীতের সংখ্যা মোট তেতাল্লিশটি। তন্মধ্যে নবম সংস্করণের তেত্রিশটি গান দ্বাদশ সংস্করণে গৃহীত হয়েছে। শিবনাথ-রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের সংখ্যা সম্ভবতঃ এর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ সংকলিত হয় নি এমন গানেরও সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি।

॥ ২ ॥

গানগুলি রচনার উপলক্ষ্য বিভিন্ন এবং বিচিত্র। আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের সঙ্গে শিবনাথের আবাল্য পরিচয় ছিল। 'দিগম্বরমূর্তি বালক' শিবনাথ

১। শিবনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ, প্রকাশকাল ৮৪ ব্রহ্মাব্দ (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ)।

২। প্রকাশকাল ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রপিতামহ রামজয়ের সঙ্গে 'দুর্গা দুর্গা বল ভাই, দুর্গা বই আর গতি নাই' বলে দেব-দেবীর স্তবপাঠ করে যে নৃত্য করতেন[১] তা তিনি 'আর এ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। শিবনাথের নাচে একদিনের জন্য তালভঙ্গ হয় নাই—নাচিয়াছেন আর বলিয়াছেন—

ঈশ্বর বাড়ান যারে কে তারে মারিতে পারে
বজ্রদেহী হয়ে সে যে নাচিয়া বেড়ায় রে,
তাঁহার নাচের বাদ্য জগৎ বাজায় রে।'[২]

কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গীত বা কীর্তন সম্পর্কে এখনও কোন স্পষ্ট আগ্রহ শিবনাথের দেখা দেয় নি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মাঘ তারিখে কেশবচন্দ্র সেনের উন্নতিশীল সমাজের উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের দিনেই শিবনাথ এই ধরণের সঙ্গীতের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। কীর্তন সম্পর্কে যে বিতৃষ্ণা শিবনাথের পূর্ব থেকে ছিল তা তাঁর মনকে বিমুখ করে রাখলেও, ঐ দিনের নগর-কীর্তনে শ্রুত গান,—

'তোরা আয়রে ভাই, এত দিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার।'

—শুনে তিনি মনে-প্রাণে উদ্দীপিত এবং ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশ্য কীর্তনের বাড়াবাড়ির দিকটা তাঁর বড়ই অপছন্দ ছিল।

ব্রহ্মসঙ্গীতের উপর ধীরে ধীরে আকর্ষণ বাড়তে লাগল। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভাবগর্ভ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতেন।[৩] শিবনাথও বহু ভাবদ্যোতক সঙ্গীত রচনা করতে লাগলেন। তাঁর এই শক্তিটি বিশেষ একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সমধিক প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দুর্গামোহন দাসের সাধ্বী পত্নী ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুতে শিবনাথ অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, 'এই সময়ে আমি উপাসনার অনুকূল অনেকগুলি

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৩৯।
২। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী পৃঃ ৫২।
৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১১৬।

শোকসূচক সঙ্গীত বাঁধিয়াছিলাম।' সেই শোকাবেগে রচিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে একটির অংশত: উল্লেখ করছি :—

'রজনী প্রভাত হল, জাগিল জীব সকল,
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল।' ইত্যাদি[১]

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শিবনাথ একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। ১৮০২ শক, ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ, ইংরেজি ২২এ জানুয়ারি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ শনিবার তারিখে '৪৫ নং বেনিয়াটোলা লেন হইতে নগর কীর্তন করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করা গেল।' এই নগর-কীর্তনটির প্রথম পঙ্‌ক্তি এই প্রকার—

চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শোন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।'

সম্ভবত: এটিই শিবনাথ-রচিত প্রথম আনুষ্ঠানিক কীর্তন সঙ্গীত। এর পর শিবনাথ বহু নগর-কীর্তন রচনা করেছিলেন। এগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থের[২] ১০৭২-৭৬, ১০৭৮, ১০৮০-৮৩ ইত্যাদি সংখ্যক গান।

অন্যবিধ আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত রচনাতেও শিবনাথ দক্ষ ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে উপদেশ ও আশীর্বাদমূলক একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করছি—

প্রভু মঙ্গল-শান্তি সুধাময় হে, ভব-সেতু মহা-মহিমাময় হে!
জয় বিঘ্নবিনাশন পাবন হে, জয় পূর্ণ পবিত্র কৃপাঘন হে!
জয় পুণ্য-নিধে গুণসাগর হে, আজি এ দুজনে করুণা
কর হে।' (৯০৮ সংখ্যক গান)।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য, শিবনাথ পারিবারিক উপাসনার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ঈশ্বরকে সপরিবারে স্তুতির পর বন্দনা-গীতি গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই প্রকারের একটি বন্দনা-গীতি তিনি তাঁর 'গৃহধর্ম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।—

আজি গো সকলে তব পদতলে,
পূজিতে সদলে এসেছি দয়াময়।'[৩]

১। ব্রহ্মসঙ্গীত (নবম সংস্করণ), পৃঃ ৪৫৮।
২। আমরা দ্বাদশ সংস্করণের পাঠ ও সংখ্যা গ্রহণ করেছি।
৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, গৃহধর্ম (১৩৬৩) পৃঃ ১০৯-১০।

১লা আগষ্ট ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই প্রকারের একটি বন্দনা-গীতি, 'তুমি ব্রহ্ম সনাতন বিশ্বপতি,/তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি।' ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাধনাশ্রমের ভাব নিয়ে গানটি রচিত।

॥ ৩ ॥

আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতগুলিতে যে প্রকার ঈশ্বরানুরক্তি প্রকাশিত হয়েছে, অন্যান্য সঙ্গীতগুলিতেও সেই ভাব প্রকাশিত। ঈশ্বর-সেবার সংকল্প, ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা, উৎসবের নিবেদন, কাতরভাবে সম্মিলিত নিবেদন ইত্যাদি বিষয়ক বহু গান ও স্তোত্র শিবনাথ রচনা করেছিলেন। ৫৪৫ সংখ্যক গানটিতে[১] কবি 'দেহমন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে' ঈশ্বরের চরণে সর্ব-সমর্পণের সংকল্প করেছেন। বৈষ্ণবীয় আত্মসমর্পণের সুর এই প্রকারের সঙ্গীতে ধ্বনিত হতে দেখি।

ঈশ্বরের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশিষ্ট চিন্তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বৈষ্ণবীয় ধ্যানধারণায় ঈশ্বর কান্ত-কান্তা দুইরূপে প্রকাশিত ; শাক্ত-সাধক-কবিরা শিবসত্তা স্বীকার করে নিয়েও জগজ্জননীকে আদি কারণ ও একমাত্র উপাস্যা বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত ঈশ্বরকে পিতারূপে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু শিবনাথের পরব্রহ্ম একাধারে মাতা-পিতা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ব্রহ্মচিন্তায় দ্বৈতভাব এসেছে। ৬৮ সংখ্যক গানে শিবনাথ ঈশ্বরকে ভজনা করেছেন মাতৃরূপে।—

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে!
আর কোন্ মা আছে এমন করে পালিতে জানে?

—গানটিতে একটি শাক্ত-সংগীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এতে ঈশ্বরের স্বরূপ, মহিমা ও করুণা প্রকাশিত হলেও ব্রাহ্মসাধকের স্বভাবোচিত পাপবোধ লক্ষণীয়।[২] আবার এর সঙ্গে বাংলার মাটির বৈষ্ণবীয় বিনয়টুকুও লক্ষ্য করে থাকি—'হায়, আমি কি করিলাম! এমন মায়ে না চিনিলাম,

১। গানটি পরে 'ছায়াময়ী পরিণয়' কাব্যগ্রন্থে বর্ধিতাকারে সংকলিত হয়েছে।

২। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে পাপবোধ ও অনুতাপের কথা প্রথম প্রচলিত করেন। এই বোধ খ্রীষ্টধর্মের ভাব থেকে আহৃত।

না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে!' ৭১৪ সংখ্যক (জুলাই ১৮৯২) এবং ৭১৮ সংখ্যক (আগস্ট ১৮৯২) গান দুটি পিতৃভাবে রচিত। ঈশ্বরের অদ্ভুত 'শকতি' পাপভয় দূর করে। কবিচিত্ত পাপানলে দগ্ধ; কবি কাতরভাবে 'দয়াল' ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করেছেন। যদিও কবি বলেছেন, 'ভজিয়ে অসারে, মজিয়ে সংসারে ডুবেছি পাথারে, উঠিতে না পারি'; তবুও একে পলায়নী মনোবৃত্তি বলা চলে না। কারণ ব্রাহ্মগণ কখনই সংসারকে ত্যাগ করেন নি; ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শই তাঁদের আদর্শ। তবুও শিবনাথ যে পার্থিব জীবন নিয়ে গ্লানিবোধ করেছেন, এর পিছনে তাঁর নিজের অসম্পূর্ণতাবোধই সক্রিয়। উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে বিদ্যাপতির 'আধ জনম হাম, নিঁদে গোঁয়ায়নু' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির ভাব-সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ, শিবনাথের 'ভরসা কেবল করুণা তোমারি' অংশটির সঙ্গে বিদ্যাপতির 'অতএব তোহে বিশোয়াসা' উক্তিটির সঙ্গতি লক্ষণীয়। এই সঙ্গতির কারণ বোধহয় এই যে, ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনার কোন প্রকারভেদ থাকে না, যদি তা কৃত্রিম না হয়। অকৃত্রিম ভক্তির মূল্যে বিদ্যাপতির প্রার্থনা যেখানে গিয়ে পৌঁছেচে, শিবনাথের প্রার্থনাও পৌঁছেচে সেখানেই।

শিবনাথ-রচিত স্তোত্রগুলির কোন কোনটি ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও সমাদৃত। স্তোত্রগুলি প্রধানতঃ সংস্কৃতে রচিত। আমরা দুটি প্রধান স্তোত্রের উল্লেখ করছি। প্রথমটি জুলাই ১৮৯২ ও অপরটি এপ্রিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।

নমো নমস্তে ভগবন্, দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা, পাতা, পরিত্রাতা, ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তি, পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।[১]

—এই ঈশ্বর এক—একমেবাদ্বিতীয়ং।

একোহি বিশ্বস্য ত্বমস্য গোপ্তা,
একো নরাণাং সুখমোক্ষদাতা।

—ইত্যাদি (১০৯৯ সংখ্যক) সংস্কৃতে রচিত হলেও গানগুলি তাদের

১। ১০৯৮ সংখ্যক গান। শিবনাথ তাঁর 'গৃহধর্ম' পুস্তকে (পৃ: ৯১০-১১) এই গানটি গেয়ে 'প্রণতিপাঠ-পূর্বক উপাসনা' সাঙ্গ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সহজ ভাবে ও সরল ভঙ্গিতে সাধক ও পাঠক উভয়ের চিত্তকেই আকর্ষণ করে।

॥ ৪ ॥

শিবনাথ-রচিত প্রত্যেকটি গান বিশিষ্ট তাল ও রাগিণীতে নিবদ্ধ। এ থেকে সঙ্গীত সম্পর্কে শিবনাথ কতখানি অধিকারী ছিলেন, আমরা তা জানতে পারি। অতি পরিচিত দশকুশী, লোফা, একতালা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ তালগুলির উল্লেখের সঙ্গে (ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে) খয়রা, তেওট ইত্যাদি তালের উল্লেখ দেখি। নগরকীর্তনগুলি প্রায় কীর্তন বা ভাঙা কীর্তনের সুরে (যথা, ৬৮ সংখ্যক 'আমি এক মুখে মায়ের গুণ' গানটি) গীত হত। গুজরাটী ভজনের সুরে একতালে নিবদ্ধ গানটি হচ্ছে—'পাপী তাপী নরে, আজি দুয়ারে, ডাকিছে কাতরে, শুনহে দয়াময়!' রাগ-রাগিণীর সঙ্গতি-বিচার প্রধানতঃ সাঙ্গীতিক কর্ম বলে আমরা এগুলির গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হলাম না।

॥ ৫ ॥

গানগুলির কাব্যমূল্য কতখানি তার বিচার সম্ভবতঃ আংশিক হবে। বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যমূল্য অবশ্যস্বীকৃত। কারণ বৈষ্ণব পদাবলীর আধ্যাত্মিক আবেদন ব্যতীত তার শব্দসম্পদ, ছন্দোবৈচিত্র্য, গঠনশৈলী, রসাবেদন ইত্যাদিরও মূল্য আছে। কিন্তু শিবনাথ রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি প্রধানতঃ ভাববহ। অবশ্য এইগুলির মধ্যে ছন্দোবৈচিত্র্য যে একেবারে নেই তা নয়। 'প্রভু-মঙ্গল-শান্তি সুধাময় হে' (৯০৮ সংখ্যক), 'জয় জয় বিভুহে, করুণা তব হে, অগণন্ মহিমা তোমার' (৫৪৫ সংখ্যক) ও 'তুমি ব্রহ্ম সনাতন বিশ্বপতি,/তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি' (২৩৯ সংখ্যক) গান তিনটি ভারতচন্দ্রের ধ্বনি ও ছন্দোবৈচিত্র্যকে মনে পড়িয়ে দেয়। ১০৯৯ সংখ্যক 'একোহি বিশ্বস্য' শীর্ষক স্তোত্রটিতে 'ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ' স্তোত্রটির ছন্দের প্রভাব আছে অনুমান করি। দীর্ঘ ত্রিপদীতে নিবদ্ধ গানগুলি যথাক্রমে, ১০৮২, ১০৮৩ (খ, গ), ১০৭৬ (ক), ১০৮০ (খ), ১০৭২ (ঘ), সংখ্যক।

॥ ৬ ॥

সবশেষে আমরা গানগুলির সাধন-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করছি। কারণ এই প্রসঙ্গে শিবনাথের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা, অনুতাপ, পাপবোধ, ব্যাকুলতা, আত্মসমর্পণ, আত্মপরীক্ষা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক স্তরগুলির প্রবর্তন করেন। শিবনাথ সেই পথের পথিক ছিলেন বলে তাঁর গানগুলিতে এই ভাবনিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোথাও শিবনাথ নিজের ঐশ্বরিক উপলব্ধিকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে অসার্থক ভক্ত বলে মনে করেছেন।

শিবনাথের গানে আত্মসমর্পণের ভাব প্রধান। আধ্যাত্মিকতা ও আত্মোৎসর্গ একটি অন্তরজাত ক্রিয়া। সুতরাং তা কণ্ঠনির্ভর নয়, পরন্তু হৃদয়-নির্ভর।

শিবনাথের গভীর পাপবোধের মধ্যে একটা Quest বা অন্বেষণের সুরও উৎসারিত হয়েছে। সেই Quest একক প্রচেষ্টার দ্বারা সম্ভব হবে না, যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন, এই প্রকারের চিন্তার প্রকাশও গানগুলিতে আছে। এ ভাবেই সঙ্গীতগুলি এককের সীমাবদ্ধতা থেকে সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। 'সেই শান্তিধামে, একা যায় না যাওয়া; (সবে মিলে চলরে) একা ডাকিলে দেখা হবে না। তাই প্রেমডোরে বাঁধ পরস্পরে।' গভীর উপলব্ধির সুরই হৃদয়ের উৎস থেকে সঞ্চারিত হয়ে ব্রহ্মসংগীতগুলিকে এক বিশিষ্ট স্থান দান করেছে।

দশম অধ্যায়

কাব্যকথা

শিবনাথ যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে যুগের মানুষ তাঁকে কবি শিবনাথ অপেক্ষা সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী হিসাবেই অধিকতর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। অথচ তাঁর একটি কবিমন ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবিতার প্রতি তাঁর মমত্বের অন্ত ছিল না। 'এক সময়ে আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম, প্রকৃতি ও মানুষকে কবির চক্ষে দেখিতাম। কালক্রমে বিবাদ-বিসম্বাদ, ছাড়াছাড়ি, ছুটাছুটি খাটুনি প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া আমার কবিত্ব আর স্ফূর্তি পাইবার সময় পাইল না। এখন সময় আসিয়াছে—যখন একান্তে ও প্রকৃতির বন্য নিকেতনে বসিয়া আবার কবিত্বের স্ফূর্তির দিকে মন দিতে হইবে।'[১] প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'লুপ্তপ্রায় কবিত্ব শক্তিকে বাড়াইতে হইবে'।[২] তবুও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন কাজে তিনি নিজেকে এমনভাবে নিযুক্ত করেছিলেন যে, কবিতাচর্চার দিকে ততখানি মনোযোগ দিতে পারেন নি। জগত ও জীবনকে নিছক কবির দৃষ্টিতে দেখবার মত অবসর তাঁর হয় নি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যথার্থই ক্ষোভ করেছেন, 'হায়, কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাঁতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব হইল। এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।'[৩] এ ক্ষোভ আমাদেরও। কিন্তু শিবনাথের ক্ষোভ ছিল না। 'লেখনি চালনা করিয়াও যদি অর্থোপার্জন করিতে হয় তাহা হইলেও সেই লেখার ভিতর দিয়া ধর্ম প্রচার করিব।'[৪] কাজেই কর্মময় যুগের আবর্তে পড়ে কবিত্বশক্তি যথেষ্ট স্ফূর্তি পেল না। তাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পূর্বে কবিজীবনের যে সম্ভাবনা ছিল, তার সম্যক স্ফূর্তির পরিপূর্ণ অবকাশ পায় নি। শিবনাথের জীবনই শিবনাথের কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁর

১। শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত ডায়েরি, এটি আমি ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্রের সৌজন্যে পেয়েছি। ডায়েরির এই অংশের তারিখ, ২৩. ৯. ১৯১১।

২। তদেব, তারিখ ৩০. ৯. ১৯১১।

৩। হেমলতা দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ৩৪৮।

৪। তদেব, পৃঃ ৩৪৮।

সামাজিক ও ধর্মজীবনের প্রতিদিনের আশা, প্রতিদিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবিই কবিতাগুলিতে ফুটে উঠেছে।

যুগকে শিবনাথ অস্বীকার করতে পারেন নি। সে কারণেই তাঁর সমসাময়িক কবি মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের প্রভাব তাঁর কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। তবুও মৌলিকতা তাঁর কম ছিল না। সুধী সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'শিবনাথ (ভট্টাচার্য) শাস্ত্রী ছিলেন দিগ্‌ভ্রষ্ট সাহিত্যিক। ইঁহার অন্তরবাসী কবি-মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মতো সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও ধর্মনেতা ও সমাজ সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ সাহিত্যধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন।'[১]

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যসমূহের দীপ্তি নিষ্প্রভ হয়ে আসে। শিবনাথের কাব্যেরও আর প্রসার ঘটে নি। কিন্তু উনিশ শতকের ভাবজীবনকে সমগ্র রূপে জানতে হলে শিবনাথের কাব্যসমূহের পরিচয় গ্রহণ করাও একান্ত আবশ্যক।

শিবনাথের গ্রন্থগুলির কাব্যমূল্য নির্ণয় করতে গেলে স্বভাবতঃই সমকালীন বাংলা কাব্যের ধাতু-প্রকৃতির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ-গুলির প্রকাশকাল হচ্ছে ১৮৬৮-১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের মধ্যে বাংলা কাব্যের আদর্শ হিসাবে কবি বিহারীলাল কর্তৃক সৌন্দর্যবাদের সূত্রপাত ঘটেছে এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের হাতে সৌন্দর্যবাদের সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠা ঘটতে চলেছে। সেই সৌন্দর্যবাদের মূল ভিত্তি ছিল প্রেম, প্রকৃতি, রোমান্টিক স্বপ্নপ্রবণতা, রহস্যধর্মিতা, অতীন্দ্রিয় চেতনাকৃতি ইত্যাদি। উক্ত কবিদের সাধনার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যবাদ, প্রকৃতিবাদ ও প্রেমবাদ বাংলা কাব্যের আদর্শ হিসাবে পাঠকদের কাছে স্বীকৃতিও লাভ করতে শুরু করেছে। এমনি এক কাব্য পরিবেশে শিবনাথ কাব্যচর্চা করতে গিয়ে যে দুটি বিষয়ের উপর জোর দিলেন, তা হচ্ছে, (এক) অধ্যাত্ম-চিন্তা ও, (দুই) কল্যাণ-মুখী সমাজ-চিন্তা ; এবং এই দ্বিবিধ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল একটা সাত্ত্বিক মনোভাব। স্বভাবতঃই শিবনাথের কাব্যগুলির ভাবাত্মার সঙ্গে সমকালীন

১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম সংস্করণ, ১৩৭০), পৃঃ ৩৯১।

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবিদের কাব্যপ্রকৃতির সামঞ্জস্য রইল না এবং পাঠক সাধারণের মনোগত অভীপ্সা, স্বাভাবিক প্রত্যাশা ও রসগত পিপাসা মেটাবার কোন আয়োজন তিনি করলেন না। সেদিক থেকে বিচার করলে শিবনাথের কাব্যরচনার সার্থকতায় যে অন্তরায় ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে ভক্তিমূলক রচনার কি কোন কাব্যমূল্য নেই? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এ জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি নয় এবং সেদিক থেকে তার বিচারের কোন সার্থকতা নেই। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে, কবির আধ্যাত্মিক আকুতি ও নীতিচেতনার পশ্চাতে কতখানি সৎ-আবেগ ও সত্য-অনুভূতি সক্রিয় আছে এবং কবির সমগ্র সত্তার সঙ্গে তার যোগই বা কতখানি রয়েছে। যদি দেখা যায়, ভক্তিমূলক কাব্য কবির সমগ্র সত্তার সঙ্গে যুক্ত, কিংবা তাঁর হৃদ্‌পদ্ম-সম্ভব, তাহলে তা যে কমবেশি পরিমাণে সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিবনাথের কাব্যগুলি বিচার করলে দেখা যায়, তাদের বিষয়বস্তু বা ভাবরূপ তৎকালীন কাব্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন না হলেও এবং পাঠকচিত্তের স্বতোস্ফূর্ত সমর্থন তার পিছনে না থাকলেও একটা সৎ-আবেগ ও সত্য-অনুভূতির উপর তাদের প্রতিষ্ঠা। কবি যে কথাই কাব্যে বলেছেন, তার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। একটা আনন্দ-সংবেদনাও তাদের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। এদিক থেকে বিচার করলে মিস্ রসেটির ভক্তিমূলক কাব্যগুলির (devotional poems) চেয়ে শিবনাথের কাব্যগুলির মূল্য কম নয়। প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিকুলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রিস্টিনা রসেটি তাঁর আধ্যাত্মিক আকুতি ও সাত্ত্বিক মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বার বার নিজেকে দমন করে রাখার চেষ্টা করেছেন এবং কতকটা রেখে ঢেকে সংযত ভঙ্গিতে, অচঞ্চল রীতিতে মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিবনাথ নিজেকে গোপন করার চেষ্টা কোথাও করেন নি। তাঁর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মূর্তিটি সরল ও অকপটভাবে কাব্যের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। কাব্যগুলির ভাবাত্মায় যতখানি পরিমাণে কবির হৃদ্-স্পন্দন অনুভব করা যায়, ততখানি পরিমাণে কবিতাগুলিও সার্থকতা অর্জন করেছে। মনে রাখতে হবে, সত্য শুধু 'আছে' বলে ক্ষান্ত থাকে, কিন্তু রসলোকে 'থাকাই' যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে ভাল লাগাও প্রয়োজন। চোখের সামনে যদি একদণ্ডী রজনীগন্ধা থাকে, তবে ধরে নিতে হবে সত্যও আছে। কিন্তু সেই একদণ্ডী

রজনীগন্ধাই যখন ছন্দে, রূপে ও গন্ধে দ্রষ্টার মনের সঙ্গে আনন্দ-বন্ধনে জড়িত হয়, তখনই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে; শিল্প-সাহিত্যের নন্দনলোকে তার স্থান হয়। এক কথায়, সত্যের আনন্দ-স্ফুরণেই সুন্দরের আবির্ভাব, এবং তাতেই তার কাব্যিক সার্থকতা। শিবনাথের কাব্যলোকে যে পরম সত্যের সন্ধান আমরা দেখি, তাঁর অস্তিত্বের জানান দিয়েই কবি ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি যথাসম্ভব নিজের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। সত্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তা যতখানি পরিমাণে কবির আনন্দ বেদনা আকর্ষণ করতে পেরেছে, ততখানি পরিমাণে তাদের সাহিত্যিক মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, আমরা পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, কবি তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে নিরবয়ব মূর্তিতে ও নিরলঙ্কারভাবে উপস্থাপিত করতে চাননি, তিনি তাদের যথাসম্ভব রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন। তাই ফুল, পাখীর উপমান ঘুরে ফিরে তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছে। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার মত বিমূর্তভাবকে উপমা-রূপকের আশ্রয়ে তিনি যতখানি পরিমাণে প্রমূর্ত করতে পেরেছেন, ততখানি পরিমাণেই তাদের মধ্যে রূপ-রসের সঞ্চার ঘটেছে। এ স্থলে স্মরণযোগ্য, সাহিত্যস্রষ্টার বাক্-নির্মিতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, নিরবয়বকে সাবয়ব করা, নিরাকার ভাবকে সাকার করে তোলা।

শিবনাথ শাস্ত্রীর কাব্যগুলির মত ভক্তিমূলক সাহিত্যের বিচার প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখার প্রয়োজন। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে সাহিত্যের স্বাদ, 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'; অর্থাৎ কবি-সাহিত্যিকের শুদ্ধ আবেগসঞ্জাত রসানুভূতিতে ব্রহ্মস্বাদের ব্যঞ্জনা থাকে। অন্য দিকে শিবনাথের মত কবি-সাধক যে ভগবদ্ভক্তির নিগূঢ় উপলব্ধি, আত্মসমাহিত সত্তার শান্তরসাশ্রিত অনুভূতি ও চিত্তধর্মের অকপট সারল্য প্রকাশ করেছেন, তা এসেছে তাঁর নিরন্তর ব্রহ্মবিহার থেকে। আন্তর জীবনের যে ব্রহ্মস্বাদ লাভের সাধনা তিনি করেছিলেন, তার শুদ্ধ আবেগ ও সত্যানুভূতি নিয়েই তিনি কাব্যচর্চা করেছেন। ফলে শুদ্ধ-সাহিত্যের সেবায় যে ব্রহ্মস্বাদ-লাভের সম্ভাবনা থাকে তা শিবনাথের কাব্যেও উপস্থিত। সর্বোত্তম উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাধক ও শিল্পীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, সত্যের সঙ্গে সুন্দর একাকার হয়ে যায়। তাই সাধক হয়েও শিবনাথ কবি, যেমন উপনিষদের ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা হয়েও কবি।

সুতরাং দেখা গেল, শিবনাথের কাব্যের ভাব-বস্তু সাহিত্যিক সার্থকতার দিক থেকে সীমায়িত সম্ভাবনা নিয়েই জন্মেছে, সৌন্দর্যপিয়াসী পাঠকমনের স্বাভাবিক সমর্থন আদায় করে নেওয়ার যোগ্যতাও তার কতকটা সীমাবদ্ধ; তবুও কবির হৃদয়ের আন্তরিকতা, সত্যানুভূতি ও সৎ-আবেগ তাঁকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছে, তাঁর রূপক-প্রবণতা ও পরিবেশ-সচেতনতাও বিমূর্ত কাব্যভাবকে সাকারত্ব দান করে কিছুটা রূপরসবিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর প্রকাশভঙ্গি যদি আরও মার্জিত হত, সাধু ও কথ্য শব্দ ব্যবহারে তিনি যদি বিচক্ষণতা প্রকাশ করতে পারতেন, ছন্দের পারিপাট্য-বিধানে তিনি যদি অধিকতর মনোযোগী হতেন এবং বাস্তব-রসাশ্রিত চিত্র-কল্প রচনায় তিনি যদি অধিকতর যত্নবান্ হতেন, তবে তাঁর কাব্যগত সিদ্ধি হত সমধিক।

পরিশেষে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যবাদের উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশের যুগে আবির্ভূত হলেও শিবনাথ সৌন্দর্যবাদের পরিপোষক ছিলেন না। যদি থাকতেন, তবে পশু-পাখী-ফুল নিয়ে লেখা কবিতাগুলি আরও সুন্দর হয়ে উঠত, 'উদয় ও অস্ত' এবং 'সৌন্দর্য' নামক কবিতাদ্বয়ও অধিকতর শিল্প-সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হত। তিনি প্রেম বলতে বুঝতেন, আমরা পূর্বে দেখেছি 'ভগবান', কামকে 'স্থূল বস্তু' ব্যতীত আর কিছু ভাবতে পারতেন না। অন্যদিকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপকরণ ফুলকে তিনি দেখেছেন 'ভক্তি'-রূপে, ভৃঙ্গকে দেখেছেন সাধকের 'চিত্ত'-রূপে। এ থেকে বোঝা যায়, সাধারণতঃ যথার্থ কবির প্রকৃতি-নিরীক্ষণের কোন অভীপ্সা বা মনোগত প্রেরণা শিবনাথের ছিল না। আসলে সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের মত। বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও নিশ্চয় বিশ্বাস করতেন[১], 'নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষা দাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের

১। বঙ্কিমচন্দ্রের অতি-প্রবল সমাজ সচেতনতা থেকেই এই মতের উদ্ভব। শিবনাথ শুধু সমাজ-সচেতন ছিলেন না, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সাধক। সুতরাং এই মতের প্রতি তাঁর অধিকতর সমর্থন থাকাই স্বাভাবিক।

চিত্ত শুদ্ধি বিধান করেন।'[১] তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টাগুলি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সে কারণেই শিবনাথের কাব্যের গুণাগুণ নির্ণয় করতে গিয়ে 'শিবনির্মাল্য' নামক শিবনাথের কাব্য-সংকলনের ভূমিকায় কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'কবি সত্য সত্য যাহা ভাবিতেন, যে সংকল্প বুকে বাঁধিয়া সংসারে সেবা করিতেন, সেই কথাগুলিই কবিতায় লিখিয়াছেন। তিনি বৃথা খেয়ালের কবি ছিলেন না, একটা সৌন্দর্যসৃষ্টির নামে যাহা খুসি তাহাই কথা সাজাইয়া লেখেন নাই। এই জন্যই তাঁহার কবিতায় কথার চটক নাই ; আছে ভাবের মাধুরী ও প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস।···কবি শিবনাথের মত প্রাণের খাঁটি আকাঙ্ক্ষার কথা অতি সহজ ভাষায়, বিনা আড়ম্বরে অন্য কোন কবি লেখেন নাই'।[২] এই উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ।

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, উত্তর রামচরিত সমালোচনা।

২। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শিবনির্মাল্য (১৯২৭), ভূমিকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঔপন্যাসিক শিবনাথ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম উপন্যাস ঃ মেজবউ

॥ ১ ॥

'মেজবউ' শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশের একটি ইতিহাস আছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শিবনাথ ভারতের পশ্চিমাংশে প্রচারের জন্য বহির্গত হন এবং পথিমধ্যে পরম সুহৃদ্ বাঁকিপুর-নিবাসী প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী অঘোরকামিনী দেবীর আতিথ্যে প্রায় পক্ষকাল অতিবাহিত করেন।[১] 'এই কালের মধ্যে একটা কাজ সারা গেল। ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস লিখিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে পূরণ করিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে 'মেজবউ' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।'[২] সুতরাং উপন্যাসটি একটি 'ফরমায়েসী রচনা'। এ সময়ে শিবনাথের আর্থিক দুর্গতি চরমে উঠেছিল। 'মেরী কার্পেণ্টার সিরিজ'-এর অন্তর্গত এই উপন্যাসটি শিবনাথ অর্থের অভাবের জন্য লিখেছিলেন।[৩] এই প্রকারের পুস্তক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে (২১শে ফেব্রুয়ারী) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

॥ ২ ॥

শিবনাথ ছিলেন যুগদ্রষ্টা। সত্যানুসন্ধান ব্রতে তিনি ছিলেন দীক্ষিত। সে কারণে তাঁর কবিতাবলীর মতই উপন্যাসগুলিতেও তৎকালীন যুগ এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনা উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

১। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা-মাতা।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৬৬-৬৭।

৩। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ২১০।

'আত্মচরিত' এবং *'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'*-এর লেখকের পক্ষে এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। পাঠক একটু অনুসন্ধিৎসু হলেই উপন্যাসটির মধ্যে সেই ঘটনাগুলির সন্ধান পেতে পারেন।

আমরা আত্মচরিতের সঙ্গে তুলনা করে উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদের সত্যমূলক ঘটনা বা উপকরণগুলি নির্দেশ করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'ফুলী' বিড়াল ও 'আত্মচরিতের' রূপী বিড়াল একই (দ্রঃ, আত্মচরিত, পৃঃ ৩৩)। 'কর্তারও ফুলীর প্রতি বিশেষ কৃপা। আহারের সময় সে পাতের নিকট না আসিলে তাঁহার ভাল লাগে না' (মেজবউ)। শিবনাথের পিতা হরানন্দের এমনতর মার্জার প্রীতির উল্লেখ করেছেন হেমলতা দেবী।[১] পঞ্চদশ পরিচ্ছেদেও এই রূপী বিড়ালের সাক্ষাৎ পাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মেজবউ প্রমদার চরিত্রে শিবনাথের প্রথম পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীর চরিত্রের পরোক্ষ প্রভাব আছে বলে অনুমান করি। 'আত্মচরিতের' পরিশিষ্টে[২] উল্লিখিত 'পরকে আপনার করা', 'গৃহকার্যে দক্ষতা', 'কাজের শৃঙ্খলা', 'হৃষ্টচিত্ততা' ইত্যাদি গুণগুলি উভয় চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরে ছাত্রাবস্থায় 'মেজবউ'-এর স্বামী প্রবোধচন্দ্রকে সংসারের ভার গ্রহণ করতে হয়। তাঁর এই অবস্থার সঙ্গে পিতৃতাড়িত শিবনাথের অবস্থার প্রায় রেখায় রেখায় মিল লক্ষ্য করি,—এমন কি বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রেও। 'এদিকে তাঁহার (প্রবোধচন্দ্রের) পরীক্ষা সম্মুখে, স্কলারশিপের দরুণ যে কয়েকটি টাকা পান, তাহাতে তাঁহার নিজের খরচই ভাল করিয়া চলে না' (—'মেজবউ', পৃঃ ৩৯)।[৩] 'আমার স্কলারশিপ মাত্র অবলম্বন, এদিকে আবার বি. এ. পরীক্ষার বৎসর উপস্থিত' (—'আত্মচরিত', পৃঃ ৯৯)।

নবম পরিচ্ছেদ : প্রমদা-প্রবোধচন্দ্রের প্রথম সন্তান হিসাবে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। 'হিন্দুকুলে কন্যা জন্মিলে গৃহস্থের মুখ মলিন হয়, কিন্তু

১। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ৪১-৪২।
২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৮০।
৩। আমরা উপন্যাসটির দ্বাবিংশ সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করছি।

প্রমদার পিতামাতার মুখ মলিন হইল না। প্রমদার প্রথমজাত সন্তানকে তাঁহারা পুত্রাধিক জ্ঞান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।' ব্যক্তিগত জীবনে শিবনাথ কন্যাদের পুত্রাপেক্ষা স্নেহ করতেন। 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের 'নবশোক' কবিতায় সে কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম কন্যা হেমলতা ভূমিষ্ঠ হলে শিবনাথ তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। এ সময়ে পিতাকে লিখিত একটি পত্রে শিবনাথের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে (পত্র রচনার তারিখ ১৭ই আষাঢ় ১২৭৫ সাল),—'শুনিলাম আমার একটী কন্যাসন্তান হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণীকে বলিবেন যেন তিনি তজ্জন্য দুঃখিত না হন। জগদীশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহাই শিরোধার্য। আমি পুত্র অপেক্ষা কন্যার অধিক গৌরব করিয়া থাকি।'[১]

দশম পরিচ্ছেদ : 'মেজবউ' উপন্যাসে খোদাই নামক যে ভৃত্য-চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে সেটি একান্তই বাস্তবচরিত্র। শিবনাথ লিখেছেন, '…খোদাইয়ের স্মৃতি আমার মনে পবিত্র প্রেমের উৎস স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে আমার 'মেজ বৌ' নামক উপন্যাসে অমর করিবার চেষ্টা করিয়াছি।'[২] ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়লে খোদাই তাঁকে মাতৃসমযত্নে সেবা করেছিল। অন্যত্রও তিনি এর উল্লেখ করেছেন।[৩]

একাদশ পরিচ্ছেদ : এই পরিচ্ছেদে 'প্রকাশ' চরিত্রটিতে বন্ধু প্রকাশচন্দ্র রায়কে পরিবর্তিত আকারে উপস্থাপিত করে বন্ধুকৃত্য করতে চেয়েছেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : প্রমদার কন্যা লীলাবতী জলে ডুবে মারা গেলে সকলে শোকার্ত হয়ে পড়েন। এই কাহিনীর সঙ্গে মুঙ্গের বাসকালে শিবনাথের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনীর মৃত্যুর ঘটনার সাদৃশ্য আছে। অবশ্য সরোজিনী বারান্দা থেকে পড়ে মারা যায়।[৪]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : প্রবোধচন্দ্র যক্ষারোগগ্রস্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শমত মুঙ্গেরে স্বাস্থ্যোদ্ধারে যান। শিবনাথও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মুঙ্গের গিয়েছিলেন।

১। হেমলতা দেবীর 'শিবনাথ জীবনী' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৯
২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৩৮-৪০।
৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, গৃহধর্ম, পৃঃ ৮০-৮১।
৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪০।

আমরা কয়েকটি স্থূল ঘটনা উল্লেখ করে উপন্যাসটি কতখানি বাস্তবানুগ তা দেখাবার চেষ্টা করলাম। তবে কাহিনীর প্রয়োজনে এবং শিল্পের খাতিরে উপন্যাসটির মধ্যে স্বভাবতঃই বাস্তব ঘটনাগুলি কতকটা পরিবর্তন লাভ করছে।

॥ ৩ ॥

'মেজবউ' উপন্যাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে কয় দশকের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা একান্তভাবে শিবনাথের আপন যুগ। সমাজ তখনও রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তি পায় নি। স্ত্রীশিক্ষা সে যুগের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির ছাড়পত্র পায় নি, যদিও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দেই (বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়ে) স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়ে গেছে। কিন্তু শিবনাথ ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাই উপন্যাসের নায়িকা প্রমদাও 'পড়াশুনা করিতে বড় ভালবাসেন। পিত্রালয়ে বিবাহের পূর্বেই তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন, বিবাহের পর ১০।১২ বৎসর প্রবোধচন্দ্রের সাহায্যে আরও উন্নতি করিয়াছেন।' এই উপন্যাসে আরও দেখতে পাই, অন্তঃপুরে মিশনরি নারী শিক্ষাদান করছেন এবং রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা বামা মিশনরি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত আছেন।

ইংরেজি শিক্ষা তখন যুবকদের নানাভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ দান করছিল। হিন্দু স্কুল তো ছিলই, পরন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালীর কাছে শিক্ষার অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছিল। উপন্যাসেও দেখি প্রবোধচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র উভয়েই উচ্চশিক্ষিত হয়ে নিজেদের সঙ্গতিসম্পন্ন করে তুলেছিলেন।

লেখক হরিতারণ নামে একটি যুবককে উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে এনেছেন। 'এই যুবক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।' ব্রাহ্মপ্রচারক শিবনাথের পক্ষে এমন একটি চরিত্র পরিকল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কারণ উপন্যাসের মধ্যে সাধুজনোচিত আদর্শ চরিত্র স্থাপন করে নীতিশিক্ষা দানে লেখকের উৎসাহের অন্ত ছিল না। এদিক থেকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের গোত্রভুক্ত ছিলেন। হরিতারণকে আশ্রয় করে শিবনাথ সে যুগের একটি বিশিষ্ট আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। আমরা বিধবাবিবাহের কথা বলছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ ইতিমধ্যে আইনসিদ্ধ হয়ে

গেছিল (২৬.৭.১৮৫৬)। প্রথম বিধবাবিবাহানুষ্ঠানে (৭.১২.৫৬) শিবনাথ উপস্থিত ছিলেন। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয় নি। প্রবোধচন্দ্রের ভগিনী বামা বিধবা হলে স্বামী-স্ত্রী মিলে অনুরক্ত হরিতারণের সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ করেছিলেন। এল. এ. পরীক্ষার্থী শিবনাথ স্বয়ং একটি বিধবাবিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা আমরা জানি। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই দায় গ্রহণে লেখক সক্ষম হয় নি। কারণ বিধবাবিবাহ তখনও সমাজে প্রচলিত হয় নি। (বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়েও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত বিষ খাইয়ে কুন্দনন্দিনীর দেহাবসান ঘটিয়েছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ভিন্নতর ছিল।) শিবনাথও যুগসন্ধিক্ষণের সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তাই 'কাশের লক্ষণ' দেখিয়ে বামার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। বাস্তবের মত উপন্যাসে বিধবাবিবাহ দেওয়া শিবনাথের পক্ষেও সহজ ব্যাপার ছিল না।

'মেজবউ' উপন্যাসের সঙ্গে সে যুগের সামাজিক গতি-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। সেটা ছিল যুগসন্ধির কাল। গ্রামে তখন চলেছে পুরনো যুগের রাজত্ব এবং সহর তখন নবযুগের স্পন্দনে স্পন্দিত। তাই উপন্যাসের কাহিনীর গতিও গ্রাম থেকে সহরের দিকে, পুরাতন জীর্ণ জীবন থেকে নবজীবনের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

॥ ৪ ॥

মেজবউ প্রমদা এই উপন্যাসের নায়িকা ও কেন্দ্র-চরিত্র। প্রমদা পল্লীগ্রামের একটি ধর্মনিষ্ঠ ও শান্ত অথচ বৃহৎ যৌথ পরিবারের বধূ। তা সত্ত্বেও পূর্ব-শিক্ষাজনিত স্বাতন্ত্র্যে তিনি সমুজ্জ্বল। এই 'উদারচিত্তা কর্মকুশলা জ্ঞানবতী বধূকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীগ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্থান ও পতন বর্ণিত হইয়াছে।'[১]

চাকুরীক্ষেত্রে স্বামী প্রবোধচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে কলকাতায় বাসা করলে প্রমদা সেখানে এলেন। তারপর একে একে কন্যা লীলাবতী, নবজাত পুত্রকে হারিয়ে শেষে নিজেও কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি রোগমুক্ত

১। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (১৩৫৬ সংস্করণ), পৃঃ ১২৯।

হওয়ার পূর্বেই স্বামী আক্রান্ত হলেন যক্ষায়। সব মিলিয়ে তাঁর জীবনে অমঙ্গলের শনিদৃষ্টি পড়েছে। কর্তা, কর্ত্রীঠাকুরাণী ও বামার মৃত্যু কাহিনীকে অত্যন্ত করুণ করে তুলেছে। মৃত্যুর বর্ণনাগুলি স্বাভাবিক। তাঁরা কাল পূর্ণ হয়েছে বলে বিদায় নিয়েছেন। প্রমদার জীবনের শোচনীয় পরিণাম দেখে পাঠকচিত্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল লক্ষণ যে ব্যক্তিগত ত্রুটি বা ভ্রান্তি তা চরিত্রটিতে অনুপস্থিত। তাঁর চরিত্রে এমন কোন রন্ধ্রপথ ছিল না, যার মধ্য দিয়ে শনি প্রবেশ করে তাঁর জীবনের এমন শোচনীয় পরিণতি ঘটাতে পারে। লেখক অবশ্য প্রমদার দুর্ভাগ্য বা তাঁর প্রতি অদৃষ্টের বিরূপতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিধাতার কি দূরবগাহ বিধান, কখনও অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেও এ জীবনে অসহ্য ক্লেশ যাতনা ভোগ করিতে দেখি। কিন্তু তখন তাঁহাদের ধর্মানুরাগের জ্যোতি ম্লান না হইয়া দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা ধারণ করে' (পৃঃ ৯৫)।

কাহিনীর দিক থেকে উপন্যাসটি নগণ্য। গঠনের দিক থেকেও অসম্পূর্ণ, শিথিলবদ্ধ। তা হলেও পরিণতির দিক থেকে যে ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ প্রথমতঃ, কাহিনীটি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, ট্র্যাজেডির মূল অন্তর্দ্বন্দ্ব, তা কোন চরিত্রকে কেন্দ্র করে ফুটে ওঠে নি। স্বাভাবিক কতকগুলি ঘটনা অন্তর্দ্বন্দ্বের আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে নি। তৃতীয়তঃ, চরিত্রগুলি বিকাশহীন টাইপ মাত্র।

উপন্যাসটি পারিবারিক। কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটিতে একটি ধর্মনিষ্ঠ আদর্শ পরিবার কিভাবে 'দূরবগাহ' ও অবিচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে, তারই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের আদিতে বধূবেশী প্রমদা শ্বশুর-শ্বশ্রূর শান্তির সংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে সেই কাহিনী তাঁর আপন পরিবারের সুখ-দুঃখকে আশ্রয় করেছে। একটি মাত্র পরিবারের উত্থান-পতন চিত্রিত হয়ে উপন্যাসটিকে পরিবার-ধর্মী করে তুলেছে।

॥ ৫ ॥

বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে উপন্যাসের জগৎ গড়ে ওঠে। 'মেজবউ' উপন্যাসের চরিত্রগুলি কল্পনার পূর্ণ দাক্ষিণ্য পায় নি বলে এটি একটি গতানুগতিক টাইপমাত্র হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণটির ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই দিয়েছি,—চরিত্রগুলি এক একটি চোখে দেখা চরিত্রের আদর্শে অঙ্কিত।

কিন্তু দৃষ্টি-চিত্রও সৃষ্টি-চিত্র হতে পারে, লেখকের যদি সৃজনশক্তি থাকে। যেমন, 'স্বর্ণলতা'র লেখকের তা ছিল। অবশ্য ফরমায়েসী রচনা কখনই সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, এটি লেখকের উপন্যাস রচনার প্রথম উদ্যোগ। এই ত্রুটি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে ভেবেই বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, রচনা লেখামাত্র প্রকাশ করতে নেই।

উপন্যাসের পুরুষ এবং নারী উভয় চরিত্র সমপ্রাধান্য পেলেও নারীচরিত্র অঙ্কনে বর্তমান লেখক অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের চির অসন্তুষ্ট দজ্জাল গৃহিনীকুলের স্থায়ী সদস্যা। শিক্ষিতা প্রমদার ঔদার্য তাঁর কাছে 'বড় মানুষের ঢঙ্' আখ্যা পেয়েছিল। তবুও তাঁর মধ্যে সম্ভবত: কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু পরিমাণে ছিল বলে প্রমদার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ভাগ্যে তুমি মানুষের মেয়ে ছিলে, ওদের হাতে পড়লে এতদিন আমার প্রাণটা যেত।' বড় বউ হরসুন্দরীর মুখরা ভাব আমাদের খারাপ লাগলেও তাঁর মধ্যে নারীসুলভ ঈর্ষাটুকু আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছে। প্রমদার ননন্দা বামা প্রমদার স্নেহপ্রার্থিনী এবং সেই স্নেহের বিনিময়ে অন্তরের প্রেমকে উপেক্ষা করে প্রমদার জন্য স্বার্থত্যাগ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অন্তরে তার প্রেম ছিল। তবুও সে বিবাহে রাজী হয় নি। এ ব্যাপারে তার বৈধব্যের সংস্কার বাধা হয়ে ওঠে নি। লেখক এখানে বামার প্রতি আরও একটু উদার হলে ভাল করতেন। শ্যামা ইত্যাদি চরিত্রগুলি উপন্যাসে কোন প্রাধান্য পায় নি। শুধুমাত্র পরিবারের অন্নভোগী হওয়ায় সম্ভবত: লেখকের দাক্ষিণ্য থেকে এরা বঞ্চিত।

পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে 'ভাল মানুষ' হচ্ছেন কর্তামশায়। প্রমদা উপন্যাসে কতখানি প্রয়োজনীয় তা বোঝাবার জন্যই পরিবারের কর্তা হিসাবে তাঁকে আঁকা হয়েছে। তাঁর অসুস্থতা ইত্যাদির বর্ণনা অনেকাংশে

বাহুল্য মনে হয়। প্রমদাকে তিনি কন্যাপেক্ষা স্নেহ করতেন এবং তাঁর উপরে ভরসা রাখতেন—'মা লক্ষ্মী, তুমিই আমার বাড়ীর মধ্যে মানুষের মত।' সংসারের ভার বধূর হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে স্বর্গবাসী হয়েছেন। এ ধরণের আর একটি চরিত্র প্রমদার পিতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; এই চরিত্রটিকে সংসারের কেন্দ্রস্থলে দেখে সংসারে আসক্তি বাড়ে বই কমে না। উপন্যাসে এঁর আবির্ভাব অপ্রয়োজনীয় হলেও, তিনি খুবই আকর্ষণীয়। বড় ছেলে হরিশ্চন্দ্র বৈচিত্র্যহীন।

প্রবোধচন্দ্র আদর্শবাদী যুবক, বিদ্বান ও অর্থবান। কর্তব্যজ্ঞানও তাঁর প্রবল ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরেশের কয়েদ হয়েছে শুনে তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন। পিতামাতার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভগ্নী বামার বৈধব্য তাঁকে বেদনা দিত বলে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে পুনরায় বিবাহ দানের চেষ্টা করেছিলেন। তা বলে, তিনি যে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, এমন মনে করা উচিত হবে না। তবে তিনি প্রগতিশীল দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রেমিক। পত্নীর সকল প্রকার সুখের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এই ধর্মপরায়ণ কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিটিও নিদারুণ মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক ক্লেশ ভোগ করে শেষে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। এমন একটি চরিত্র উগ্র আদর্শবাদের প্রভাবে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল। তবে লেখকের চিত্রণ-শক্তির গুণে তাও কতকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

পরেশের মত অপরিণত ও অপরিণামদর্শী যুবক বাঙালীর সংসারে প্রচুরলভ্য। কিন্তু তার অপরাধগুলির কোন পূর্বাপর কারণ দেখান হয় নি। সংসারে এমন চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। কিন্তু উপন্যাস জগতে এমন চরিত্রেরও কার্যকারণাত্মক পটভূমি রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকাশচন্দ্র একজন যথার্থ বন্ধু—প্রবোধের বিপদকালে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ সংস্কার প্রধানত: ব্রাহ্মধর্মানুরাগী ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের উদ্যোগেই ঘটেছিল। হরিতারণ নামে ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী যুবকটি এঁদেরই প্রতিনিধি। কিন্তু মানবিকগুণে ভূষিত ছিলেন বলে তাঁর অন্তরে মদনের আবির্ভাব ঘটেছিল। বামার প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। তাঁর প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয়েছে বামার মৃত্যুতে। বামার মৃত্যুতে 'হরিতারণ একেবারে শোকে উন্মত্তপ্রায় হয়ে

উঠলেন।' প্রেমচিত্রে হরিতারণ স্বাভাবিক; কিন্তু আদর্শবাদের উগ্রতা পাঠকের ভাল লাগে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একটা আদর্শ-প্রবণতা শিবনাথের সাহিত্যজীবনে বরাবরই লক্ষ্য করা গেছে।

শিবনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা প্রধান চরিত্রগুলি অঙ্কনে ততখানি স্ফূর্তিলাভ করেনি যতখানি অনুল্লেখ্য চরিত্রগুলি অঙ্কনে করেছে। 'উপকরণ সংগ্রহ' পর্যায়ে আমরা খোদাই চরিত্রের বাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছি। ভৃত্যটি সম্ভ্রমপূর্ণ, অনুগত ও বিশ্বাসী। প্রভুর সেবায় নিরলস ও নির্লোভ এই ভৃত্যটি সম্পর্কে প্রমদা যা বলেছেন, তা যথার্থ,— 'তুমি আমার বাপের অধিক কাজ করিলে।' এমন একটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিভূতি-ভূষণের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে,[১] 'বিশ্বস্ত লোকের জন্য কি কোন স্বর্গ আছে?' যদি থাকে আমাদের উপন্যাসের খোদাই-এর 'আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে।...এই-সব চোরাবাজারের দিনে জুয়াচুরির দিনে, বড্ড বেশি ক'রে' খোদাই-এর কথা আমাদের মনে পড়ে।

রঙ্গ-পরিহাসে শিবনাথের দক্ষতা সেকালে তাঁর বন্ধু ও প্রীতিভাজন মহলে প্রবাদের স্থান গ্রহণ করেছিল। 'মেজবউ' উপন্যাসের ননীগোপাল চরিত্র বর্ণনায় সেই রঙ্গপ্রিয়তা যথার্থই তুঙ্গস্পর্শ করেছে। লেখক দিগম্বর গোপালের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার কিয়দংশ উদ্ধার করছি :—

'গোপালের বয়ঃক্রম চারি বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূন, বর্ণটী শ্যামল, শরীরটী গোলগাল। তবে পেটটী কিঞ্চিৎ বড়। পেটের আর অপরাধ কি? গোপালের মুখটী সমস্ত দিনই চলিতেছে। বাঙ্গালীরা দিনে দুইবার খান, কিন্তু গোপালচন্দ্র কতবার খান তাহা কে বলিবে?'

তৃতীয় পরিচ্ছেদের পর গোপালকে আর আমরা দেখি না। শান্তির সংসারে বাৎসল্য রসের সঙ্গে এক ঝলক হাস্যরস পাঠকদের বিতরণ করে এই চরিত্রটি উপন্যাসের জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে লেখকের সৃষ্টি-শক্তির গুণে তার ক্ষণিক ছবিও পাঠকের মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। আরও একটি শিশু আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। সে বহুবিধ পুতুল-পরিবৃতা লীলাবতী। তার অকাল মৃত্যুকে এঁকে লেখক প্রমদার জীবনের দুঃখকে গভীর করে তুলেছেন এবং তাতে পাঠকের দৃষ্টি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে।

১। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক ('রূপোকাকা')।

লেখক উপন্যাসে আর কতকগুলি চরিত্রের অবতারণা করেছেন। উপন্যাসে এদের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এরা যৌথভাবে পুষ্পমালার সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে। একদল 'রঙ্গিনী'র কলকাতা দর্শনের মধ্যে শিবনাথের পরিহাস শক্তি আরও একবার পাঠক-কুলকে স্নিগ্ধ হাস্যরসে অভিষিক্ত করেছে। সংসারের দুঃখযন্ত্রনা তাদের প্রাণোচ্ছলতায় স্থান পায় নি। 'তাহারা শহরে নূতন পদার্পণ করিয়াছে, সুতরাং সহর দেখিবার উৎসাহেই সর্বদা ব্যস্ত; দ্বার দিয়া কোন দ্রব্য ডাকিয়া যাইবার যো নাই······তাঁহারা রিপুকর্মটী পর্যন্ত খাইবার দ্রব্য মনে করিয়া ডাকিতেছেন।' বিশেষতঃ, কলকাতা সহর তাদের বিস্ফারিত নয়নের প্রেক্ষাপটে যে বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই দৃশ্য অঙ্কনে শিবনাথের শিল্পশক্তির চমৎকৃতি ঘটেছে। এবং বলা চলে গোপাল ও রঙ্গিনীরা সম্ভবতঃ 'মেজবউ' উপন্যাসের জনপ্রিয়তার প্রধান আকর্ষণস্থল ছিল।

॥ ৬ ॥

'মেজবউ' উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি একটি বাস্তবানুগ চিত্রশালা। একটি যৌথ ব্রাহ্মণ পরিবারের দিনযাপন, রমণীদের দ্বিপ্রাহরিক অলস তাস-ক্রীড়া, নিমন্ত্রণ বাড়ীর যথার্থ রূপ বর্ণনা ইত্যাদি নানা চিত্র উপন্যাসটিকে বাস্তবানুগ করে তুলেছে। কারণ এমনতর ঘটনাচিত্র বাঙালী সমাজে আজও বিরল নয়। কাহিনীর বাস্তবতা উপন্যাসটিকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তাই গ্রন্থটি প্রকাশের পর বৎসরেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ এক বৎসরের মধ্যে ফুরাইয়া যায় নাই।'[১] শিবনাথের জীবৎকালের মধ্যে উপন্যাসটির সর্বমোট উনিশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। সর্বশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

জনপ্রিয়তার অন্য প্রমাণ উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ। মিরিয়ম নাইট 'ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' জার্ণালে (জানুয়ারি—মে, ১৮৮২

১। সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য, পৃঃ ১২৮। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুরুচির কুটীরে'র প্রথম ভাগ একই বছরে দু'বার প্রকাশিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন বাঙালী লেখকের পক্ষে এমন সমাদর লাভ দুর্লভ সৌভাগ্যেরই পরিচায়ক।[১]

উনিশ ও বিশ শতকে বিখ্যাত উপন্যাসগুলির কোন কোনটির 'উপসংহার' লেখার একটা প্রবণতা লেখকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিম-উপন্যাস-উপসংহার রচয়িতা দামোদর মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র উপসংহার রচয়িতা হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। 'মেজবউ' উপন্যাসেরও একটি উপসংহার লিখিত হয়েছিল 'শান্তিমঠ' নামে ; লিখেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'শান্তিমঠ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মূল উপন্যাস প্রকাশের সাত বছরের মধ্যে, গ্রন্থকারের জীবৎকালে।[২]

উপন্যাসটি পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে লিখিত—'বঙ্গ-কুল-যুবতীদিগের জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত।' লেখক উপন্যাসের মধ্যে এখানে সেখানে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন ও পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে এই ধরণের রীতি অবলম্বন করেছিলেন। এই মহিলা পাঠিকারাও এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিলেন। এছাড়া শিক্ষাবিভাগও এটির প্রচারে সহায়তা করেছিল।[৩] এই প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর নীতিবোধের সঙ্গে (—এই উপন্যাসচিত্রটিও মহিলাদের উদ্দেশ্যে লিখিত—) এই উপন্যাসের নীতিবোধের পার্থক্য সূক্ষ্মভাবে লক্ষণীয়।

১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'ও একাধিকবার ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস জে. বি. নাইট কর্তৃক একই পত্রিকায় 'স্বর্ণলতা'র প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ অনুবাদকর্তা এডোয়ার্ড টমসন ('The Brothers'—1928)

২। উল্লেখযোগ্য যে, 'শান্তিমঠে' শিবনাথের বক্তব্য ও আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে।

৩। তুলনীয়, 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৯-৬০), মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় উপন্যাস : যুগান্তর

॥ ১ ॥

'মেজবউ' উপন্যাসের মতই 'যুগান্তর' উপন্যাসটিতেও বহু বাস্তব-ঘটনা এবং চোখে দেখা চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। অবশ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাস্তব-সংসারের একের ঘটনা অন্যে আরোপিত হওয়ায় সর্বত্র যথার্থ ঘটনা বা চরিত্রকে আলাদা করে চিনে নেওয়া দুষ্কর। আমরা সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে অনুসন্ধান করে বাস্তব-ঘটনার কিছু কিছু নির্ণয়ের চেষ্টা করছি।

উপন্যাসটির নশিপুর-আখ্যানের নায়ক বা কেন্দ্র-চরিত্র বিশ্বনাথ তর্কভূষণের চরিত্রে শিবনাথের জ্যেষ্ঠ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চরিত্রের প্রভাব সর্বাধিক। গৌণভাবে পিতা হরানন্দও চরিত্রটিতে উপস্থিত।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ প্রসঙ্গে হেমলতা দেবী লিখেছেন, 'ইহা ত কাল্পনিক চিত্র নয়—তর্কভূষণ মহাশয়ের ভিতরে শিবনাথের মাতুল বিদ্যাভূষণের চিত্র দেখা যাইতেছে।'[১] অন্যত্রও এর প্রমাণ পাচ্ছি।[২] বিশ্বনাথ তর্কভূষণ স্বীয় গৃহের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া প্রবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে কথকতার আয়োজন করতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও বাড়ীতে প্রায়ই কথকতার বন্দোবস্ত করতেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'A few years before his death my uncle's attention was forcibly roused to the visible decay of moral and religious principles of the rising generation of the villages and he tock steps to organise *katha-katas* and *kirtans* in the compound of his own house, to which-he would invite his fellow-villagers.'[৩]

সপ্তম পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি অরক্ষিতা নারীর উপর নশিপুর গ্রামের চিমু ঘোষ নামক এক ধনীর অত্যাচারের কাহিনীর সংগে দ্বারকানাথের জীবনের একটি সত্য ঘটনার মিল আছে। ঘটনাটি একটু পরিবর্তিত আকারে উপন্যাসে

১। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃঃ ৩৪২।

২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নব্যভারত, ভাদ্র ১৩১৯ পৃঃ ৩০৭-১৪।

৩। Shivanath Sastri, Men I Have Seen, pp. 39.

স্থান পেয়েছে। যথার্থ ঘটনাটি শিবনাথ তাঁর Men I Have Seen (১৯৬৬) গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

নবম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ও কৈলাস চক্রবর্তী-বিবৃত কৈলাস-কন্যার অবৈধ-প্রণয়জনিত গর্ভসঞ্চারের কাহিনীর সঙ্গে দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ করা নিম্নোক্ত ঘটনার মিল লক্ষ্য করা যায়, '···the poor woman related her whole story to him (Dwarakanath)···how she was kept in a house in the neighbourhood of the rich man's mansions and how she was with child' ইত্যাদি।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি যে, তর্কভূষণের পৌত্র গিরিশচন্দ্রকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করার পশ্চাতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ব্যবসায়ে আর অধিকদিন চলিবে না ; অন্ততঃ সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা আবশ্যক' (পৃঃ ১৫)। হরানন্দ বিদ্যাসাগরও এই একই যুক্তির বশবর্তী হয়েই পুত্র শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন।[২]

অন্যান্য সত্য ঘটনাগুলি এবারে লিপিবদ্ধ করছি :—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : '১৮৪৫ সালে তাঁহার সমাধ্যায়ী ও সুহৃদ্ গুরুদাস মৈত্র যখন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন, পঞ্চুর বয়ঃক্রম তখন ১৬ কি ১৭' (পৃঃ ১৭২)। গুরুদাস মৈত্র আসলে ইতিহাসের উমেশচন্দ্র সরকার। উমেশচন্দ্র উক্ত বৎসরেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের নায়ক নবীনচন্দ্র বসু গৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণটি নিজ মুখেই বলেছেন, 'আবার গত বৎসর বাসন্তী পূজার সময়ে কৌশল করে পালালাম, ঠাকুর প্রণাম করাটা এড়ালাম' (পৃঃ ১৯৩)। এই একই কারণে শিবনাথকেও বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।

নবীন বসু সম্প্রদায়ের 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'র অপর নাম 'নবরত্ন সভা'। সেকালে এই প্রকারের সভা-সমিতির অপ্রতুলতা ছিল না। শিবনাথ প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম-চর্চার একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নাম ছিল 'পঞ্চপ্রদীপ'। উপন্যাসে

১। Shivanath Sastri, Men I Have Seen, pp.3

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৫১।

এই সভাই 'নবরত্ন' সভায় পরিবর্ধিত হয়েছে। এই সভা 'হিতৈষী' নামে যে মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিল, তার চরিত্র ছিল এই প্রকারের,—'তাহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ থাকিবে।...সুরাপান নিবারণের চেষ্টা এই পত্রিকার একটী প্রধান কার্য হইবে।' এই পরিকল্পনার পশ্চাতে প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত সুরাপানবিরোধী পত্রিকা 'হিতসাধক' ও 'Well Wisher'-এর[১] সাক্ষাৎ প্রভাব ব্যতীত শিবনাথ-সম্পাদিত দ্বিভাষী-পত্রিকা 'সমদর্শী' (১৮৭৪) ও 'মদ না গরল' (১৮৭১) পত্রিকার সুস্পষ্ট প্রভাব আছে অনুমান করি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ: নবীন বসু তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে 'নেপোলিয়ন' বলে ডাকতেন। শিবনাথের বন্ধু লোকনাথ মৈত্র তাঁর পুত্রদ্বয়কে নেপোলিয়ন ও গ্যারিবল্ডি বলে ডাকতেন।[২] শিবনাথ এঁদের খুবই স্নেহ করতেন। নবীনের ভ্রাতুষ্পুত্রের নামকরণে এই স্নেহের কথা স্বভাবতঃই মনে পড়ে।

॥ ২ ॥

উপন্যাসটির নাম 'যুগান্তর'। অর্থাৎ কোন এক যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস। এই যুগ অবিসম্বাদিতভাবে শিবনাথের আপন যুগ। এই যুগের কালনির্দেশ শিবনাথ নিজেই করে দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন, '১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। ঐ সালের ১০ই বৈশাখ দিবসে এক বিবাহের লগ্ন আছে।' এই লগ্নের কথা উপন্যাসের পরিশেষে এইভাবে বিবৃত হয়েছে,—'বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয় বৎসর।' সুতরাং উপন্যাসটিতে মোটামুটি ১৮৫২ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু কাহিনীরও একটা আরম্ভ থাকে। তাই এই কালের ভূমিকা হিসাবে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন, ব্রাহ্মসমাজের ধীর অগ্রগতি, ডফ্‌ সাহেবের প্রচারের কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে। আবার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রেশও মধুসূদনের সাহিত্য-সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনা, বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছে।

১। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।
২। 'বাবা আমাদের দুই ভাই-এর নাম রেখেছিলেন নেপোলিয়ন ও গারিবল্ডি।'-সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭, পৃঃ ৫১৮।

সভা-সমিতিকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে এ সময়ে নানা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজ থেকে যে একদল উৎকেন্দ্রিক, বিদেশী-শিক্ষাসর্বস্ব ইয়ং-বেঙ্গলগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বঙ্গদেশে একদল স্বদেশপ্রেমিকও আবির্ভূত হয়েছিল। পরবর্তী দল বঙ্গসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; আত্মসংস্কার ছিল তাঁদের জীবনের মূল ব্রত। 'যুগান্তর' উপন্যাসের 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'র সভ্যগণের লক্ষ্য এই একই প্রকার ছিল।

বিধবাবিবাহ করা সে যুগের এক শ্রেণীর প্রগতিবাদীর সমাজ-সংস্কারের উপায়-স্বরূপ ছিল। 'নবরত্ন সভা'র সভাপতি নবীনচন্দ্র সেই বিধবাবিবাহে অগ্রণী হয়ে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। উপন্যাসে এই ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'মেজবউ' উপন্যাসে যে বিধবাবিবাহ শিবনাথ দিতে পারেন নি, এখানে তা দিতে পেরেছেন। কারণ ১৮৮০ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পনের বছরের ব্যবধানে বঙ্গসমাজে বেশ কিছু সংখ্যায় বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। এবং সে বিবাহ অনেকটা ব্রাহ্মমতে সম্পাদিত হয়েছিল।

মদ্যাসক্তি সে যুগের একটা প্রধান লক্ষণ ছিল। এক শ্রেণীর মতে সভ্য হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল প্রচুর মদ্য পান। হিন্দু কলেজে ছাত্রগণের একাংশ এমন মতই পোষণ করতেন। 'যুগান্তরের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিন্ধ্যবাসিনীর বিবাহোৎসবে মিল্টন-শেক্সপীয়রে পণ্ডিত হরিকিশোর ও তাঁর ইয়ার দলের অপরিমিত মদ্যপানের চিত্রে লেখক এই ইয়ং গোষ্ঠীকেই এঁকেছেন। কিন্তু আবার হিন্দু কলেজেরই একজন সেরা ছাত্র রাজনারায়ণ বসুই প্রথম মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।[১] 'নবরত্ন সভা'ও এই প্রকার সুরাপানবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই সভার "যিনি সভ্য হইতে চাহিবেন, তাঁহাকে 'জীবনে কখনও সুরাপান করিব না' বলিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর" করতে হত।[২]

১। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পৃঃ ৫২-৫৩।

২। ১৩১১ সালে ব্রাহ্মমিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও 'কলিকাতা টেম্পারেন্স ফেডারেশনের জন্য প্রকাশিত' 'সুরাপান দমনের উপায়' নামক অষ্টম সংখ্যক মাদক নিবারণী পুস্তিকায় লক্ষ্য করছি যে, এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে গেলে, 'এতদ্দ্বারা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতীত কোন কারণে বা কোন অবস্থায় আমি সুরাপান বা অন্য কোন প্রকার মাদক সেবন করিব না' বলে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হত।

নবীন বসু-সম্প্রদায় ও বিজয়ার মাধ্যমে লেখক ব্রাহ্মধর্ম তথা পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্ম প্রচার করেছেন। এঁরা কেহই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না সত্য, এমন কি 'মেজবউ' উপন্যাসের হরিতারণের মত কোন ব্রাহ্ম যুবককে লেখক এই উপন্যাসে আনেন নি, তবুও তাঁদের ক্রিয়া-কর্মে, উপাসনা-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মভাবেরই আধিক্য লক্ষ্য করি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'নবরত্ন সভা'র প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশনেও প্রার্থনাদি একেবারে ব্রাহ্ম-রীতিতেই সম্পন্ন হয়েছে।

ইয়ং গোষ্ঠী ও উদারনৈতিক দল ব্যতীত সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একাংশ ছিলেন তথাকথিত 'বাবু' সম্প্রদায়ভুক্ত। ইংরেজ-বেনিয়ার কুপুত্রের এই ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠীর সামাজিক অনাচারকে 'যুগান্তরে' এঁকে শিবনাথ যুগচিত্রটিকে বহুলাংশে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত মুস্তফী বাবুদের বাড়ীতে রাসের আমোদের বর্ণনার সঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় বর্ণিত যুগচিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। নশিপুরের জমিদার রামহরি মিত্রও এই একই প্রকার নানা গোপন ব্যাভিচারে লিপ্ত হতেন।

'যুগান্তর' এই ত্রিমুখী যুগলক্ষণের ইতিহাস। এই যুগের শেষপর্বে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে লেখক ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাবে ও প্রচারের ফলে যে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল তার কথা সোৎসাহে ব্যক্ত করেছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন, 'ভক্তি-ভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই বৎসর কাল পর্বতশৃঙ্গে তপস্যায় যাপন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়া এই বৎসরে[1] বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সকল অগ্নিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ...এই বৎসরেই খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন।[2] প্রাচীন দেবেন্দ্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মিলনে নূতন বল আনিয়া দিল। উভয়ে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগণকে উপদেশ দিতে আরম্ভ

১। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর সিমলা থেকে কলকাতা পৌছেন। যদিও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাঁর কর্মোদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪০২।

২। অবশ্য এর পূর্বে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র একটি চিঠি লিখে ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হন।

করিলেন। যুবকদলে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল ; অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নানা স্থানে যুবকগণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিলেন। এই সকল বিবরণ শুনিয়া একদিন নবীনচন্দ্র পঞ্চুকে বলিলেন—"পঞ্চু এইবার বুঝি সত্য সত্যই যুগান্তর ঘটিল। তোমার ব্রাহ্মসমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযুগ আসিল।"

এই নবযুগের ছবি আঁকতে গিয়েছিলেন বলেই শিবনাথকে গ্রামের কাহিনীকে সহরে নিয়ে আসতে হয়েছিল। শিবনাথ নিজেও মজিলপুর ও কলকাতা, উপন্যাসের নশিপুর ও কলকাতা উভয় স্থানের অধিবাসী ছিলেন। কাহিনী তাই "'স্থানান্তরে'র সঙ্গে 'যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ···আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম।'"[১] রবীন্দ্রনাথ 'যুগান্তরে'র দ্বিতীয়াংশের রচনাকে পাঠকের পক্ষে 'দুর্ভাগ্য'জনক বললেও উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য সন্ধান করলে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য মনে হয় না। কারণ উভয় যুগ উপন্যাসে Contrast-রূপে অবতীর্ণ হয়ে স্থিতি ও গতি, অতীত ও ভবিষ্যতকে রূপদান করেছে। এখানেই উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা। শিবনাথের সব উপন্যাসেরই মূলগত প্রকৃতি প্রায় এই প্রকারের। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বিদগ্ধ সমালোচক প্রস্তাব করেছেন, 'এক হিসাবে শিবনাথের সমস্তগুলি উপন্যাসেরই যুগান্তর নামকরণ চলিতে পারে।'[২] আমরাও এই মত সমর্থন করি।

॥ ৩ ॥

'যুগান্তর' একটি সামাজিক উপন্যাস। লেখক শান্ত পল্লীর নানা দৃশ্য এবং আমাদের নানা পারিবারিক ও সামাজিক সুখ-দুঃখের কথা এই উপন্যাসে এঁকেছেন। উপন্যাসের প্রথম পর্বে বর্ণিত পল্লীগ্রামের photography দেখে আমাদের ইংরেজ ঔপন্যাসিক Jane Austen-এর বর্ণনা মনে পড়ে যায়।

উপন্যাসের বিস্তীর্ণ কাহিনীর মধ্যে হলধর বসু বা নবীনচন্দ্রের পরিবার,

১। রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনা, সাধনা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩০১ সাল।
২। প্রমথনাথ বিশী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

শিবচন্দ্র বিদ্যারত্নের পরিবার, ব্রজরাজ ঘোষের পরিবার, বিজয়ার শ্বশুরালয় এবং উলোর মুখুজ্জ্যে পরিবার স্থান পেয়ে উপন্যাসটিকে সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন করে তুলেছে।

উপন্যাসটির উদ্দেশ্যও সামাজিক। সেকালের সমাজে বাল্যবিবাহ, বিধবার প্রতি সামাজিক অবিচার, শ্বশ্রূগৃহে বধূর নির্যাতন, সুরা-পান, বাহ্যাচার-সর্বস্ব ধর্মচিন্তা ইত্যাদি যে সব উপসর্গ প্রবল হয়ে উঠেছিল, লেখক তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে এসেছেন।

'মেজবউ' উপন্যাস ছিল বিষাদান্তক। কিন্তু মিলনাকাঙ্ক্ষী পাঠককে সে ক্ষোভ এখানে করতে হয় নি। 'যুগান্তরে'র দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ব্যাপী বর্ণনায় দুটি মিলনোন্মুখ নরনারী নবীন-কৃষ্ণার পরিণয়ে এবং পরিশেষে সংসারের মাধুর্য উপভোগান্তে দেশসেবার আদর্শ স্থাপনে উপন্যাসটি মিলনান্তক হয়ে উঠেছে। 'বিধবাবিবাহের পক্ষ' শিবনাথের পক্ষপাতিত্ব 'যুগান্তর' উপন্যাসে পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শিত হয়ে রচনাটিকে মধুর, নীতিগর্ভ ও মিলনান্তক করে তুলেছে।

॥ ৪ ॥

'যুগান্তর' একটি বহু আলোচিত জনপ্রিয় উপন্যাস। নিজস্ব গুণ ব্যতীত এটির আলোচনার আধিক্যের মূল কারণ হল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনার প্রথমাংশে উপন্যাসটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং পরে এর ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের মূল বক্তব্য দ্বিবিধ,— (ক) চরিত্র-চিত্রণে শিবনাথের সহৃদয়তা ও শক্তির বিরল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; (খ) উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে ঔপন্যাসিক শিবনাথকে ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির দুই পর্বে শিবনাথের ভূমিকার এই পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। হয়ত কারণ নির্ণয় তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মপ্রচারক ও যুগদ্রষ্টা শিবনাথের পক্ষে এমন নীতিবাগীশ ও ঐতিহাসিক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিবনাথও সামাজিক কল্যাণ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া, ব্রাহ্মসমাজের সেবাই তাঁর কর্মজীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। শুধু গল্পরস পরিবেষণে সে ব্রত

চরিতার্থ হয় না। সুতরাং তাঁকে নীতি-বাগীশ হতে হয়েছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, শিল্প-সৃষ্টির প্রতিভা শিবনাথের ছিল না।[১]

'যুগান্তর উপন্যাসটি বাস্তবিকই যেন দুইখানি পৃথক গ্রন্থের সমবায়—একখানি ঔপন্যাসিকের রচনা, একখানি নীতিপ্রচারকের রচনা।'[২] রবীন্দ্রনাথ-কৃত পূর্বোক্ত সমালোচনার উপসংহারে একেই পরিহাস করে বলা হয়েছে, 'কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন।' উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এগারটি অধ্যায় প্রথম 'বহি' এবং পরবর্তী বারটি অধ্যায় দ্বিতীয় 'বহি'। প্রথমাংশের নশিপুরের কাহিনীকে দ্বিতীয়াংশে হাতিবাগানে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে।

গল্পরস ও নীতিরসের পার্থক্যের কারণটি ব্যতীত উপন্যাসটি দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অপর অন্যতম কারণ হল, উপন্যাসটি একান্ত সমাজ-নির্ভর। সমাজে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় স্থান ভেদেও চরিত্র ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। উপন্যাসটির প্রথমাংশের স্থানগত পটভূমি হল নশিপুর এবং দ্বিতীয়াংশের স্থানগত পটভূমি হল নগরভিত্তিক ও অধিকতর প্রগতিশীল হাতিবাগান। নশিপুরের রক্ষণশীল ও চিরাচরিত জীবনধারা নবযুগের বাত্যান্দোলনে কলকাতার নবীন-সমাজে যখনই এসে পড়েছে, তখনই কাহিনী স্থানান্তরের সঙ্গে 'লোকান্তরে' এসে উপস্থিত হয়েছে। এই হাওয়া এমনই বেগবান ও একমুখী ছিল যে, পুরোনো জীবনে ফিরে আসার আর উপায় ছিল না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কাহিনীরও এমন দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা তা হতে দেয় নি। দ্বিতীয় উইল রচনা রোহিনীর জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। অধিকতর শক্তিসম্পন্ন লেখক হয়ত 'যুগান্তরে'র উল্লিখিত ত্রুটি দূর করে উপন্যাসটিকে ভিন্নতর রূপদানে সমর্থ হতেন। অবশ্য

১। রবীন্দ্রনাথ শিবনাথকে একটি চিঠিতে 'অবসরমত ভারতীর জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধাদি' লেখার আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, 'সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার আছে।' (শিলাইদহ-কুমারখালি, ৮ই শ্রাবণ ১৩০৫) চিঠিটি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পত্রটির চিত্রলিপি দ্রষ্টব্য—দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭০, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ।

২। প্রমথনাথ বিশী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

শিবনাথ যে সাহিত্যিক প্রতিভার ন্যূনতাবশতঃ উপন্যাসটিকে এমন করেছেন, তা নয়; বরং বলা চলে, লেখকের সে উদ্দেশ্যই ছিল না। পরন্তু ভিন্নতর উদ্দেশ্য-যুক্ত রচনার এমন পরিণতি খুবই স্বাভাবিক।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা উপন্যাসটির ত্রুটি ও ত্রুটির কারণ নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু যে গুণে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে 'কর্তব্যক্লান্ত সমালোচকের' চিত্তকে 'আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায়' পূর্ণ করে তুলেছিলেন, তা হল, শিবনাথের চরিত্রসৃষ্টির দুর্লভ সামর্থ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল হৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।' চরিত্রসৃষ্টিতে সাফল্য অর্জনের জন্য পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও কল্পনা-শক্তিকে যে সমবেদনার রসে জারিত করে নিতে হয়, শিবনাথের অন্তর সে রসে পূর্ণ ছিল। শিবনাথ যে রেনেসাঁসের সন্তান, তার মধ্যে ছিল দুটি ধারা। একটি প্রগত (Progressive) ও অন্যটি পরাগত (Backward)। ঔপন্যাসিক হিসাবে শিবনাথ এই দুই ধারার প্রতি সমান সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যাঁরা এই দুই ধারার কোনটিরও অন্তর্গত নন, বিচারহীন মধ্যপন্থী মাত্র, শিবনাথ তাঁদের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখান নি। কারণ তাদের মধ্যে অতীতের ঐতিহ্য বা নবীনের সুস্থ জীবনাচরণ, কোনটিরই সুষ্ঠু প্রকাশ হয় নি। উপন্যাসের হরিকিশোর ও জহরলাল তাই লেখকের হাতে সুন্দর চরিত্র হয়ে ওঠেনি।

চরিত্রচিত্রণের এই 'দুর্লভ' সামর্থ্য সবিশেষ প্রস্ফুটিত হয়েছে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের চরিত্রাঙ্কনে। এঁর চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এমন সত্য-চরিত্র বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।···সংক্ষেপে, তর্কভূষণ, তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ, তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে লইয়া একটি গ্রাম্য গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্তী সূর্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।' নব্যন্যায়ে সুপণ্ডিত, অবস্থা-সম্পন্ন অথচ নিরহঙ্কার এই ব্যক্তিটি পরম বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন উদার ধর্মমতের পরিপোষক। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না আবার উর্দ্ধশিখ শিরোমণি পণ্ডিতের সংস্কারও তাঁর

ছিল না। এ হেন ব্যক্তিকে অপদস্থ করার চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার মত সুধী ব্যক্তির অভাব আমাদের সমাজে কখনও হয় নি। তর্কভূষণ মহাশয়কে নানাভাবে অপমানিত হতে দেখে আমাদের প্রশ্ন জাগে— সাধুত্বের পরিণাম কি এই? লেখক নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন,—'একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন, 'সংসারে সবচেয়ে দুঃখী কে?' এক ব্যক্তি এর উত্তরে বলেছে, 'যাঁহার দয়া আছে, তিনি সর্বাপেক্ষা দুঃখী, কারণ সকলের দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।' 'মেজবউ' উপন্যাসের টাইপ-ধর্মী চরিত্র সমূহের মধ্যে লক্ষণীয় ব্যতিক্রম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ।

তর্কভূষণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে একমাত্র চতুর্থ পুত্র হরচন্দ্রই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্য পুত্রেরা উপন্যাসে ভীড় বাড়িয়েছে মাত্র, লেখক এদের না আনলেই ভাল করতেন। কারণ তাঁরা একমাত্র বংশ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সফল করে নি। হরচন্দ্র কুসঙ্গে পড়ে যখন হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন পিতৃস্বসা বিজয়ার সংস্পর্শে এসে তিনি আত্মোন্নতির ব্রতে ব্রতী হন। তাঁর চরিত্রের এই ধীর বিকাশটুকু লেখক সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। অবশ্য এই সহানুভূতির একটা কারণ এই যে, হরচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন অবশ্য সাংসারিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তর্কভূষণ পরিবারের বিস্তৃত পক্ষপুটের আশ্রয়ে গোবিন্দ ও পঙ্কু লালিত হয়েছিলেন। এই যুগপ্রতিনিধিদের ছবিগুলি স্বাভাবিক হয়ে উঠত যদি আদর্শ প্রচারের বাহুল্যে আরও একটু সংযম প্রদর্শিত হত। গোবিন্দ যে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি আসক্ত, শুধুমাত্র একথা উল্লেখ না করে বা তাঁকে দেশান্তরী না করে লেখক একটী মধুর পার্শ্ব-কাহিনী রচনা করে উপন্যাসটিকে শিল্পসম্মত চরিত্র দান করতে পারতেন। এই গোষ্ঠীর নায়ক নবীন অবশ্য আদর্শবাদী হয়েও মানবিক গুণসম্পন্ন। সমাজ সংস্কারে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না, কিন্তু যে গুণে তিনি উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের নায়ক হয়ে উঠেছেন, তা হল তাঁর অন্তরের অনাবিল প্রেম।

ঘোষ পরিবারকে কেন্দ্র করে যে আদর্শ শিবনাথ প্রচার করেছেন, মাঝে মাঝে তা পাঠকের বড় নীরস লাগে। কিন্তু ঘোষ পরিবারের একটি 'খাঁটি মানুষ' এক পলকের জন্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে এই ক্লেশকে লাঘব করেছেন; তিনি শ্রীধর ঘোষ। 'আমাদের বিশ্বাস লেখক মনোযোগ

করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন।' গোবিন্দচরণ-ভরসার উপর একান্ত নির্ভরশীল এই ব্যক্তির চরিত্রে লেখক এমন সম্ভাবনার সঞ্চার করেছিলেন। তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখার যে আকাঙ্ক্ষা পাঠকের মনে উদয় হয়, তা থেকেই এই চরিত্রটির সিদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

প্রথম পর্ব অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্বে উপন্যাসটি জটিলতর হয়ে উঠেছে। এর অন্যতম কারণ দুটি হল, দ্বিতীয় পর্বে প্রেমের প্রসঙ্গ এসেছে এবং সেই সূত্রে অনেক চরিত্র ভীড় করেছে। কৃষ্ণকামিনীর মাতুল শ্যামচাঁদ মিত্র অস্থির অথচ স্নেহপ্রবণ, স্ত্রীবুদ্ধি-নির্ভর ব্যক্তি। এঁর চরিত্রে Contrast ছিল, লেখক তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। শ্যামচাঁদের শ্যালক উমাশঙ্কর খল নায়ক হয়ে উঠতে পারতেন। সে সম্ভাবনারও সদ্ব্যবহার লেখক করেন নি। মুকণ্ঠ বাগচী মশায়কে দেখে আমাদের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে মনে পড়ে।

লেখকের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েও অবক্ষয়ী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উপন্যাসে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নশিপুরের রামহরি মিত্র, তাঁর পুত্র জহরলাল ও জহরলালের সব অপকর্মের দক্ষিণ হস্ত চিমু ঘোষ। জহরলাল হিন্দু কলেজের পথভ্রষ্ট চরিত্ররূপে লেখক কর্তৃক সমালোচিত হয়েছেন। একটা বিশিষ্ট যুগের প্রতিরূপ হিসাবে এঁরা সার্থক। 'আলালের ঘরের দুলাল' মতিলাল এঁদের পূর্বপুরুষ।

প্রাচীন বঙ্গসমাজের আর এক ধারার প্রতিরূপ ভুবনেশ্বরীর স্বামী জ্ঞানেন্দ্র। অপরিণামদর্শী, গোঁয়ার ও অকর্মণ্য এই যুবকটি সেকালের পল্লীসমাজের কীর্তিমান জামাতা-গোষ্ঠীর একজন স্থায়ী সদস্য। একে অঙ্কন করে লেখক সেকালের বঙ্গবধূগণের নির্যাতনের যথার্থ চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তিচরিত্রের বিশিষ্টতা যে গোষ্ঠীচরিত্রেও আরোপ করা যায়, 'হাঁসের দল' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দলের সভ্যেরা একাধারে সমাজ-সংস্কারক ও পরোপকারী, আবার সামাজিক 'অসৈরণের' তীব্র বিরোধী। এঁদের দলপতির নাম 'সোয়ান'। ঔদরিকতার মহান গুণে ইনি ভূষিত। ভোজনে অপেক্ষাকৃত অপটু সভ্যদের নাম 'পাতি হাঁস'। এই দলের যে সভ্যটি পাঠকের সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে, সে তারক, ওরফে তাওক

ওরফে অষ্টাবক্র। তার চরিত্রের মধ্যে লেখক কিঞ্চিৎ স্থূলতা এনেছেন।[১] শারীরিক বিকৃতি, সততলালাক্ষরণকারী জিহ্বা ও অস্ফুট উচ্চারণে সে সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। চরিত্রটিতে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের গডাধরচন্দ্র ও নীলকমল যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করেছে অনুমান করি। উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি 'হাঁসের দল'[২] ও তাওকের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ ও কথোপকথনে হাসির অ্যাটম-বোমে পরিণত হয়েছে।

এই অ্যাটম-বোম শুধু বিস্ফোরিত হয়ে হাসির রং-মশালই ছড়ায় না, অন্যায়ের প্রতিকার করতেও এরা বিস্ফোরিত হতে জানে। আর সে বিস্ফোরণের যে কি জ্বালা, নশিপুর জমিদার-নন্দন জহরলাল ও চিমু ঘোষ তার ভুক্তভোগী।

লোকহিতৈষী এই দলটি বউবাজারের 'পক্ষীর দলের'[৩] অনুকরণে সৃষ্ট হলেও এরা অনাচারী ছিল না। কুলে-শীলে এরা অভিজাত বংশ থেকে আসে নি বটে, কিন্তু কর্মে ও আচরণে এরা পক্ষীর দলে কুলীন বলে পরিচিত হওয়ার অধিকারী। এমন একটি গোষ্ঠীকে সৃষ্টি করে লেখক হাস্য রসের স্থায়ী জগতে এদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

নারী জাতির প্রতি স্বাভাবিক সমবেদনাবশতঃ নারী-চরিত্র অংকনে শিবনাথ অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এদিক থেকে তিনি দীনবন্ধু মিত্রের সহধর্মী। অবশ্য তা বলে শিবনাথের উপন্যাসগুলি নারীপ্রধান হয়ে ওঠেনি। লেখক উপন্যাসে তর্কভূষণের পত্নীর নাম উল্লেখ করেন নি। আমরা তাঁকে বিশ্বনাথের পার্বতী আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। সরলা, ধর্মনিষ্ঠা, দানবতী এই চরিত্রটির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিয়ে লেখক চরিত্রটিকে স্বাভাবিক করে তুলেছেন। 'মেজবউ' প্রমদার একটি মানসসঙ্গীর সাক্ষাৎ আমরা 'যুগান্তর' উপন্যাসে পেয়েছি। তিনি তর্কভূষণ

১। সমালোচকের মতে এই স্থূলতা সমর্থনযোগ্য : 'A degree of barbarism and rusticity seems necessary to the perfection of humour,'—J. B. Priestly, English Humour.

২। এই দলের সঙ্গে শিবনাথের শৈশবের 'গানের দলের' ভাবাত্মক সাদৃশ্য লক্ষণীয়। দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৯-৩০।

৩। দ্রঃ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭ সংস্করণ) পৃঃ ৫৬।

মহাশয়ের শিক্ষিতা, সুরুচি-সম্পন্না ভগিনী বিজয়া—বর্তমানে সদ্যোবিধবা। বিজয়া তাঁর স্বামী মৃত নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মমতের অনুসারী ছিলেন বলে তাঁর ধর্মমতে ঔদার্য লক্ষ্য করে থাকি। এবং এই উদারতার জন্যই তিনি জীবনে স্বামী, জামাতাকে হারিয়েও সমাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করতে পেরেছিলেন। নারীচরিত্রে এতখানি আদর্শের আরোপ আমাদের অস্বাভাবিক মনে হয় নি। কারণ আমাদের দেশের নারীচরিত্রের পক্ষে আদর্শ-প্রাধান্য অপরিহার্য। তর্কভূষণের কন্যাদের মধ্যে একমাত্র ভুবনেশ্বরীই পাঠকের সহানুভূতিকে আকর্ষণ করেছে। বাপের বড় আদরের এই মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ীতে শ্বশ্রূর প্রহার, জা-এর প্রতিহিংসা ও স্বামীর কঠোর নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে ভায়েরা এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু নারীর চিরন্তন অধিকার থেকে সে চিরবঞ্চিতা হয়েছে। তৎকালীন সমাজে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে বধূ-নির্যাতনের এই কাহিনী শিবনাথ যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ভুবনকে দেখে আমাদের শরৎচন্দ্রের গৌরী তেওয়ারীর মেয়েকে মনে পড়ে। ভুবনের দুঃখে পাঠক যখন দুঃখিত হন, তখনই চরিত্রটির সার্থকতা অনুভূত হয়।

কিন্তু যে কারণে গ্রন্থটি অন্ততঃ কিছু পরিমাণে উপন্যাসধর্মী হয়ে উঠেছে, তা হল প্রেম। নবীন-কৃষ্ণকামিনীর অনাবিল প্রেম, বিধবা ব্যভিচারিণী মাতঙ্গিনীর উপস্থিতিতে ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নবীনের পূর্বরাগও কৃষ্ণার নারীসুলভ নির্ভরতা মনস্তত্ত্বসম্মত। বিশেষতঃ মাতঙ্গিনীর জন্য তাঁদের পারস্পরিক আকর্ষণ বহুগুণিত হয়েছে। বালবিধবা কৃষ্ণার সঙ্গে সমাজ-সংস্কারক নবীনের বিবাহ সেকালের বিধবাবিবাহান্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নানা বাধা অতিক্রম করে কৃষ্ণা শেষ পর্যন্ত কাশীতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পেরেছেন। একটি প্রেমপূর্ণ জীবন নানা বিপর্যয়ের পথ পার হয়ে অবশেষে পরম শান্তির নীড়ের সন্ধান পেয়েছে।

মাতঙ্গিনী[১] চরিত্রটিকে উপন্যাসে আনার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ত্রিবিধ—(১) নারীর ব্যভিচার, (২) ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং (৩) বালবিধবাদের

১। এই চরিত্রটির সঙ্গে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'হরিদাসের গুপ্ত কথা'র কৃষ্ণকামিনীর চরিত্রটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অপর এক পরিণতি অঙ্কন। যৌবনের স্বাভাবিক কামনা অবদমিত রেখে বহু বাঙ্গালী বালবিধবার এমনই পরিণতি হত। বাড়ীর কুট্টনী ঝিগুলি এই পদস্খলনের মূল কারণ ছিল। নীলদর্পণের পদী ময়রাণীকে আমরা এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি। মাতঙ্গিনী চরিত্রটি অঙ্কনে শিবনাথ যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন। কারণ মাতঙ্গিনীর পদস্খলনের পর তার চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোই শিবনাথের পক্ষে স্বাভাবিক হত। উপন্যাসে এর বর্ণনা জীবনানুগ হওয়ায় চরিত্র হিসাবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শিশু চরিত্র অঙ্কনে শিশুদরদী শিবনাথের দক্ষতা তর্কাতীত। ব্রজরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা টিমিমণির অস্ফুট উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'র ধ্রুবকে মনে পড়িয়ে দেয়। ধ্রুব অবশ্য ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ বলে মন্দিরকে 'লদন্দ' বলত, কিন্তু বয়সে ছোট হয়েও টিমিমণি নিজের ধ্বনিতত্ত্বে অশিক্ষিতপটুত্ব অর্জন করেছে। নবীনের ভ্রাতুষ্পুত্রগণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি রসবহ ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

॥ ৫ ॥

'যুগান্তর' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে (৬ই জানুয়ারী ১৮৯৫)। এটি শিবনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হলেও 'মেজবউ'-এর জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করতে পারে নি। সেকারণে এর প্রচারও অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল।[১]

উপন্যাসটির রচনাকর্ম হয়ত বাংলা দেশেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশই বিলাত প্রবাসকালে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করি। 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'র ২রা মে ১৮৮৮ তারিখে শিবনাথ লিখেছেন, 'ষ্টীমারের গোলমালে আমার নভেল লেখাটি বন্ধ হইয়া গেল ; এত গোলে কি তাহা হয়।' অন্যত্র (১৫-১১-৮৮), 'মনে করিয়াছিলাম যে, জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিবার মধ্যে···নবেলখানি শেষ করিতে পারিব।' কিন্তু 'ইন্সপিরেশনের' অভাবে লিখে উঠতে পারেন নি। এই 'নবেলখানিই' সম্ভবতঃ 'যুগান্তর' ; যদিও উপন্যাসটি বিলাত থেকে ফিরে আসার দীর্ঘ সাত বছর পর প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, ইংলণ্ড প্রবাসকালে যে মানবহিতৈষণা বা Philanthropy

১। দ্বিতীয় সংস্করণ, (১৯০২) লেখকের জীবৎকালে ; তৃতীয় সংস্করণ (১৯২৩)।

শিবনাথের সমগ্র চিত্তকে অধিকার করে ছিল, উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা' ও নবীন বসুর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা উপন্যাসটিকে পাঠককুলে অধিকতর পরিচিত করেছিল।[১] 'যুগান্তর'কে সেকালের পাঠকগণ যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে গ্রহণ করেছিলেন, আমরা তার একটি অন্যতর প্রমাণ উল্লেখ করছি। অগ্রহায়ণ ১৩২১ সংখ্যার প্রবাসী পত্রিকায় তৎকালে প্রকাশিত উপন্যাসাদি নানা রচনাগুলির মধ্যে পাঠকগণের মতে কোনগুলি শ্রেষ্ঠ তা জ্ঞাত হওয়ার জন্য যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল, পাঠকেরা তাতে প্রভূত সাড়া দিয়েছিলেন। পরবর্তী পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ফলাফল থেকে জানতে পারি যে, পাঠককুল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে রায় দিয়েছিলেন।

উপন্যাসটির গৌরব বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল একটি ভিন্নতর অথচ মহৎ কারণেও। সে যুগের সন্ত্রাসবাদী দল আপনাদের দলের নামকরণ করেছিল 'যুগান্তর', এই উপন্যাসের নামকরণ থেকেই। এবং 'যুগান্তর' (১৯০৬) পত্রিকার নামকরণেও যে এই উপন্যাসের প্রেরণা ছিল, তা আমরা পূর্বেই শিবনাথের 'স্বদেশ-সাধনা' পর্যায়ে আলোচনা করেছি।

১। পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে উপন্যাসের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনাও মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্প্রতি উপন্যাসটির একটি নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় উপন্যাস : নয়নতারা

॥ ১ ॥

পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ের উপকরণ সংগ্রহ পর্যায়ে বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাগুলির সবিস্তার উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে তার সুযোগ ছিল। 'নয়নতারা' উপন্যাসে বাস্তবচরিত্রের সঙ্গে কিছু কাল্পনিক চরিত্রও এসে পড়েছে মনে হয়। তবুও সত্যদক্ষ লেখক যুগচরিত্রকে এই উপন্যাসে নানাভাবে উপস্থিত করেছেন। এখানেও 'যুগান্তরের' মত নানা চরিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব এসে পড়েছে। এই প্রভাবের কথা চরিত্রবিচার প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো। সমকালীন ঘটনাগুলিও সেই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হবে।

॥ ২ ॥

পূর্বালোচিত উপন্যাসদ্বয়ে নবযুগের দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও সংঘাতময় জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। সেখানে কাহিনী গ্রাম থেকে শহরে, প্রাচীন যুগ থেকে অর্বাচীন যুগে, সনাতন ধর্ম থেকে ব্রাহ্মধর্মে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে সে সমস্যা প্রায় অনুপস্থিত। যেটুকু আছে, তা নগণ্য। ধর্মগত সংঘাতের চেয়ে এখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে আভিজাত্যের দ্বন্দ্বই সম্ভবতঃ প্রধান। ধর্মের দ্বন্দ্ব প্রবল হলে বিদ্যারত্ন মহাশয় রায় পরিবারের বন্ধু হতে পারতেন না। এবং গোঁসাই বাড়ীর ছেলে গোবিন্দের সঙ্গে তথাকথিত 'ধর্মহীন' পরিবারের মেয়ে সৌদামিনীর পরিণয় এত সহজে সম্ভব হতে পারত না। লেখক সম্ভবতঃ ধর্মগত সংঘাতের পরিবর্তে ধর্মের মিলনকেই আঁকতে চেয়েছেন। কারণ এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম দেশে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল এবং হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে যে পারস্পরিক মিলন সম্ভব হয়েছিল, সে কথা প্রচারের প্রয়োজনও লেখক অনুভব করেছিলেন। সুরেশের মুখে নয়নতারাকে বার বার 'বিম্মি' বলতে শুনেছি ; সেটা ধর্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ততটা নয়, যতটা নয়নতারার প্রণয়ের পাত্র হরেনের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ। ধর্মগত সংঘাতের অনুল্লেখ্য উপস্থিতি মাত্র যুগের প্রয়োজনে এসেছে।

প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের চিন্তাধারার মধ্যবর্তী ইঙ্গ-বঙ্গ শ্রেণীর তথাকথিত অভিজাত অথচ ছিন্নমূল, হঠাৎ শিক্ষিত, উন্মার্গগামী চরিত্রগুলির সঙ্গে দেশীয় চরিত্রের সংঘর্ষ 'নয়নতারা' উপন্যাসের অপর সংঘাতস্থল। ডাঃ ম্যাগুর সমগোত্রীয় ব্যক্তিরা সেকারণে বার বার নয়নতারার তিরস্কারের পরোক্ষ লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলেন।

'নয়নতারা' উপন্যাসে গ্রামজীবন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এর পটভূমি কয়েকটি সহর। চুঁচুড়া বড় সহর নয় সত্য, কিন্তু গ্রামও নয়। চুঁচুড়ার কাহিনী কলকাতা এবং মুঙ্গের উভয়স্থানে প্রবাহিত হয়ে গেছে। নগরকেন্দ্রিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং মদ্যাসক্তি ইত্যাদি ক্রটি-বিচ্যুতি সমান্তরাল ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। পুলিশ, আদালত, সভাসমিতির কথা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।

এই উপন্যাসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়; পূর্ববর্তী উপন্যাসদ্বয়ে প্রসঙ্গক্রমে বার বার সাল তারিখের উল্লেখ দ্বারা উপন্যাসের কালপরিধি নির্দেশিত হয়েছিল। 'নয়নতারা'য় সাল তারিখের উল্লেখ নেই বলে বিশেষ কোন যুগের চিহ্ন তার মধ্যে নেই।

শিবনাথ প্রাচীন ও নবীন উভয় যুগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মধ্যবর্তীদের প্রতি বিমুখ ছিলেন—তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবুও স্থানবিশেষে প্রাচীন তাঁর সমালোচনা থেকে মুক্তি পায় নি। রায় মহাশয় বলেছেন, 'তাই বলে মনে ক'রো না, যে সেকালের সমুদায় লোক ভাল, আর ইংরেজী-ওয়ালারা সব খারাপ' (পৃঃ ৬১)। পাশ্চাত্য দর্শনের শিক্ষা সে যুগের এক শ্রেণীর শিক্ষিতের মধ্যে নাস্তিকাবুদ্ধির প্রসার ঘটাচ্ছিল। সে সময়ে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব দেশীয় চরিত্রকে নাস্তিকাবাদ থেকে আস্তিক্যবাদে দীক্ষিত করার কাজে অন্ততঃ দেশের কাছে শ্রদ্ধা পেয়েছিল। প্রাচীন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছ থেকে যুগের এই প্রবণতা ও ব্রাহ্মদের সম্পর্কে বলতে শুনি, 'ওঁরা ত ধার্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী লোক, ওঁদের মত হলে ত ভালই হয়, তবু ধর্মে মতি থাকে; এখনকার ছেলে পিলে তা ত হচ্ছে না, তারা দুইএর বার হয়ে যাচ্ছে। না সেকালের কিছু মানে, না এঁদের কথা শোনে' (পৃঃ ১৮)।



॥ ৩ ॥

'নয়নতারা' একটি পারিবারিক উপন্যাস। তবে 'মেজবউ' উপন্যাসে যেমন একটি মাত্র পরিবারের কথা বলা হয়েছে, এই উপন্যাসে তা হয় নি। চুঁচুড়ার রায় পরিবার ছাড়া বিদ্যারত্ন মহাশয়, মহেন্দ্রবাবু, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইত্যাদিদের পরিবারের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে।

রায় পরিবারের নানা কথার মধ্যে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হল, পরিবারে ধর্মসাধনের শিক্ষা।[১] কাহিনীর জন্মস্থল চুঁচুড়া। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথ সম্ভবতঃ তাঁর চুঁচুড়া বাসকালেই এই উপন্যাসটি লিখেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে তিনি চন্দননগরে বাস করছিলেন।[২] যাই হোক, উপন্যাসটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য নায়িকার নামানুসারে নামকরণে।[৩] একটি পরিবারের মধ্যমণি এই উপন্যাসেরও মধ্যমণি। এই সব কারণে মূলতঃ রচনাটি পারিবারিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

একটি ধনী অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মার্জিত কন্যা নয়নতারা একটি শিক্ষিত যুবককে প্রেমাস্পদরূপে বরণ করতে গিয়েও আভিজাত্যের বাধা বশতঃ বিফল হয়েছে। সেদিক থেকে রচনাটি ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের পরিশেষে যোগিনীবেশী নয়নতারা এবং উদ্‌ভ্রান্ত হরেনকে দেখে পাঠকের মনে সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়। নয়নতারার জীবনের একটা বিষাদ পরিণতি এসেছে ভালবাসার ছিদ্রপথ দিয়ে। নয়নতারা ভালবেসে ভুল করেছিল এমন বলি না, কিন্তু 'দারিদ্র দোষঃ গুণসন্নিপাতে…', তাঁর প্রণয়ের পাত্র শিক্ষিত হয়েও সেই দারিদ্র্য দোষে অপরাধী এবং কাজে কাজেই সুরেশের মত অভিজাতের মতে প্রেমিককুলে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয়। নয়নতারা সুরেশকে শ্রদ্ধা করত। এই শ্রদ্ধার পাত্রটি তাঁর প্রতি কোন সহানুভূতি দেখান নি।

১। পরিবারে ধর্ম সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর শিবনাথ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত দ্রষ্টব্য, 'গৃহধর্ম' (১৮৮১) পুস্তকের 'পরিবার' নামক প্রবন্ধ।

২। '১৮৯৮ সালে স্বাস্থ্যের জন্য চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্তী একটি বাড়ীতে গিয়া থাকি। ১৮৯৯ সালের শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।'—আত্মচরিত, পৃঃ ২৬২।

৩। 'উমাকান্ত' উপন্যাসের নামকরণ শিবনাথতনয় প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য করেছিলেন। নয়নতারা ব্যতীত অন্য কোন উপন্যাসের নামকরণ শিবনাথ নায়ক-নায়িকার নামানুসারে করেন নাই।

কাজেই নয়নতারা এই পৃথিবী সম্পর্কে হতাশ হয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবনকে বরণ করে মুঙ্গেরে আপনাকে নির্বাসিত করেছেন এবং উপন্যাসটি একটি সার্থক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

'নয়নতারা' উপন্যাসের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী একটি শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। সেকালে প্রকাশিত উপন্যাস সমূহের তুলনায় উপন্যাসটির একটি পৃথক মর্যাদা আছে ; শিক্ষার দ্বন্দ্বও উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। কালীপদ রায় মহাশয় ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী, ফারসীতে দক্ষ, তাঁর পুত্রেরা কেউবা বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টা'র, অন্যরা যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত, কন্যারাও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। শুধু তাই নয়, রায় মহাশয়ের চতুষ্পার্শ্বে যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, মহেন্দ্রবাবুর বৃত্তি শিক্ষকতা, মৌলবী সাহেব আরবী-ফারসীতে পারদর্শী, মণিলালবাবু অবসরপ্রাপ্ত 'সদরওয়ালা', হরেন শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেছেন।

একমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জনে যে সাংস্কৃতিক ঋদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না, শিবনাথ সেকথা বিশ্বাস করতেন। সেজন্য রায় পরিবারের মেয়েরা এবং রায় মহাশয় নিজেও গীতবাদ্যে প্রভৃত দক্ষ ছিলেন। মণিলাল বাবুর ভাই গোবিন্দবাবুও সংগীতজ্ঞ ছিলেন বলেই রায় পরিবারে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করতে পেরেছিলেন।

উপন্যাসের অপর বৈশিষ্ট্য হল, রায় পরিবারের উদার আবহাওয়া। শিবনাথের পরিবারের আবহাওয়া এই প্রকারের উদার ছিল, সেকথা বিপিনচন্দ্র পাল উল্লেখ করেছেন।[১] অবরোধ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করার জন্য অবশ্য এই পরিবারের চাল-চলন 'এঙ্গলো ভার্ণেকিউলার' আখ্যা পেয়েছে।

কালীপদ রায় মহাশয় উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছেন। এই আদর্শ গৃহস্বামীর চিত্তের ঔদার্য, পরদুঃখকাতরতা, বন্ধু-বৎসলতা, শিল্পানুরাগ ও ঈশ্বরভক্তি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে লেখক

১। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪।

দেখিয়েছেন। রায় মহাশয় সংসারের সামনে কখনও আসেন নি, যদিও সংসারের শৃঙ্খলারক্ষার ভারটা তিনি পরোক্ষভাবে পালন করে যাচ্ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সংসারের বন্ধনগ্রন্থিগুলি একে একে শিথিল হয়ে পড়েছে। চরিত্রটিতে আরও একটু ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হত। রায় মহাশয়কে কেন্দ্র করে যাঁরা এসেছেন উপন্যাসে তাঁদের খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁরা নিজেরা উপন্যাসের মূল ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ অংশ না নিলেও catalytic agent-এর মত উপন্যাসের সমগ্র আবহাওয়াটিকে গড়ে তুলেছেন। সেখানেই এঁদের উপযোগিতা, অন্যথা নয়।

রায় মহাশয়ের চারিটি পুত্রের মধ্যে একমাত্র সুরেশচন্দ্রই উপন্যাসে সাক্ষাৎ-ভাবে স্থান পেয়েছেন। আভিজাত্য বনাম দারিদ্র্য এবং স্বাভাবিক চরিত্র বনাম উন্মার্গ চরিত্র—এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব তাঁর চরিত্রকে কেন্দ্র করে বেগবান হয়েছে। তিনি উচ্চশিক্ষিত, আবার মদ্যাসক্ত—অনেকটা ইয়ং গোষ্ঠীর সমগোত্রীয়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরিবারে উদার আবহাওয়া রক্ষণের পক্ষপাতী, অথচ হরেনের সঙ্গে নয়নতারার পরিণয়ে তাঁর আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়; সংসারে পিতা বর্তমান, তবুও নিজের ব্যক্তিত্বকে সোচ্চারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না; সংসারের প্রতিও তাঁর খুব শ্রদ্ধা ছিল মনে হয় না। কারণ মদ্যাসক্ত বন্ধুদের নিয়ে মাতলামি করতে তাঁকে কোনদিনই ইতস্তত: করতে দেখি না। সুরেশচন্দ্রের চরিত্রের এই পরস্পরবিরোধী মনোভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। কিন্তু সব কিছুতেই তাঁর উগ্রভাব মাঝে মাঝে পাঠকের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। মনে হয় চরিত্রটি অঙ্কনের সময় লেখক চড়া রঙ ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের প্রায় শেষাংশে রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র যোগেশকে[১] দেখতে পাই। তিনি বয়সে কনিষ্ঠ হয়েও মদ্যপানে জ্যেষ্ঠকে পরাজিত করেছেন। তিনি এমনিতে বৈশিষ্ট্যহীন। তবে মদ্যপানের পর নয়নতারাকে মুখ দেখাতে তাঁর লজ্জা বোধ হয়েছে। তাই নয়নতারা চলে যাবার আগে একটি চিরকুটে সলজ্জভাবে লিখেছেন, 'Sister! dont leave us, we shall go worse.'

১। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটকের নায়ক যোগেশের সঙ্গে এই চরিত্রটির স্বল্পবিস্তর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজেকে সংশোধন করতে পারেন না—তাঁর এই অক্ষমতা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এখানেই যোগেশ অনেকখানি সার্থক।

মণিলালবাবুকে উপন্যাসে লেখক কেন এনেছেন, বুঝতে পারি না; উপন্যাসের কোন মুখ্য ঘটনাতে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেখি না। কেবল-মাত্র নয়নতারা-হরেনের প্রণয় ব্যাপারে পরিবারে যখন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তখন তাঁর ব্যবহার হাস্যরসের উদ্রেক করে পাঠককে কিছুটা আপাত-স্বস্তি দিয়েছে। এখানে তিনি সদানন্দ। কিন্তু হাস্যরসের এই পাত্রটি সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষকের মার্জিত রূপ ছাড়া আর কিছু নন। মণিবাবুর ভাই গোবিন্দের চরিত্রে যদি কিছু বিশিষ্টতা থাকে, সে তার সেতার বাদনের অধিকারে। প্রেমিক হিসাবে তিনি কোন আদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে প্রণয়ের যে একটা পার্শ্বকাহিনী গড়ে উঠেছে, তাও নেহাৎ অনুল্লেখ্য।

কিন্তু 'লেখক যেখানেই···খাঁটি মানুষগুলির কথা বলিয়াছেন সেখানেই দুই-চারিটি সবল বর্ণনায় স্বল্পরেখাপাতে অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন।' এমন একটি খাঁটি মানুষ মণিলালবাবুর পিতা, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর কথা আমরা লেখকের ভাষায় শুনি, 'কর্তার বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইবে; কিন্তু দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; আজও প্রাতে রীতিমত পদব্রজে গঙ্গাস্নানে গিয়া থাকেন; মানুষটি খর্বাকৃতি, যেন গিলে বিচাটির মত; তবে বার্ধক্যবশতঃ দেহে বলি দেখা দিয়াছে; বর্ণটী শ্যাম; রূপটী সুস্নিগ্ধ, কমনীয়, প্রশান্ত, পবিত্র, সদ্ভাব ও সাধুতার আভাতে উজ্জ্বল। দেখিলেই ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হয়; নাসাতে তিলক, বাহুদ্বয়ের উপরে ও বক্ষঃস্থলে হরিনামের ছাপ ও গলদেশে তুলসীর মালা; কণ্ঠসংলগ্ন একটী স্বর্ণনির্মিত হুকে কুঁড়োজালিটী সর্বদাই ঝুলিতেছে; তবে বস্ত্রাবৃত থাকে বলিয়া সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।' কর্তা বাড়ুযোকে দেখে আমাদের 'যুগান্তর' উপন্যাসের শ্রীধর ঘোষকে আর একবার মনে পড়ল। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ-কৃত সমালোচনার ফলে শিবনাথ এমন একটি চরিত্রকে আর একবার এনেছেন।

এমন আরও কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি Mr. and Mrs. Grieve এবং নয়নতারার একদিনের ট্রেন সহযাত্রী ইংরেজ

যুবকটি বিশিষ্ট। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ভ্রমণকালে শিবনাথ 'বড়' ইংরেজদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ইংরেজ-জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এঁদের প্রতি প্রদর্শিত হয়ে স্বল্প রেখাপাতে চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। নিধিরাম ঘোষ সেকালের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থের পরম নির্ভরশীল, বিশ্বাসী ভৃত্য—সম্ভবতঃ খোদাই-এর আত্মার আত্মীয়। উদাসী বাবা পরম বৈষ্ণব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মহান সম্পদ। কিন্তু এমন গুরুর গিরিধারীর মত নারীমাংসলোলুপ শিষ্যের অভাব থাকে না।

নরনারীর প্রণয়দ্বন্দ্ব যদি উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন হয়, তবে 'নয়নতারা' একটি পুরোদস্তুর উপন্যাস। অনুরাগ ও ঈর্ষ্যা, সমর্থন ও প্রতিবাদে 'নয়নতারা'র প্রেমরস আবর্তিত হয়ে উঠেছে। অন্ততঃ দুটি প্রেম কাহিনী উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। একটি সৌদামিনী-গোবিন্দের, অপরটি নয়নতারা-হরেনের। প্রথমটি গৌণ, দ্বিতীয়টি মুখ্য।

সৌদামিনী চরিত্র হিসাবে যে পূর্ণ, তা নয়, তবে বাস্তব। সব চেয়ে চোখে পড়ে স্বভাবের ক্ষেত্রে নয়নতারার সঙ্গে তার দুস্তর পার্থক্য। গোবিন্দের সঙ্গে তার প্রণয়ের সূত্রটি বা প্রেমের অগ্রগতি খুব একটা মনস্তত্ত্বসম্মত নয়। তবুও তার প্রেমের সংস্পর্শে এসে গোবিন্দের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে, এখানেই তার প্রেমের পরাকাষ্ঠা। নয়নতারার contrast-রূপে সৌদামিনীকে এনে লেখক নয়নতারাকেই অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলেছেন। সৌদামিনীর 'জীবনপাত্র' উচ্ছলিত হয়ে পাঠকগণকে 'মাধুরীদানে' সম্পৃক্ত করেছে।

কিন্তু উপন্যাসের গতিশক্তি দ্বিতীয় প্রণয়-কাহিনীর মধ্যেই নিহিত। নয়নতারা রায় পরিবারের স্নেহের পাত্রী, শিক্ষিতা, মার্জিত রুচিসম্পন্না এবং পরিণামদর্শিনী, অন্তরে তাঁর প্রেমের জন্য ক্ষুধা ছিল। টুনী-পটলার গৃহশিক্ষক শিক্ষিত, ভদ্র, সংযত হরেনের প্রতি স্বভাবতঃই তিনি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। 'হরেন রোমান্টিক উপন্যাসের আদর্শ নায়ক। সে মেধাবী ছাত্র, বিদ্যোৎসাহী, শরীর চর্চায় উৎসাহী, পরোপকারী এবং হৃদয়বান্। হরেন গুণ্ডাদের শায়েস্তা করতে গিয়ে আহত হয়, পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মামলায় জড়িয়ে পড়ে, নিজের প্রাণ বিপন্ন করে জলমগ্ন নারীকে উদ্ধার করে, ক্রিকেট খেলায় গোরাদের হারিয়ে দেয়, শহরের ছেলেদের নেতৃত্ব করে।' এবং আশ্চর্য মনে হলেও হরেন বীরত্বের পুরস্কার-

স্বরূপ 'ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের Humane Society হইতে দুইটি মেডেল পাইয়াছিলেন।'

এ হেন পুরুষের প্রতি কোন শিক্ষিতা রমণী যে আকর্ষিত হবেন, এ তো খুব স্বাভাবিক। নয়নতারা স্পষ্টতঃই বলেছেন, 'এইরূপ পুরুষের আশ্রয়ে থাকতে হয়' (পৃ: ৫৭)। কিন্তু হরেনের একমাত্র অপরাধ, তাঁর জননী বিধবা হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় পরের বাড়ীতে রাঁধুনীগিরি করেছেন। সুতরাং উন্নাসিক সুরেশের কাছে তিনি স্বীকৃতির পরিবর্তে পেলেন অসহনীয় অপমান। নয়নতারার স্মৃতিকে বুকে বহন করেই হরেনকে চিরতরে বিদায় নিতে হয়েছে। দরিদ্রতার কারণে প্রেমের ফুলশর এইভাবে ব্যর্থ হয়েছে দেখে আমাদের মন ক্ষুব্ধ হয়। কারণ বংশ পরিচয়ের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন না। হরেনের মধ্যে আরও একটু ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হলে চরিত্রটি পূর্ণ হয়ে উঠত।

বাংলা উপন্যাসে তখনও গ্রাম্য নায়িকারা নানাভাবে প্রাধান্য পেয়ে আসছিলেন। বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা সঞ্চারে নয়নতারার ভূমিকা অগ্রগণ্য। সর্বগুণে গুণান্বিতা, কর্তব্য-পরায়ণা এই নারীর মানুষের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা। হরেনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাই ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল; এমন কি বিজ্ঞানেও। সুরেশের দেওয়া মাইক্রোস্কোপ তাঁকে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহী করে তুলেছিল। এই কাহিনী শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র বিজয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু মাইক্রোস্কোপই নয়, বিজয়াও এমনি করে তাঁর পাণিপ্রার্থীকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে বেশি করে মনে পড়ে।

নয়নতারার সঙ্গে হরেনের মিলন সুরেশের জেদে হতে পারে নি। নয়নতারার দুঃখ সে কারণে নয়। কিন্তু তাঁর 'অসার প্রেমের দ্বারা আবদ্ধ' হয়েছিলেন বলেই হরেনকে এত অপমান সইতে হয়েছে, এজন্য তাঁর অনুতাপের অন্ত নেই। হরেনের অপমান নয়নতারার বুকে বহুগুণিত হয়ে বেজেছে। হরেনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি নিজেকে মুঙ্গেরে নির্বাসিত করেছেন। গভীর ও সংযত প্রেমই তাঁর হৃদয়ে এই মহান্ ত্যাগের শক্তি এনে দিয়েছিল। প্রকৃতির সহবাসে তিনি তাঁর জীবনে অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন।

মনে প্রশ্ন জাগে, হরেনের সঙ্গে নয়নতারার বিবাহ কি সম্ভব ছিল না?

অন্য লেখক হলে হয়ত দিতেন। কিন্তু শিবনাথের উদ্দেশ্য উপন্যাসের কাহিনী রচনা নয়, আদর্শ চরিত্র স্থাপন করা। তাই নয়নতারা একই সঙ্গে প্রেমিক ও ধার্মিক। যে যুগে নারীদের মর্যাদা অসম্মানিত হচ্ছিল, সে যুগে এমন এক সর্বস্ব-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর চরিত্র কল্পনা করে শিবনাথ প্রাচীন যুগের আদর্শ-বাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

হরেনের প্রতি সুরেশের বিদ্বেষের কারণ কি তা আমরা জেনেছি। তাই নয়নতারাকে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করার জন্য তিনি তথাকথিত অভিজাত শিক্ষা-গর্বিত যুবক-বন্ধুদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে নয়নতারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা সকলেই নয়নতারার কাছে 'ছেপ্‌লা' আখ্যা পেয়েছেন। এমন একজন বিলাতফেরত বন্ধু ডাঃ ন্যাণ্ডে[১] —পিতৃদত্ত নন্দী পদবীর ইঙ্গবঙ্গীয় রূপান্তর। ন্যাণ্ডে সাহেবের রূপের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, (চতুর্থ পরিচ্ছেদ) তাতে নন্দরাণী, পটলার হাসি আসা তো স্বাভাবিকই, লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'তাহাকে দেখিলে হাসি রাখা দায়।' এমন একটি চরিত্র উপন্যাসে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করেছে,—প্রথমতঃ, নয়নতারার প্রেমের গভীরতা ন্যাণ্ডে-গোষ্ঠীর প্রতি বিকর্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখকের বিদ্রূপশক্তি শাণিত হয়ে উঠেছে। ডাঃ ন্যাণ্ডের গোত্রভুক্ত ব্যারিস্টার পি, ব্যানার্জীও 'ডিমটীতে অনেক তা দিলেন, কিন্তু ডিম ফুটিল না।' তাতে তাঁর ক্ষোভ ছিল না, কারণ ব্রত ছিল তাঁর ভ্রমরের পুষ্প চারণা। তবুও ব্যানার্জী সাহেবের মধ্যে কিছুটা ভদ্রতা-জ্ঞান ছিল। লেখক হয়ত এই চরিত্রটিকে ভিন্নভাবে রূপ দিয়ে উপন্যাসে প্রেমের ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব এনে কাহিনীকে আরও জটিল ও বেগবান করে তুলতে পারতেন। উনিশ শতকীয় ইংরেজি শিক্ষাধারার ছিন্নমূল অভিজাতদের এঁকে লেখক যুগ স্বরূপকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে উপন্যাসে এঁদের উপস্থিতি বরণীয়।

১। এই চরিত্রটিতে 'আত্মচরিতে' (পৃঃ ৫৫) বর্ণিত S. N. Dutt. নামক চরিত্রটির প্রভাব আছে মনে করি। তাছাড়া, জানি না মধুসূদনের প্রতি কোন কটাক্ষ আছে কিনা—অন্ততঃ ডাঃ ন্যাণ্ডের 'You see I am nearly forgetting my Bengali Grammer'-এই উক্তির মধ্যে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র (১৮৬৬) নিমেচাঁদ দত্তকেও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। অবশ্য ডাঃ ন্যাণ্ডে ও মধুসূদনের মুখের বুলি, খানাপিনা ও সুরাপ্রবণতা এই ক্ষেত্রে হয়ত এক, কিন্তু মানস আদর্শের দিক দিয়ে এঁরা সম্পূর্ণ ভিন্ন-জাতীয়।

॥ ৫ ॥

পরিণতির দিক থেকে 'নয়নতারা' শিবনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসের অন্যান্য শিল্প লক্ষণের দিক থেকে অপর উপন্যাসগুলির তুলনায় 'নয়নতারা' শ্রেষ্ঠতম। এর কারণ উপন্যাসে প্রেমের উপস্থিতি নয়, বরং চরিত্রাঙ্কন, ভাষাবিন্যাস, সংগঠন এবং কাহিনীর সাবলীল গতি উপন্যাসটিকে উনিশ শতকের একটি কাহিনী-কাব্য রূপে পরিণত করেছিল। গল্পপ্রধান এই উপন্যাসটিতে চরিত্রগুলি গল্পের স্রোতে আপন উদ্দেশ্যের দিকে অবিরাম-গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। পরিকল্পিত চরিত্রগুলি যে সর্বত্র বিকাশপ্রাপ্ত এমন বলি না, কিন্তু হরেন এবং নয়নতারাতে এই বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সর্বাধিক এবং তাঁরাই এই কাহিনীর কুশীলব।

পূর্ববর্তী উপন্যাস দুটির তুলনায় 'নয়নতারা'য় উপন্যাসগত ত্রুটি লক্ষণীয় মাত্রায় কমে গিয়েছে। 'নয়নতারা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার চার বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' উপন্যাসের ত্রুটিগুলি সবিস্তারে নির্দেশ করেছিলেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা ত্রুটিগুলি সম্পর্কে শিবনাথকে সচেতন করে দিয়েছিল বলেই গঠনের ক্ষেত্রে 'নয়নতারা' অধিকতর ত্রুটিমুক্ত। এছাড়া এটি শিবনাথের তৃতীয় বারের রচনা। বিশেষতঃ এটি যখন রচনা করছিলেন, তখন তিনি বহুল পরিমাণে অন্যান্য কর্ম থেকে অবসর ভোগ করছিলেন। রচনাকর্মে সিদ্ধিলাভের এটিও একটি কারণ।

'নয়নতারা' লেখকের সাধের সৃষ্টি। কিন্তু উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে দেখছি তারও অনাদরের সীমা রইল না। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'ও পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা। কিন্তু আদর্শ ও আবেদন ভিন্নতর ছিল বলে 'নয়নতারা' 'স্বর্ণলতা'র সমাদর লাভে সমর্থ হয় নি।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস : বিধবার ছেলে ও উমাকান্ত

॥ ১ ॥

শিবনাথ-রচিত চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস হিসাবে আমরা একই সঙ্গে দুখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করছি—'বিধবার ছেলে' ও 'উমাকান্ত'। প্রথমটির প্রকাশকাল ১৯১৬ এবং দ্বিতীয়টির ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। উপন্যাস দুটির নাম ভিন্ন এবং তাদের প্রকাশকাল পৃথক হলেও তাদের প্লট এক। গ্রন্থ দুটির ভূমিকায় আছে,—

'প্রায় পনের ষোল বৎসর পূর্বে "বিধবার ছেলে" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তৎপরে শরীর রুগ্নভগ্ন হওয়াতে তাহা ফেলিয়া রাখি। কবে চলিয়া যাই, এই ভাবিয়া পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করা গেল।'—শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'বিধবার ছেলে'র ভূমিকাংশ।

"আজ প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল প্রকাশিত "বিধবার ছেলে" একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ সেই আগেকার পাণ্ডুলিপি-খানি আমার হাতে পড়াতে আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম আগেকার লেখাটি উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু শরীরের গতিকে তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তখন আমি তাঁহার সেই লেখাটী যথাযথ নকল করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য লিখিতে লিখিতে আমি তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই লেখাটী সম্পূর্ণ করিলাম ; মাঝে মাঝে যে সকল জায়গায় অসংবদ্ধ দেখিয়াছি সে গুলি আমিই ঠিক করিয়া দিয়াছি। উনবিংশ পরিচ্ছেদটি আগাগোড়া আমারই লেখা···যাঁহারা সেই "বিধবার ছেলে" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন এই উপন্যাসের plot একরূপ হইলেও এইখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, এবং ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে ; যাহা পাঠ করিলে একেবারে চমৎকৃত হইতে হয়। এই উপন্যাসের নায়ক "উমাকান্ত", তাই তাহারই নামে এইখানি প্রকাশ করা হইল। পিতৃদেবের ভাব ও ভাষা যথাযথ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি···।"—'উমাকান্ত' উপন্যাসে শিবনাথ-পুত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য লিখিত ভূমিকা।

এই দুই ভূমিকা থেকে বোঝা যায়, উপন্যাস দুটি আসলে একই রচনার ভিন্ন রূপ মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ আছে। প্রথম তিনটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি বা ভিন্ন পাঠের অভাবে আমরা এ কাজ করতে পারি নি। এই তুলনামূলক আলোচনা শিবনাথের সাহিত্য-ধারণা, রচনা সংস্কারের কারণ ও রচনার উৎকর্ষানুৎকর্ষ বিচার করার ব্যাপারে আলোকপাত করবে।

ভূমিকা দুটি থেকে যে সকল তথ্য আমরা পেলাম, সেগুলি এই প্রকারের।—

১। মূল রচনাটি (উমাকান্ত) ১৮৯৯ বা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি লেখা শুরু হয়েছিল;

২। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসটি মূল রচনার পরিবর্তিত রূপ;

৩। 'বিধবার ছেলে' শিবনাথের মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল;

৪। ১৯১০ সাল নাগাদ, অর্থাৎ প্রকাশের প্রায় চার বছরের মধ্যে 'বিধবার ছেলে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

৫। প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মূল পাণ্ডুলিপিটি যথাযথ নকল করতে গিয়েও 'অসংবদ্ধ' অংশগুলি নিজেই সংশোধন করেছিলেন;

৬। 'অসমাপ্ত' 'উমাকান্ত' উপন্যাসের শেষ (উনিশ) পরিচ্ছেদটি প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত;

৭। প্লট এক হওয়া সত্ত্বেও উভয় উপন্যাসে বহু পার্থক্য আছে;

৮। 'উমাকান্ত' নামকরণ প্রিয়নাথ-কৃত; শিবনাথ-কৃত নয়।

এই আট প্রকার তথ্য ব্যতীত আরও কয়েকটি তথ্য শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি—আমরা সেগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করছি।

'বিধবার ছেলে' শিবনাথের মনোনীত রচনা এবং তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত। সেদিক থেকে 'উমাকান্ত' অপেক্ষা 'বিধবার ছেলে'র গুরুত্ব অধিক। 'উমাকান্তে'র গৌরব রচনাটি প্রাথমিক বলে। কিন্তু স্পষ্টতঃই এটি শিবনাথ প্রকাশ করতে চান নি। তাছাড়া, প্রিয়নাথ নিজে উনিশ পরিচ্ছেদটি লিখেছিলেন বলে 'উমাকান্ত' শিবনাথের একান্ত নিজস্ব রচনা হওয়ার গৌরব কতকটা হারিয়েছে। প্রিয়নাথ উপন্যাসের নায়কের

নামানুসারে (অথচ 'বিধবার ছেলে'র নায়কের নাম মহেশ) 'উমাকান্ত' নামকরণ করেছেন বটে, কিন্তু শিবনাথ তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে বার বার রচনাটিকে 'বিধবার ছেলে' নামে উল্লেখ করেছেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, মূল উপন্যাসটির রচনা সম্ভবত: ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু নানা কারণে এটি সম্পূর্ণ করতে দেরী হয়েছিল। অনুমান হয়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত ধীরে ধীরে লেখার পর শিবনাথ এটিকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন,—'অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে "বিধবার ছেলেটা" rewrite করা আবশ্যক মনে হইতেছে।' (অপ্রকাশিত ডায়েরী, ২৯.৭.১৯১৩)।'

এই দীর্ঘ ১৩।১৪ বছরের মধ্যে প্রায়শই তিনি উপন্যাসটি সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন,—" "বিধবার ছেলে" নামক যে উপন্যাসটি আরম্ভ করিয়া রাখিয়াছি তাহা শেষ করিতে হইবে।"[১] আবার লিখেছেন, "'বিধবার ছেলে'র যতটুকু লেখা হইয়া আছে, তাহা পাঠ করি। এই খানি আর এক মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।"[২] পরে লিখেছেন, "'বিধবার ছেলে'। এখানা মাঘোৎসবের মাসে অর্থাৎ আর এক মাসের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা। মাঘোৎসবের পরেই ছাপিতে হইবে।"[৩] এইভাবে রচনা অগ্রসর হওয়ার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখে 'বিধবার ছেলে'র দশম পরিচ্ছেদ রচনা সমাপ্ত হয়—'বিধবার ছেলে'র দশম পরিচ্ছেদ শেষ করি।' ১৪ই জুলাই ১৯০৪ নাগাদ আরও একটি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়—'বিধবার ছেলের অনেকটা লিখি। একটা পরিচ্ছেদ শেষ করি।' আরও বহু পরে লিখেছেন, 'বিধবার ছেলে নামক novel অর্ধেক লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহা শেষ করা উচিত।"[৪] এই সময় পর্যন্ত অন্তত: রচনাটির পরিবর্তন-পরিবর্ধন শুরু হয় নাই।

'বিধবার ছেলে'কে পরিবর্তিত আকারে রচনার পরিকল্পনা শিবনাথ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই করে আসছিলেন। যদিও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে তা কার্যে রূপায়িত হয় নি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শিবনাথ কাউন্ট

১। শিবনাথ শাস্ত্রীর অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ ১.৯.১৯০৩।
২। তদেব, ২৭.১০.১৯০৩।
৩। তদেব, ১৮.১২.১৯০৩।
৪। তদেব, ২২.৮.১৯১৩।

টলষ্টয়ের জীবনচরিত পাঠ করেছিলেন। টলষ্টয়ের জীবনের নানা কাহিনী শিবনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি দেশের যুবক সম্প্রদায়কে টলষ্টয়ের জীবনের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। মুখ্যতঃ টলষ্টয়ের সংস্কার-মূলক আন্দোলনকে উপন্যাসে অনুপ্রবিষ্ট করার জন্য শিবনাথ 'বিধবার ছেলে'র মধ্যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।[১] ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই 'rewrite-এর ইচ্ছা সমধিক প্রবল হয়ে ওঠে। অবশ্য এর পূর্বে 'অর্ধলিখিত উপন্যাসখানি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনখানি' বই হিসেবে প্রকাশের ইচ্ছাও একবার করেছিলেন।[২] এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত আকারে ১৯১৬ (বাংলা ১৩২২) খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়।

॥ ২ ॥

প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন যে উভয় উপন্যাসের প্লট একই প্রকার। আমরাও সেকথার সমর্থন করি। কিন্তু বক্তব্য-বিষয় এক হলেও প্রকাশের ভঙ্গি ভিন্ন। তাছাড়া চরিত্রগুলির নামেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যেমন আছে তাদের প্রকৃতিতে স্বল্প পার্থক্য। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের নায়ক মহেশ হরিরামপুর নামে একটি গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কঠোর দারিদ্র্য ও নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু চরিত্র উপন্যাসে এসে ভীড় করেছে। এঁদের অধিকাংশই বহুবিধ সমাজ সেবায় উৎসাহী। 'উমাকান্ত' উপন্যাসের নায়ক উমাকান্ত একই প্রকার উপায়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কাজেই প্লটের দিক থেকে গল্পদুটি একই প্রকারের।

'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের নায়ক মহেশ পূর্বে ডাংপিটে ছিলেন ; কিন্তু বর্তমানে শান্ত এবং পরোপকারী। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি, লাইব্রেরী স্থাপন, আত্মোন্নয়ন—তাঁর জীবনের ব্রত। স্বগ্রাম হরিরামপুরের ব্রজনাথ দত্ত এ ব্যাপারে মহেশের প্রধান উৎসাহদাতা। ছোট ভাই গিরিশ পড়াশুনোয় মনোযোগী হলেও সে সংস্কারপন্থী ছিল না। তাই ভ্রাতৃজায়া ক্ষীরদার পড়াশুনো ও অবগুণ্ঠনহীনতা তাকে পীড়া দিয়েছে। মহেশের

১। তদেব, ২১.৫.১৯০৯।
২। অপ্রকাশিত ডায়েরি, ১৯.৮.১৯১১।

পিস্তুতো বিধবা ভগিনী নিস্তারিনী মহেশের সংসারে প্রতিপালিতা। মহেশ চাকুরীসূত্রে বহরমপুরে এলে সেখানকার এক ডাক্তার রমণীমোহন ভদ্র নিস্তারিনীর প্রতি আসক্ত হন এবং বহু প্রতিবন্ধকতার পর উভয়ের বিবাহ সংঘটিত হয়। ইতিমধ্যে মহেশের নিয়োগকর্তা জমিদার দেবীপ্রসাদবাবু ও তাঁর মাতা উভয়ে মহেশকে তাঁর নানা উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আর্থিক সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। এর পরে মহেশের বীণাপাণি নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সে বয়োপ্রাপ্তা হলে বহুজনে তার প্রতি আসক্ত হয়, কিন্তু বীণাপাণি পিতার প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বশতঃ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে চাইল না। নানা সৎকর্মানুষ্ঠানের পর মহেশের মৃত্যুর সঙ্গে উপন্যাসের যবনিকাপাত ঘটেছে।

ষোলটি পরিচ্ছেদে রচিত 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের এই ঘটনা 'উমাকান্তে'র উনিশটি পরিচ্ছেদে একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে—যদিও উভয় ক্ষেত্রেই বক্তব্য এক। ডাংপিটে ছেলে উমাকান্ত মাতুলের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর গ্রামের ত্রিলোচন ঘোষ মহাশয় প্রভৃত সহায়তা করেছেন। ধীরে ধীরে উমাকান্ত অধ্যবসায়ের গুণে প্রচুর পড়াশুনো করেছেন এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বহু দানধ্যান, সমাজ-সংস্কার ও লোকহিতে ব্রতী হয়েছেন। বিনোদিনী নামক এক পতিতা কন্যার সঙ্গে উমাকান্তের আশ্রয়দাতার আত্মীয় নরেশের প্রেমের উপকাহিনী উপন্যাসে গতিদান করেছে। ভ্রাতা শ্যামাকান্ত প্রাচীন মতাবলম্বী। তিনি প্রথম পত্নীকে ত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। 'বিধবার ছেলে'-র মতই এখানেও উমাকান্তের কন্যা লীলা কিশোরীলাল গাঙ্গুলী নামক এক মুন্সেফের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত পিতার সেবার কারণে বিবাহে সম্মত হয় নি। যদিও প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য স্বলিখিত শেষ পরিচ্ছেদে উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়েছেন। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসে শিবনাথ এই প্রকারের বিবাহ দেন নি। তাছাড়া 'বিধবার ছেলে' বিয়োগান্ত ও 'উমাকান্ত' মিলনান্তক উপন্যাস।

'উমাকান্ত' উপন্যাসকে প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য 'বিধবার ছেলে' উপন্যাস অপেক্ষা 'উত্তম' বলেছেন,—যদিও শিবনাথ মূল রচনাটিকে সম্ভবতঃ আরও উৎকর্ষদানের জন্য পুনর্লিখন করেছিলেন। বাংলা দেশের যুবকগণকে সৎকর্মে উৎসাহদানের ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই শিবনাথ উপন্যাসটিকে সংশোধন করেন। ফলে উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নীতিপ্রচারের বাহন হয়ে

দাঁড়িয়েছে। 'উমাকান্ত'-উপন্যাসে যে নীতিপ্রচার নেই, তা নয়, কিন্তু 'বিধবার ছেলে'র প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই মহেশের সহসা পরিবর্তন পাঠক-মনকে পীড়া দেয়। বিধবাদের জন্য চাঁদা-সংগ্রহ, বার-ইয়ারি পূজার ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষের চাঁদা আদায় ইত্যাদি সৎকর্মে ডাংপিটে মহেশের ত্বরিত পরিবর্তনে তার চরিত্রের বিকাশটি বেশ ফুটে উঠে নি। অথচ 'উমাকান্ত' উপন্যাসে দীর্ঘ চার পরিচ্ছেদে এই মানসিক পরিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। তার পরে মাত্র লাইব্রেরী গঠনের মধ্য দিয়েই তার জ্ঞানস্পৃহার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অনেক পরে সপ্তম পরিচ্ছেদে উমাকান্তকে স্বদেশহিতব্রত সাধনে আত্মনিয়োগ করতে দেখি। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসে মহেশের ভ্রাতা গিরিশের চরিত্রে 'যুগান্তর' উপন্যাসের কৃষ্ণকামিনীর মাতুল শ্যামচাঁদ মিত্রের চরিত্রের সাক্ষাৎ প্রভাব লক্ষ্য করি। গিরিশ প্রাচীন সমাজকে রক্ষার জন্য নিস্তারিণী-ডাঃ ভদ্রের মিলনে বাধা দিয়ে শ্যামচাঁদ মিত্রের মতই নিস্তারিণীকে অপহরণ করে কাশীতে প্রেরণ করে। এবং বহু পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আচার্যত্বে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়। 'উমাকান্ত' উপন্যাসে উমাকান্তের ভ্রাতা শ্যামাকান্ত 'যুগান্তরে'র শ্যামচাঁদের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে ওঠেনি। শ্যামাকান্তের চরিত্রে যাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করি তিনি শশধর তর্কচূড়ামণি। শ্যামাকান্ত 'বৈজ্ঞানিক হিন্দু, নিজে বৈজ্ঞানিক টিকি রাখিয়াছে, গীতার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বাহির করিয়াছে।' এই প্রকারের চরিত্রের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ 'উন্নতি লক্ষণ' কবিতাটি লিখেছিলেন। অবশ্য "শ্যামাকান্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দু হইলেও, কিম্বা খুব সম্ভব হইবার ফলেই সুরা পান করে, বাই নাচ প্রভৃতি দেখে, প্রথমা পত্নী থাকিলেও দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াছে—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়—সে নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া থাকে।'[১] শ্যামাকান্ত একটি আকর্ষণীয় চরিত্র।

দুটি উপন্যাসেই যে প্রেমের পার্শ্বকাহিনীগুলি রয়েছে সেগুলি সেকালের সমাজের পটভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও একালের পটভূমিকায় অনেক ফ্যাকাশে। বিধবা-বিবাহ, পতিতা-বিবাহ ইত্যাদি আদর্শ প্রচারের জন্য সেকালের লেখকগণ উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বন করতেন। কিন্তু একটি

১। প্রমথনাথ বিশী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ; ২২২-২৩।

বিশেষ কারণে এখানের প্রেমকাহিনীর কোন কোনটি উল্লেখ যোগ্য। তা হল মাতা কর্তৃক পুত্রের পতিতা-বিবাহ সমর্থন। যদিও এই সমর্থন তখনকার দিনের পক্ষে অবাস্তব বলে মনে হয়। পিতা কর্তৃক কন্যার পাত্র-নির্বাচনে সম্মতিদানের ঔদার্যের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। শিবনাথ ব্যক্তিগত জীবনে এ ব্যাপারে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। আপন কন্যাগণের বিবাহ তিনি তাঁদের স্বনির্বাচিত পাত্রে দিয়েছিলেন।

উপন্যাস দুটির অন্যান্য চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন। বরং বলা চলে মহেশ বা উমাকান্তের বিচিত্রমুখী কর্ম ও প্রতিভাকে রূপ দানের সূত্রেই তারা আবির্ভূত হয়েছে এবং তাঁদেরকে সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করে একে একে বিদায় নিয়েছে। ফলে দুটি রচনার মধ্যেই উপন্যাসের ধর্ম অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে, যদিও বিধবার ছেলে অপেক্ষা উমাকান্তকে অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক ও 'উত্তম' রচনা বলে মনে হয়।

॥ ৩ ॥

শিবনাথের উপন্যাসের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নানা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের উল্লেখ। যদিও কোন উপন্যাসই ঐতিহাসিক নয়, তবুও উপন্যাস-গুলিতে শিবনাথের আপন কালের ও আপন জীবনের বহু ঘটনা অবলীলাক্রমে স্থান পেয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ত্রুটি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, ঔপন্যাসিক শিবনাথের চরিত্র সহসা ঐতিহাসিকের চরিত্রে পর্যবসিত হয়। 'যুগান্তর' উপন্যাসে এই পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করেছি। 'বিধবার ছেলে' ও 'উমাকান্ত' উপন্যাসে এই প্রকারের সমসাময়িক ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্রের বহুল উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বহু উল্লেখ ও প্রভাব উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় এবং এঁরাই উপন্যাসের আবহাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। বিধবা-বিবাহ প্রচার ও নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজনীয়তা, বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্মের প্রচার, গ্রন্থাগারের প্রসার ইত্যাদি এঁদের চরিত্রেরই প্রত্যক্ষ ফল। এঁদের চরিত্রে শিবনাথ যে প্রাচীন-নবীনের দ্বন্দ্বকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই উপন্যাসে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রত্যক্ষতা এত বেশি ছিল যে, উপন্যাসে তার রূপদান বহুলাংশে অসার্থক হয়ে গেছে। ব্যক্তি প্রভাব ব্যতীত

সমসাময়িক নানা ঘটনার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'উমাকান্ত' উপন্যাসে নরেশ-বিনোদিনীর প্রেমকাহিনী ও পরিণয়ের উপর যোগেন-মহালক্ষ্মীর কাহিনীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে নায়ক-চরিত্র মহেশ বা উমাকান্তের চরিত্রেই তৎকালীন বহু ব্যক্তির চরিত্রের নানা প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখি। এই মিশ্রণ যদি রাসায়নিক হত, তাহলে হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবকে বিচার করা সম্ভব হত না; যেমনটি হয়েছে 'নয়নতারা' উপন্যাসে। কিন্তু এখানে ভৌতিক মিশ্রণের কারণে নায়ক চরিত্রে নানা প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। হরানন্দ বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীনচন্দ্র রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এই চরিত্রে নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। কিন্তু সর্বাধিক পরিমাণে যে ব্যক্তিটি প্রায়শঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তিনি শিবনাথ স্বয়ং। বক্তব্যের সমর্থনে আমরা কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করছি :—

১॥ '···মহেশের বিনোদনের আর একটা উপায় আছে। শৈশব হইতেই পশু পক্ষী পুষিবার বাতিকটা আছে।'—বিধবার ছেলে, পৃ: ১৪।

২॥ অষ্টাদশবর্ষীয় ভ্রাতা গিরিশের বিবাহে আপত্তি জানিয়ে মহেশ বলেছেন, 'মা, আমি বাল্যবিবাহে পক্ষ নই।' তদেব, পৃ: ৪৯।

আত্মচরিতের পাঠক জানেন এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় শিবনাথেরও ছিল।

৩॥ 'পূর্বপাড়ায় মহেশের পিসা শ্রীধর তর্করত্নের বাস···প্রথম কন্যাটি বিধবা, নাম নিস্তারিণী।' এই নিস্তারিণীকে দেখে মহেশের পত্নী ক্ষীরদা বলেছেন, 'উনি যে বিধবা বিবাহের এত পক্ষ তা বোধ হয় এঁকে দেখে।'—এঁর সঙ্গে 'আত্মচরিতে' (পৃ: ৭২—৭৩) উল্লিখিত 'মাসীর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী'র প্রসঙ্গ তুলনীয়।

৪॥ উমাকান্ত যখন কলকাতায় পড়তেন তখনকার তাঁর বাসার পরিচয়,—সেখানে 'কতকগুলো চাকুরে পুরুষ, তাদের পালা করে রাঁধবার কথা, কিন্তু অধিকাংশ দিন এই হতভাগারা তামাক খেয়ে গল্প করে, ইয়ারকী দিয়ে কাটাত, আর ঐ বেচারাকে দিয়ে রাঁধাত।' —'উমাকান্ত', পৃ: ১৭। এর সঙ্গে তুলনীয় : শিবনাথের অবস্থা 'আমি সেই পুরুষের দলে পড়িয়া রাঁধি, বাসন মাজি এবং কোনো প্রকারে নিজের পড়াশুনো করি।'[১]

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ: ৫১ ও ৫৪।

৫॥ ডাংপিটে উমাকান্তের 'পাখী ধরিবার…কৌশল' প্রসঙ্গে শিবনাথের বহুশ্রুত পক্ষীপ্রেমের কথা মনে পড়ে।[১]

৬॥ ঠাকুর পুজো নিয়ে উমাকান্ত ও তাঁর মাতার তর্ক-বিতর্ক (পৃঃ ৪১) শিবনাথের ঠাকুর পূজায় অসম্মতির কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়।

৭॥ শিবনাথের মত উমাকান্তকেও বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ীর লোকের সম্মুখে অপমান সইতে হয় (পৃঃ ৬০)।

৮॥ ভ্রাতা শ্যামাকান্ত দ্বিতীয় বার বিবাহে উদ্যোগী হলে উমাকান্ত যে চিঠিখানি লিখেছিলেন (পৃঃ ১০৮-৯), তার বক্তব্যের সঙ্গে হরানন্দ বিদ্যাসাগরকে উক্ত দ্বিতীয় বিবাহে অনিচ্ছুক শিবনাথের কথাবার্তাগুলির মিল দেখি।[২] নরেশ যে বিনোদিনী নাম্নী পতিতার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন, শিবনাথ স্বজীবনে তাঁকে চিনতেন। বিনোদিনীর আসল নাম থাকমণি।[৩] পতিতা কন্যা লক্ষ্মীমণিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।[৪] অধিক উদাহরণ উদ্ধারের প্রয়োজন দেখি না।

অবশ্য মহেশ বা উমাকান্তের সমাজ হিতৈষণার পশ্চাতে শিবনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের প্রভাবও ছিল বলে অনুমান করি। 'শশিপদবাবু শ্রমজীবীদিগের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহাদের পরিবারস্থ লোকেরা তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিত। ইঁহারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে কত লোক সুরাপান ত্যাগ করে এবং অসচ্চরিত্রতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে; শ্রমজীবী পরিবারের মহিলারা সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত'।[৫]

শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীকে অন্যত্র আমরা তাঁর 'দ্বিতীয় আত্মচরিত' বলে অভিহিত করেছি। 'উমাকান্ত' বা 'বিধবার ছেলে'কে তৃতীয় আত্ম-

১। তদেব, পৃঃ ৩০-৩১।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৬৭।

৩। তদেব, পৃঃ ১৩৪-৩৬।

৪। তদেব, পৃঃ ১২৩।

৫। শশিভূষণ বসু, বঙ্গে শ্রমজীবী শিক্ষার প্রথম কথা, সুপ্রভাত, ৪র্থ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩১৭, পৃঃ ৫৫২।

চরিত বলা চলে না—কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'কে যেমন তাঁর ছদ্ম-জীবন-চরিত বলা হয়ে থাকে, তেমনি এই উপন্যাসদ্বয়ও শিবনাথের ছদ্ম-জীবনচরিত। উপন্যাস হিসাবে রচনা দুটির সার্থকতা সামান্যই, কিন্তু আত্মচরিত রচনা কালেই নিজেকে এবং নিজের যুগকে উপন্যাসে দেখার প্রয়াস হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক সিদ্ধি শিবনাথের করায়ত্ত ছিল না। তাছাড়া উদ্দেশ্য-সর্বস্ব রচনার যে পরিণতি ঘটে, এতে তার ব্যতিক্রম হয় নি। এমন কি শিবনাথ-কন্যা হেমলতা দেবীও 'বিধবার ছেলে' পাঠ করে নায়কের এই পরিণাম দেখে সখেদে বলেছিলেন,[১] 'তাঁর শেষ বয়সের রচনা সাধুকার্যের নেশায় এই বইখানি লিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে আমাকে একখানি দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার বিধবার ছেলে কেমন লাগিল? আমি বলিলাম, "বাবা এ কি রকম? তোমার উপন্যাসের নায়ককে কেন ভাল কাজের ঝাঁকামুটে করিয়াছ? কেবল রাশি রাশি সৎকর্ম মাথায় করিয়া বেড়ায়?" বাবা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন,—"ঐ ভাবই আমায় পেয়ে বসেছে! তাই ত বইটা ভাল হয় নাই তুমি ঠিক বলেছ।" আমরাও এই উক্তির প্রত্যুক্তি করি।

শিবনাথ নিজে এই সকল সামাজিক সমস্যার কথা ভাবতেন ও রচনায় তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। 'শিবনির্মালা' নামক কবিতা সংকলনে সংকলিত 'বিধবার ছেলে' কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

১। হেমলতা দেবী, শিবনাথ জীবনী, পৃ. ৩০৩।

পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাস-কথা

শিবনাথ-রচিত বিভিন্ন উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেগুলির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে নানা মন্তব্য করেছি। এবার সামগ্রিকভাবে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল্যায়ণ এবং তাঁর কাহিনীগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। তত্ত্বগতভাবে এটা সত্য যে, সমাজ ও জীবনের গুরু-গম্ভীর বিষয়গুলি যেমন উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে, তেমনি তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ দিকগুলি নিয়েও উপন্যাস লেখা যেতে পারে। এক কথায়, উপন্যাসের সাহিত্যিক সার্থকতা শুধু বিষয়ের মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার্য যে, সমাজ ও জীবনের জটিল ও গুরু-গম্ভীর সমস্যাগুলি যদি কোন উপন্যাসে বিবৃত হয়, তবে বিষয়গত কারণেও তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ম্যাথু আর্নল্ড সেকারণেই বিষয়-মাহাত্ম্যের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিবনাথ যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলি পরিবার ও সমাজকেন্দ্রিক ; পরিবারের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জীবনের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস তিনি তাদের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। -তাঁর কোন উপন্যাসেই বিষয় বা সমস্যাগত তুচ্ছতা ও লঘুতা নেই। বস্তুতঃপক্ষে তিনি ছিলেন জীবনের ও সমাজের সত্যদ্রষ্টা, তাই তাদের লঘু উপকরণের উপর জোর না দিয়ে তাদের কতকটা গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেখবার চেষ্টা করেছেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি, তাঁর অনেকগুলি উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সেকালের যুগজীবন ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, তাঁর উপন্যাসগুলি বিষয়-গৌরবে যথার্থই গৌরবান্বিত।

তবে পূর্বেই বলেছি, উপন্যাসের সার্থকতা শুধু বিষয়-গৌরবের উপর নির্ভর করে না। তার জন্যে চাই সমগ্র জীবনকে ধরবার উপযুক্ত সাংঘটিক দৃষ্টিভঙ্গি (Synthetic outlook)। জীবনের গ্রন্থচ্ছেদ বা সমাজের খণ্ডচিত্র যদি উপন্যাসে থাকেও তবু তার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকতা বা অখণ্ডত্বের একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব ঔপন্যাসিককে গ্রহণ করতে হয়। সেজন্যে উপন্যাসিকের পক্ষে সাংঘটিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিবনাথের উপন্যাসগুলির কাহিনী, মর্মার্থ ও চরিত্র মিছিল আমরা পূর্বে

যতটুকু ব্যাখ্যা করেছি, তা থেকেই বোঝা যায় যে, তাঁর চোখে কোন চরিত্রই সমাজ-নিরপেক্ষ, যুগ-নিরপেক্ষ বা পরিবার-নিরপেক্ষ একটা খণ্ড-সত্তা মাত্র নয়। পরিবারের আওতায়, সামাজিক আবহাওয়ায় তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি আবির্ভূত ও বর্ধিত হয়েছে—তাই বর্ণিত জীবনের একটা পরিপূর্ণ রূপরেখা তিনি উপন্যাসগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। সেদিক থেকে তাঁর উপন্যাসগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন উঠবে, প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যে জীবনের যে সব খণ্ড খণ্ড চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন, সেগুলিকে মনস্তত্ত্ব ও শিল্পসম্মতভাবে অন্বিত করে তিনি জীবনের সামগ্রিকতার ছবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কিনা? মনে রাখতে হবে, শিবনাথ যখন উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন, তখনও বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সগৌরব আবির্ভাব ঘটেনি। 'চোখের বালি'তে কবিগুরু মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী লিখে আধুনিক উপন্যাসে যে নতুন পর্বের সূচনা করেন, তাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করার সুযোগ শিবনাথের ছিল না। এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁর শিল্পিমানস ও শিল্পিপ্রতিভা তার উপযুক্তও ছিল না। সেকারণে জীবনের প্রতি স্তরের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে ক্রম-বিকাশের সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করার কোন প্রয়াস এবং সেই ঐক্যসূত্রে জীবনের খণ্ডচিত্রগুলিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত করার কোন শিল্পকৌশল আমরা শিবনাথের উপন্যাসে লক্ষ্য করি না; সেজন্যেই তাঁর উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির বিভিন্ন পর্বের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিতে অনেক ফাঁক ধরা পড়ে। গভীর মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধ নিয়ে তিনি যদি অগ্রসর হতেন, তবে স্বভাবতঃই সে ফাঁকগুলি ভরিয়ে তুলতে পারতেন। সেই ফাঁক আমরা 'যুগান্তর' ও 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসে স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করি। তবে শিবনাথ এটা জানতেন যে, উপন্যাস-বিধৃত জীবন-কাহিনীর মধ্যে সাধারণভাবে একটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় এবং জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে ঠিকমতো সাজানোর উপরেই সেই ধারাবাহিকতা নির্ভর করে। সুতরাং মনস্তত্ত্বভাবে বা শিল্পসম্মতভাবে জীবন-কাহিনীর ক্রমবিকাশে অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রটি যদি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে নাও পেরে থাকেন, তবু জীবনচিত্রের সুবিন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাহ্যতঃ একটা একমুখীনতার ঢঙ্ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অবশ্য যেখানে তা পারেন নি (যেমন 'যুগান্তর' উপন্যাসে) সেখানে কাহিনীও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেছে।

উপরে উপন্যাসের ক্ষেত্রে জীবনের যে রূপসমগ্রতার কথা বললাম, তা যে প্লট সংগঠনের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'যুগান্তর' উপন্যাসে প্লট সংগঠনে ত্রুটি আছে বলেই জীবন-চিত্রও দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, 'নয়নতারা'র প্লট সংগঠন অনেক বেশি দৃঢ়বদ্ধ। উপন্যাসটিতে কয়েকটি পরিবার জড়িত। কিন্তু সেই পরিবারগুলি নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও বিবিধ কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ পরিবারের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদি কাহিনীর বয়ানের মধ্যে শিথিলতা থাকত, তবে বিভিন্ন পরিবারের কাহিনী বিভিন্নমুখী হয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুটিকে বিপর্যস্ত করে দিত। সেক্ষেত্রে আরম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত কোন স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন একমুখীনতার ভাব বজায় থাকত না। 'মেজবউ' একদিক থেকে 'নয়নতারা'র চেয়ে দৃঢ়বদ্ধ, কারণ তার কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা নেই, একটি মাত্র পরিবারকে আশ্রয় করে উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ঘটনাবিরলতা ও উপকাহিনীর অভাব আছে বলে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি সহজে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, উপন্যাসে যেখানে ঘটনা জটিল এবং নানা উপকাহিনীর বিচিত্র স্রোত যেখানে প্রবাহিত, সেখানেই দৃঢ়বদ্ধ প্লট সংগঠনের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। 'যুগান্তর' উপন্যাসটি যে দ্বিখণ্ডিত বলে মনে হয়, তার জন্য উপকাহিনীর অনুপযুক্ততা দায়ী নয়, তার জন্য দায়ী হচ্ছে কেন্দ্রীয় চরিত্র, স্থানপটভূমি ও জীবন-সমস্যার পরিবর্তন। কাহিনীর সেই দুই ভাগকে কোন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দী করার কোন চেষ্টা শিবনাথ করেন নি বলে উপন্যাসটির মধ্যে সাংগঠনিক ত্রুটি থেকে গেছে। 'নয়নতারা' উপন্যাসে সৌদামিনী-গোবিন্দ ঘটিত যে উপকাহিনীটি আছে, তা যে নয়নতারা-হরেন্দ্র-কেন্দ্রিক মূল কাহিনীটির পরিস্ফুটনে কোন সাহায্য করে নি, এটা পূর্বেই দেখিয়েছি। মনে হয়, সামাজিক জীবনের কাহিনীর মধ্যে একটি প্রেমচিত্র যোগ করতে গিয়ে শিবনাথ এই উপকাহিনীটির অবতারণা করেছেন।

উপন্যাসে প্লট বড় না চরিত্র প্রধান, এই পুরনো প্রশ্ন না তুলেও চরিত্রের গুরুত্ব স্বীকার করা যেতে পারে। ঔপন্যাসিকের সার্থকতা চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। শিবনাথ ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ, ধর্ম-বুদ্ধি ও নীতি-চেতনা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান নিহিতার্থ। সেজন্য তাঁর উপন্যাসে আদর্শবাদী ও নীতিবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আনাগোনা

প্রায়শঃই লক্ষ্য করা যায়। 'মেজবউ'-এর কর্তামশায়, 'যুগান্তরে'র বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এবং 'নয়নতারা'র রায় মহাশয় আদর্শ চরিত্রের মানুষ। তাঁরা উপন্যাসের রাজ্যে যতক্ষণ বিরাজ করেছেন, ততক্ষণ স্থির আলোক বিন্দুর মতই কিরণ বিতরণ করেছেন। এই সমস্ত চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে আদর্শবাদ যতই থাকুক না কেন, জীবন্ত চরিত্রের রূপ-পরিবর্তনশীলতা ও বিকাশ-মুখীনতা প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু আদর্শ চরিত্রও যদি ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারে তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠা কতকটা স্বীকার করা যায়। যেমন, 'যুগান্তরে'র বিশ্বনাথ তর্কভূষণ অনেকটা স্থির চরিত্র হয়েও আপন ব্যক্তিত্বের জোরে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে 'নয়নতারা'র গোবিন্দ, 'উমাকান্ত' উপন্যাসের উমাকান্তে আমরা একটা পরিবর্তন দেখতে পাই, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মন্দ থেকে তাঁরা ভালোর দিকে এগিয়ে গেছেন। জীবন্ত চরিত্রের মধ্যে যে ধরণের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস থাকে, এঁদের মধ্যে তা আছে বলেই পাঠকের মনস্তুষ্টি সাধনে তাঁরা অধিকতর সমর্থ। শিবনাথের উপন্যাসে মন্দ-চরিত্রও আছে, যাদের কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন, 'যুগান্তর' উপন্যাসের মাতঙ্গিনী। এ জাতীয় চরিত্র-চিত্রণে শিবনাথের কিছুটা ক্ষমতা ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, শিবনাথের উপন্যাসের অনেক চরিত্রই 'বর্ণিত', ঠিক 'সৃষ্ট' নয়। তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা চলাফেরা ও কথাবার্তা বলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের খুব বেশি অভিব্যক্তি ঘটেনি। ফলে শিবনাথকে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে চরিত্র সম্পর্কে নানা বিবরণ দিতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে, উপন্যাস হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্র, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সেখানে জীবন রূপ লাভ করে। ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে শুধু জীবন-কাহিনীর হারানো সূত্র ধরিয়ে দেন। খুব আদর্শবাদী লেখকের হাতে এটা হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক।

পরিশেষে শিবনাথের ভাষাভঙ্গি সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। তাঁর ভাষায় কষ্টকরতার কোন চিহ্ন নেই, প্রসাধন-কলার সচেতন প্রয়াস নেই তিনি নিরলঙ্কার ছোট ছোট বাক্যে সহজভাবে মানুষের কাহিনী বিবৃত করেছেন। সংলাপ খুব তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও তাতে কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ নেই। এক কথায়, শিবনাথের ভাষাভঙ্গি তাঁর উপন্যাসের সার্থকতার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি।



শিবনাথ শাস্ত্রী

আনুমানিক ১৯০৪ সালে)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাবন্ধিক শিবনাথ

প্রথম অধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধাবলী

॥ ১ ॥

শিবনাথের প্রবন্ধগুলি নানা বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত। উনিশ শতকে বাংলা দেশে যে সার্বিক পরিবর্তনের খসড়া চলছিল, সেখানে শিবনাথের ভূমিকা ছিল দ্বিবিধ। তিনি একদিকে নট হিসাবে সে-পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করেছেন, অন্য দিকে দর্শক হিসাবে তার রূপ-রেখা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁর সেই দ্বিবিধ ভূমিকার পরিচায়ক।

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধসমূহকে বিষয়ানুযায়ী তালিকাবদ্ধ করতে যাওয়ার মধ্যে একটু ঝুঁকি আছে। কারণ, তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। আর প্রগতিবাদী ব্রাহ্মসমাজের মূল কথাই ছিল, ধর্মকে সমাজের মত করে তোলা এবং সমাজকে ধর্মমুখীন করা। সামাজিক উন্নতি হলে তবেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব—এই ছিল প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের বিশ্বাস। শিবনাথও সেই প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজেরই একজন ছিলেন। যে প্রাণের গরজে তিনি সমাজকর্মী ও ধর্মনেতা হয়েছিলেন, সেই প্রাণের গরজেই তিনি সাহিত্যসেবকও হয়েছিলেন। বিশুদ্ধ সাহিত্য চিন্তা তাঁর মধ্যে থাকলেও খুব প্রবল ছিল না। কাজেই একদিক থেকে দেখতে গেলে, শিবনাথের সমস্ত রচনাই, বিশেষ করে প্রবন্ধসাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ-ভাবনামূলক রচনা মাত্র।

তবুও আলোচনার সুবিধার জন্য শিবনাথের প্রবন্ধ সমূহকে ছয়টি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

যে ছয়টি ভাগে প্রবন্ধগুলি বিভক্ত করা হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে (১) সমাজমূলক, (২) ধর্মমূলক, (৩) রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেমমূলক, (৪) সাহিত্য বিষয়ক, (৫) উপদেশ ও নীতিমূলক এবং (৬) বিবিধ প্রবন্ধ।

॥ ২ ॥

সমাজমূলক প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?' নামক পুস্তিকাটি একটু ভিন্ন স্বাদের। সে কারণে আমরা এটার একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি।

॥ এই কি ব্রাহ্মবিবাহ? ॥ প্রথম প্রকাশ পুস্তিকাকারে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে।[১] পুস্তিকাটি রচনার ইতিহাস তাঁর আত্মচরিত থেকে উদ্ধৃত করছি। "এই গোল মধ্যে (কুচবিহার বিবাহ) আমাদের দলে যিনি লেখনী ধারণ করিতে জানিতেন তাঁহারা সকলেই কেশববাবুর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে লাগিলেন। আমি "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?" নাম দিয়া এক পুস্তিকা লিখিলাম।"[২] অন্যত্র, "একদিনের কথা স্মরণ আছে, যেদিন প্রাতে ৬টার সময় বসিয়া রাত্রি ১১টা পর্যন্ত একদিনে এক পুস্তিকা রচনা করিলাম, তাহার নাম "এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?"। কুচবিহাররাজের সঙ্গে কেশব-কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহকে কেন্দ্র করে শিবনাথের মনে এমনই উত্তেজনা হয়েছিল যে প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি এই আটাশ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকাটি সতেরো ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত করেন।

পুস্তিকাটি ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন-জাত এবং সে কারণেই ইতিহাসের মর্যাদাসম্পন্ন। এছাড়া এটিই শিবনাথের পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ রচনা।[৩]

পুস্তিকাটি আসলে একটি প্রতিবাদ পত্র—একান্তই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে রচিত। কেশবচন্দ্রের একান্ত অনুগত শিষ্যদ্বয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গৌরগোবিন্দ রায় 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার একটি Supplement Copy-তে একটি সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। পত্রটিতে সুনীতি দেবীর (১৩) সঙ্গে কুচবিহার-

১। গ্রন্থের নাম পত্রটি এইরূপ: এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ। / শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী / প্রণীত। / আলবার্ট প্রেস, / ৩৭নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট—ঠন্‌ঠনিয়া, / কলিকাতা। / বৈশাখ—১২৮৫। / মূল্য ৵০ আনা।

২। আত্মচরিত, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫০ ও ১৫৫।

৩। এর পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র দুটি গ্রন্থ:—'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮) ও 'পুষ্পমালা' (১৮৭০), দুখানিই কাব্যগ্রন্থ। এটি তৃতীয় মুদ্রিত রচনা।

রাজের (১৫) বিবাহের বিবরণ ছাড়াও উক্ত বিবাহকে কেন্দ্র করে যে কেশব-বিরোধী দল গড়ে উঠেছিল, তাদের বক্তব্যের নানা জবাবও ছিল। শিবনাথ এই 'অতিরিক্ত পত্র'টির মধ্যে অনৃত-ভাষণ লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি পত্রলেখকদ্বয়ের বক্তব্য তাঁদের যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করেছেন এবং স্থানে স্থানে যে অনৃত-ভাষণ ছিল তার প্রতিবাদ করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করতেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। শিবনাথের এই যুক্তিবাদী মনের প্রকাশ তাঁর সমস্ত প্রবন্ধগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়।

এই পুস্তিকাটি রচনা করার তাগিদ কেন শিবনাথ অনুভব করেছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনার একাংশে তিনি বলেছেন, 'যাঁহারা এতকাল বীরের ন্যায় ধর্মসংগ্রাম করিলেন তাঁহারাই আজি অসৎ কার্যকে সৎকার্য বলিয়া ঘোষণা আরম্ভ করিলেন।···সত্যপ্রিয়তা তবে তুমি কোথায়? আমরা প্রতিবাদ করিয়াছি, ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের মুখে যে কালি পড়িতেছিল তাহা ধৌত করিয়াছি···।' (পৃঃ ২৪) এবং '···কোন ব্রাহ্ম তুষ্ট হউন বা রুষ্ট হউন, স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি আমরা সত্যের অনুবর্তী, কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুবর্তী নহি।' (পৃঃ ২৬) এই সত্যানুবর্তিতার সুর প্রবন্ধটির মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

সত্য যতই অপ্রিয় হোক্, তাকে প্রকাশ করতে হবে। এজন্য মনে নানা ক্লেশ শিবনাথ ভোগ করেছেন। কারণ যাঁকে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে অন্তরে শ্রদ্ধার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেই তাঁকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তবুও সান্ত্বনা এই যে, 'যাঁহারা এই বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা জানিবেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য করিয়াছেন।' (পৃঃ ২৭) মূল কথাটাই এই। ঈশ্বরই শিবনাথের জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিলেন। তাই এককালে তিনি মুঙ্গেরের নরপূজার আন্দোলনে (১৮৬৮) কেশবচন্দ্রের সপক্ষতা করেছিলেন, আবার তিনি ঈশ্বরের একাধিপত্যে গভীর বিশ্বাস নিয়েই কেশবের অবতারবাদকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন। 'কেশববাবু বর্তমান সময়ের জগতের মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত', শিষ্যদের এই মহাপুরুষ-বাদকে তিরস্কার করার সময় শিবনাথ আত্মসমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেছেন যে, 'আমরা কেশববাবুর এই অপকার করিয়াছি।'

অর্থাৎ কতিপয় ব্রাহ্মের নিত্য স্তুতি কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই প্রকার অহংবোধকে জাগিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি শিবনাথের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। বিবাহের পূর্বে সুনীতি দেবীকে প্রায়শ্চিত্ত করানোর প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি এরূপ মনে করি না যে কেশববাবু ইহাতেও সম্মত ছিলেন। বরং ইহা মনে করি যে রাজমাতৃগণ অন্যায় পূর্বক তাঁহার কন্যাকে এইগুলি করাইয়াছেন'। (পৃঃ ২০) এই উক্তি অবশ্যই কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের প্রমাণ। আসলে পুস্তিকাটি কেশবচন্দ্রের অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ নয়, প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ হচ্ছে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গৌরগোবিন্দ রায়ের উক্তির।

আক্রমণের ভঙ্গী কখনও সোজাসুজি হয় কখনও বা তির্যক। নানা প্রমাণ—এবং সে প্রমাণগুলি কেশবচন্দ্রেরই পত্রিকা ধর্মতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ান মিরার ইত্যাদি থেকে আহৃত—উল্লেখ করে তিনি যেমন কেশব-পক্ষীয়গণকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন, তেমনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে তাঁদের আঘাত করতেও চেয়েছেন,—'একবার এক ব্যক্তি আহার করিতে বসিয়া বলিয়াছিল—ব্যঞ্জনটা বেশ হইয়াছে, পরে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিল—লবণ একটু অধিক, হরিদ্রা কম, ঝাল বেশি, জল অধিক, মসলার অভাব। প্রচারকগণও কি সেইরূপ বলিবেন যে বিবাহটা নির্দোষ হইয়াছে তবে কিনা কেশববাবু জাতিভ্রষ্ট বলিয়া সম্প্রদান করিতে পান নাই: ব্রাহ্ম পুরোহিত পৌরহিত্য করিতে পান নাই; তবে কিনা বিবাহের পূর্বে কন্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল এবং বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রীতিতে হইয়াছিল; তবে কিনা উপাসনাটা এক পাশে বসিয়া নম নম করিয়া সারিতে হইয়াছিল এবং উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা উপদেশাদি লুকাইয়া করিতে হইয়াছিল; তবে কিনা পাত্রকে হোমের সময় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল এবং বাই নাচ প্রভৃতি বন্ধ করিতে পারা যায় নাই।' (পৃঃ ২২) অন্যত্রও এইরূপ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী অলভ্য নয়।[১] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় রচনাটির প্রধান লক্ষ্য একটা অন্যায়কর্মের প্রতিবাদ। তাই এতে একটা ক্রুদ্ধ ও ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে শিবনাথ সত্যকে সোজাসুজি প্রকাশ করতেই সাধারণতঃ

১। দ্রঃ, এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ? পৃঃ ২৩।

ভালবাসতেন। তাই এই রচনাটি ছাড়া অন্যত্র এই Satirical ভঙ্গীর সাক্ষাৎ কম পাওয়া যায়। লেখকের অল্প বয়সও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

পুস্তিকাটির পরিশেষে অন্য একটি সমাজ স্থাপনের ইঙ্গিত আমরা পাই। শিবনাথ নিজে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত—উভয় প্রকার স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। এবং সেই স্বাধীনতা হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত, এই মত প্রকাশ করতেন। তাই পরিশেষে সত্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ব্রাহ্মকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, 'যিনি এতকাল ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি সত্য পক্ষকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি নিয়তি চক্রের মধ্যে থাকিয়া মানবের সুখদুঃখ জয় পরাজয়কে নিয়মিত করেন, তিনি আমাদের মিলিত প্রার্থনা নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন'।

সামাজিক নানা সীমাবদ্ধতা ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে নারীজাতির দুর্দশা এবং জাতিভেদ প্রথা বিলোপের প্রশ্নেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিরোধের সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য শিবনাথ দীক্ষাগুরুর এই সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার ফলে শিবনাথের বার বার মনে হয়েছে যে, বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজে যে নানা বৈষম্য রয়েছে, তার মূল কারণ জাতিভেদ প্রথার মধ্যে নিহিত। ব্রাহ্মসমাজ সমাজের এই দৃঢ়মূল প্রথা বা সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করার ব্রত গ্রহণ করেছিল। অসবর্ণ বিবাহ দান, উপবীত পরিত্যাগ, একত্র পানাহার, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর্মানুষ্ঠান জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করছিল। এছাড়া তৎকালীন প্রগতিশীল নেতাদের অনেকেও এই প্রথার বিরুদ্ধে নানা স্থানে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফলে উনিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশক থেকে বঙ্গসমাজে জাতিভেদ প্রথা নিবারণ আন্দোলন মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। 'বর্তমান হিন্দু সমাজের আলোচ্য প্রশ্নসমূহের মধ্যে জাতিভেদ সম্পর্কেই সর্বাধিক আন্দোলন হইয়াছে।'[১]

শিবনাথ শাস্ত্রী সমাজ সংস্কারের যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক প্রায় সকল প্রবন্ধের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা রয়েছে। সমাজের অধোগতির একমাত্র কারণ 'জাতিভেদ

১। বান্ধব, দ্বাদশ সংখ্যা, ১২৯১ (১৮৮৪), পৃঃ ৫৫৯।

প্রথা'—সংক্ষেপে সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে একথাই বার বার ধ্রুবপদের মত আবর্তিত হয়েছে।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই তারিখে শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলকাতার এক জনসভায় জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। ঐদিনই কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হয়। বক্তৃতায় তার উল্লেখ আছে। বক্তৃতা সম্পর্কে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা লিখেছিল, 'বক্তৃতা—বিগত তিনমাসে কয়েকটি অতি সুন্দর বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে।...শিবনাথ শাস্ত্রী "জাতিভেদ"...সম্বন্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় ২ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছে। জাতিভেদ নামক বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে।"[১] বক্তৃতাটি এর প্রায় পাঁচ মাসের মধ্যে মুদ্রিত হয়।[২]

এই বক্তৃতাদানের বহুপূর্বে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ কয়েকজন আদর্শবাদী যুবককে নিয়ে যে একটি ঘননিবিষ্ট দল গঠন করেন, তার প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বিতীয় শর্ত ছিল: 'আমরা বাক্যে ও কার্যে জাতিভেদ মানিব না এবং যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে একবারে উঠিয়া যায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।'[৩] বলা বাহুল্য প্রতিজ্ঞাপত্রটির রচয়িতা ছিলেন স্বয়ং শিবনাথ। 'জাতিভেদ' বক্তৃতায় সেই প্রতিজ্ঞাপালনের ইতিহাসটি লক্ষ্য করা যায়।

'জাতিভেদ' পুস্তিকাটিতে শিবনাথ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব থেকে আরম্ভ করে এই প্রথা সমাজে কি অনিষ্ট ফল বহন করে এনেছে তার একটি সুনিবদ্ধ, সংহত ও পরিচ্ছন্ন ইতিহাস রচনা করেছেন। শিবনাথের ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে বহু জনের মতসাম্য ঘটেনি, সেকথা বলা বাহুল্য। কিন্তু যে ভঙ্গীতে রচনাটি নিবেদিত হয়েছে, তা যথার্থই অভিনন্দনযোগ্য।

শিবনাথ জাতিভেদ প্রথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে,

১। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই কার্তিক, ১৮০৬ শক, ৭ম ভাগ, ১৪শ সংখ্যা, পৃঃ ১৬৫।

২। নামপত্রটি এইরূপ / জাতিভেদ / শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ. / মহাশয়ের বক্তৃতা / সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তক প্রচার বিভাগ কমিটি হইতে প্রকাশিত। / কলিকাতা ৮১নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে, / শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / ১২৯১ সাল।

৩। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৪, পৃঃ ৪৮০।

সংস্কৃত সাহিত্যে এর ইতিহাস সন্ধান অনুচিত, কারণ সেই সংস্কৃত গ্রন্থগুলি অনৈতিহাসিক এবং তাদের কালনির্ণয়ে রয়েছে প্রচুর অসুবিধা। তবুও প্রাচীন গ্রন্থ হিসাবে বেদ থেকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, বেদের 'একটি স্থান ব্যতীত…কুত্রাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি জাতির বিবরণ' পাওয়া যায় না। এই সূক্তটির নাম 'পুরুষ সূক্ত'। এই মন্ত্রটি 'is often cited as an authorative pronouncement on the subject.[১] শিবনাথ সূক্তটির ভাষায় আধুনিকতার লক্ষণ দেখে (—একথা ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলেছেন—) একে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। তাঁর মতে জাতিভেদ প্রথা 'কর্মের বিভিন্নতা বশতঃ অভ্যুদিত হইয়াছে।' শূদ্র জাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, ঋগ্বেদে উক্ত 'আর্য' ও 'দস্যু' নামক পরস্পর বিবাদমান শ্রেণীদ্বয়ের কাছে যাঁরা দাসত্ব স্বীকার করল, তারা দাস নামে পরিচিত হল এবং উপদ্রবকারীরা হল দস্যু। 'ইহারাই ভবিষ্যতের শূদ্র।' Tribe থেকেই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব—'racial struggle between the fair-skinned Aryans and the dark-skinned non-Aryans ; the division of labour leading to the formation of occupational classes ; and the tribal differences, especially among the non-Aryans, which survived the spread of common Aryan culture.'[২]

বেদের মন্ত্রসকল যাঁরা স্মৃতিতে বহন করতে লাগলেন, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। আর ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ শূদ্র ব্যতীত যাঁরা কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা 'অর্থোৎপাদনে রত' হলেন, তাঁরা হলেন বৈশ্য—বেদে এঁরা 'বিশ্‌' শব্দ দ্বারা উক্ত হয়েছেন।

এইভাবে জাতিভেদ প্রথার বিভাগের কারণগুলি উল্লেখ ক'রে ও প্রাচীন সমাজে শূদ্রদের যে অবর্ণনীয় দুর্গতির মধ্যে থাকতে হত, তার কথা উল্লেখ করেছেন। শেষে বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রতাপের দিন খর্ব হইয়াছে ; শূদ্রগণ মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে।'

১। N. K. Datta, Origin and Growth of Caste in India, Vol. 1. (1931), Pp. 4.

২। Ibid, Pp. 34.

'জাতিভেদ প্রথার বর্তমান দুর্বলতা' সম্পর্কে শিবনাথ আলোচনা করেছেন বক্তৃতার দ্বিতীয়াংশে। বুদ্ধের আবির্ভাব, মুসলমান রাজগণের জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতাবিরোধী মনোভাব, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চা, মুদ্রণ যন্ত্রের বিস্তার প্রভৃতির কারণে 'নীচজাতীয় লোকদিগের উন্নতি আরম্ভ হইল।'

জাতিভেদ প্রথার 'ইষ্ট ফল' সম্পর্কে অনেকের বক্তব্য হচ্ছে, (১) 'জাতি-ভেদ-প্রথা নিবন্ধন হিন্দুদিগের নীতি অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে' ; (২) জাতি-ভেদ-প্রথা না থাকিলে ভারতবর্ষের জাতিসকল বিদেশীয় জেতাদের সংশ্রবে আসিয়া লোপপ্রাপ্ত হইত।' শিবনাথ এই যুক্তিদ্বয় খণ্ডন করে পুস্তিকাটির তৃতীয়াংশে 'জাতিভেদের অনিষ্ট ফল' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শিবনাথের মতে মুখ্যতঃ নয় প্রকারের অনিষ্ট ঘটেছে। (১) ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন বাসিন্দাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অনাত্মীয়তা এনেছে, (২) 'এতদ্দ্বারা কায়িক শ্রমসাধ্য কার্যকে নিকৃষ্ট ও লোকের চক্ষে হেয় করিয়াছে', (৩) 'ইহাতে ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়াছে', (৪) এ দেশের লোকেরা শরীর ও মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে, (৫) উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, (৬) 'আমাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়াছে। আমা-দিগকে কাপুরুষের জাতি করিয়াছে', (৭) 'বিবাহ সম্বন্ধীয় রীতিনীতি এতদূর দূষিত হইয়া পড়িয়াছে', (৮) প্রথাটি অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, (৯) 'জাতিভেদ নিবন্ধনই এ দেশবাসিদিগের পক্ষে পরের দাসত্ব-পাশ গলে ধারণ করা সহজ হইয়াছে।'

মনে রাখতে হবে, আলোচনাটি একটি বক্তৃতা। ফলে এর মধ্যে মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। শিবনাথের বক্তৃতা-শক্তি সেকালে বহুজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'তাঁহার বক্তৃতা শক্তি যেমন হৃদয় উত্তেজক, তেমনি যুক্তিপূর্ণ, একবার শুনিলে তৃপ্ত হওয়া যায় না। শিবনাথ ও নগেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্ততিতম যামে কলিকাতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।'[১] বিশেষতঃ এই বক্তৃতাটি হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ শিবনাথের বক্তব্যের সকল স্থান সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ তাঁরা মনুর অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করতেন।

১। প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, নব্যভারত, পৌষ ১৩২৬, পৃঃ ৪৩০-৩২

শিবনাথ তাঁর বক্তৃতায় মনুকে যে নরকাগ্নিতে দগ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছেন, 'এই কথায় আমাদের হৃদয়ে বড ব্যথা লাগিয়াছে।' তাঁদের মতে, পণ্ডিত শাস্ত্রী দেশকাল ছেড়ে বৃদ্ধ মনুকে নিয়ে বিচার করেছেন এবং 'তজ্জন্যই বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন।'[১]

অবরোধ প্রথা জাতিভেদ প্রথারই অন্যতম কুফল বলে শিবনাথ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। স্ত্রীজাতির এই দুর্গতির জন্য সমাজ শাসকেরাই দায়ী। শিবনাথ 'অবরোধ প্রথা'[২] নামক প্রবন্ধে এই প্রথা দ্বারা সমাজের যে অধোগতি ঘটেছে তার সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন করে এই প্রথার বিলোপের আশু প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। মনের মধ্যেই তিনি জিজ্ঞাসা তুলেছেন, আবার পরক্ষণেই সেই জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়েছেন। বিস্তারিত আলোচনার পরিশেষে তিনি বলেছেন, অবরোধ প্রথার জন্য কেবল যে 'নারীগণের দুর্গতি তাহা নহে সেই সঙ্গে পুরুষদিগের ও সমগ্র সমাজেরও দুর্গতি। বিধাতা এই দুর্গতি হইতে বঙ্গসমাজকে রক্ষা করুন।'

শুধুমাত্র এই প্রবন্ধেই নয়, অন্যান্য বহু প্রবন্ধে ও কবিতাতে তিনি নারীজাতির দুর্দশার কথা উল্লেখ করেছেন। নারী ও পুরুষ উভয়ের যুক্ত কর্মোদ্যোগেই জাতির যথার্থ উন্নতি সম্ভব—এই ছিল শিবনাথের বিশ্বাস।

'আর কারে ডাকি, ওঠ গো ভগিনি,
ভারতললনা, কারার বন্দিনী!
তোরা না উঠিলে, দেশ যে উঠে না,
তোরা না জাগিলে, দেশ যে জাগে না।'[৩]

অবরোধ প্রথার বিলোপ এই জাগরণ সম্ভব করবে।

নারীদের প্রতি উপদেশাত্মক একটি গ্রন্থ শিবনাথ রচনা করেছিলেন। সেটির নাম 'গৃহধর্ম'।[৪] গৃহধর্ম পালনের মধ্যেই নারীর যথার্থ সংযত, কোমল ও পবিত্র রূপটি ফুটে ওঠার সুযোগ পায়—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮০৩ শক, ৪২৭ সংখ্যা, পৃ: ১২৯-৩৬।

২। 'বক্তৃতা স্তবক' গ্রন্থে উল্লিখিত।

৩। 'বহুদূর নয়' কবিতা, 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

৪। প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। আসলে এটি 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম সংস্করণে অবশ্য আটটি প্রবন্ধ ছিল। পরে আরও সাতটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে। আমরা ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অষ্টম মুদ্রণের পাঠ গ্রহণ করেছি।

এই গ্রন্থটি ব্যতীত এই ধরণের আরও একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কন্যা হেমলতার সপ্তদশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই প্রকারের গ্রন্থ উপহার দেওয়ার কথা তিনি ভেবেছিলেন,—"সেইদিন যদি তাহাকে একখানি উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া উপহার দেওয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়, সেখানি অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগেরও পাঠ্যপুস্তক হইতে পারে।'[১] নারীর গার্হস্থ্যধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'রমণী গৃহধর্মের লবণ স্বরূপ ; তাঁহার অভাবে গৃহ-ধর্মের স্বাদ থাকে না।'

'গৃহধর্মে' উদ্ধৃত ১৫টি প্রবন্ধকে মোট চারটি স্তবকে বিভক্ত করা যেতে পারে। (১) গৃহ ও রমণী, (২) গৃহস্থগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, (৩) আত্মীয় ব্যতীত অন্য জনের প্রতি ব্যবহার ও (৪) পরিবারে ধর্মসাধন বিষয়ক। 'পরিবার'[২] নামক প্রথম প্রবন্ধটিকে সমগ্র প্রবন্ধাবলীর ভূমিকা বলা যেতে পারে। 'সমগ্র সমাজে যে উন্নতি প্রার্থনীয় এক একটি পরিবারে তাহা সাধন করিতে হইবে'—এই হল প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য। কারণ সমাজ হল পরিবার-ভিত্তিক।

দ্বিতীয় গুচ্ছের প্রবন্ধত্রয়ে গৃহই নারীর শ্রেষ্ঠ স্থান কিনা তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য এজন্যে অবরোধ প্রথার প্রয়োজন নেই। কারণ লেখকের মতে, অবরোধ প্রথা 'পারিবারিক সুখের পরম শত্রু।'[৩]

সংসারে নারীর যেমন বহু দায়িত্ব আছে, তেমনি নারীর প্রতিও সংসারের বহু দায়িত্ব আছে। সেকারণে নারীকে গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে তার বিবাহ সম্পর্কে সম্যক চিন্তার প্রয়োজন। 'বিবাহ'[৪] প্রবন্ধে বিবাহ সম্পর্কে সমাজের দায়িত্ব, নরনারীর প্রণয় ও পারস্পরিক নির্বাচন সম্পর্কে লেখকের সংযত মতামত প্রকাশিত হয়েছে। 'গৃহদেবতা' প্রবন্ধটিতে বিবাহের পূর্বে ও পরে গৃহধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে নিত্য আরাধনার উপদেশ দান করেছেন। প্রবন্ধটিতে একটি ব্যাপার অবশ্য লক্ষণীয়। এই নিত্য আরাধনার দেবতাটি কিন্তু ব্রাহ্মের নিরাকার ঈশ্বর নন। তখনকার দিনে

১। অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ ৯. ৪. ১৮৮৭।
২। প্রথম প্রকাশ, তত্ত্বকৌমুদী, ৩য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যা।
৩। 'গৃহধর্মে রমণীর অধিকার', তত্ত্বকৌমুদী, ৩য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যা।
৪। 'পতি পত্নীর সম্বন্ধ', তত্ত্বকৌমুদী, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা।

সমাজে যে নাস্তিক্যবাদ প্রচারিত হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে একটা আস্তিকাধর্মী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিবনাথ এই গৃহদেবতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়।

তৃতীয় স্তবকের প্রবন্ধগুলিতে পতি-পত্নী,[১] সন্তান-মাতা,[২] ভাই-ভগিনী,[৩] জনক-জননী, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে প্রভু-ভৃত্যের গৌরবজনক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'ভৃত্যকে সাধুতা দ্বারা পরাজিত করিয়া স্নেহসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিতে পারা প্রভুর প্রকৃত গৌরব'। আমরা শিবনাথের ভৃত্য খোদাই-এর কথা 'মেজবউ' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে ভৃত্য সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের মতামতেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কেশবচন্দ্র ভৃত্যের শাসনকেই বড় করে দেখেছিলেন—'যাহাতে ভৃত্যদিগের নীতি বিশুদ্ধ হয় তাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। যাঁহারা ভৃত্য দ্বারা সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের ভৃত্যদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করা প্রয়োজন।'[৪] সেদিক থেকে শিবনাথের মত যে আরও উদার ছিল, এমন কথা বলা যেতে পারে।

পিতা-মাতা-পুত্র-কলত্র-ভৃত্যের যে পরিমিত সংসার, তা পূর্ণ নয়। কারণ, আত্মতোষণ ব্যতীত সংসারে আরও কর্তব্য থাকে। পারিবারিক মানুষকে অতিথি-অভ্যাগত, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। শুধু তাই নয়, মনুষ্যেতর জীবেরাও মানব-জীবনের বহু অংশ অধিকার করে থাকে। 'গৃহপালিত পশু-পক্ষীর প্রতি কর্তব্য'[৫] প্রবন্ধে একথা শিবনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন—'পশু পক্ষী ভিন্ন গৃহস্থের গৃহ পূর্ণাঙ্গ হয় না।'

শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ধর্মসাধন অপেক্ষা পারিবারিক মণ্ডলীবদ্ধ ধর্মসাধনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১। পতি পত্নীর সম্বন্ধ, তত্ত্বকৌমুদী, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা।
২। সন্তান পালন, ঐ, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা।
৩। ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ, ঐ, ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
৪। ভৃত্যশিক্ষা, সুলভ সমাচার, ২৯এ মাঘ ১২৮০ সাল।
৫। তত্ত্বকৌমুদী, ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা।
৬। 'পরিবারে ধর্মসাধন' নামক প্রবন্ধ।

'গৃহধর্মে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হলে ইংলণ্ডস্থ একজন ব্রাহ্ম-বন্ধু মিস্ এস. ডি. কলেটকে যে পত্রটি লেখেন, সেটিকে বইটির মূল্যায়নমূলক সমালোচনা বলা চলে। পত্রলেখক লিখেছেন,—'This little book contains a series of very instructive artices which aim at pointing out the various relations that bind one member of a family to another, and their respective duties. It begins by explaining what a family is, according to the ideas of different communities, and goes on to explain that pious life and family life are quite consistent with each other and that man need not leave his family in order to devote his life to religion. The author also points out many obstacles, such as anger, selfishness &c., which stand in the way of leading a pious life in a family.'[১]

সামাজিক অবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তা থেকে মুক্তি পাবার উপায় নিয়ে শিবনাথ বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলিতে ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা এবং সেই প্রসঙ্গে বিশ্ব-সমাজের তৎকালীন পরিস্থিতি, ইউরোপীয় চিন্তাধারা এবং তার সংস্পর্শে এসে ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছে, এই পরিবর্তন কতখানি গ্রহণীয় এবং কি উপায়ে তা গ্রহণ করা যাবে—গভীর চিন্তা ও মননের সঙ্গে এই সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে। বক্তব্য বিষয় অনেক ক্ষেত্রে এক বলে প্রবন্ধগুলিতে পুনরুক্তি ঘটেছে। কারণ প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমাদের মনের এক পূর্ববাহিত সংস্কার যে রাজা বিনা রাজ্য চলে না। শিবনাথ ডারউইনের প্রসিদ্ধ অভ্যুদয়বাদের উল্লেখ করে বলেছেন যে, অব্যবস্থিত সমাজে পরস্পর বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর (clan বা tribe) নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি 'নিজ মণ্ডলীকে জয়শ্রী দিতে পারিতেন, তাঁহার প্রভাব সেই মণ্ডলীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিত···ইহাই মানব ইতিবৃত্তে রাজশক্তির

১। Brahmo Year Book—1892, Ed. S. D. Collet, Pp. 72-73.

প্রতিষ্ঠার মূল কারণ।'[১] রাজপ্রথার ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ ঘটলো। জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুরতা এর সঙ্গে যুক্ত হল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার অভ্যুদয় এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পুরনো মনোভাবের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। জাতিভেদ প্রথারও ক্রম-বিলুপ্তি ঘটেছে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে নির্যাতিত নারীসমাজেরও পরিবর্তন হয়েছে।

ধর্মজীবনেও এই পরিবর্তন শিবনাথ লক্ষ্য করেছেন। কারণ মানুষ যুক্তি-বলে বুঝতে পেরেছে যে কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত নয়। কারণ 'তাহার ব্যাখ্যাকর্তা ভ্রান্তশীল মানব বুদ্ধি'।

উনিশ শতকে যে যুক্তিবাদ সারা জগতে ব্যাপ্ত হয়েছিল, শিবনাথ তাকে অঙ্গীকার করেছিলেন। উনিশ শতকীয় বঙ্গসমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়েছিল। রক্ষণশীল দল প্রাচীন সমাজের সব কিছুকেই বরণীয় ভেবে, সমাজের পরিবর্তনে আশঙ্কিত হয়েছিলেন এবং প্রগতিশীল দল পুরাতনের সব কিছুই জীর্ণ ও বর্জনীয় ভেবে স্বদেশে এক উৎকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি'[২] প্রবন্ধে শিবনাথ এই দুই দলের সীমাবদ্ধতা এবং প্রসার—দুটি দিকই নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

উনবিংশ শতকের প্রথমপাদ থেকেই সমাজে রক্ষণশীলতার পরিবর্তে উদার চিন্তার বিস্তার ঘটতে থাকে। রামমোহনের জীবৎকাল 'নব্যভারতের জন্মকাল'। কারণ 'এই সময়মধ্যে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা, সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার, প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন প্রভৃতি সর্ববিধ উন্নতির সূত্রপাত হয়।'[৩] ফলে প্রাচীন সমাজে ধর্মগত, সমাজগত ও রাজনৈতিক যে বৈষম্য ছিল, এই সময় থেকেই তা ধীরে ধীরে অপসারিত হতে আরম্ভ করেছিল। ভবিষ্যত দৃষ্টির অধিকারী শিবনাথ এই পরিবর্তনের ফল সুদূর প্রসারী দেখেছিলেন। জাতিভেদ প্রথার অপসারণ,

১। 'নূতন যুগের নূতন প্রশ্ন', শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, কার্তিক ১৩০৯, পৃঃ ২৪০--৫৫। পরে 'প্রবন্ধাবলি' (১৯০৪) গ্রন্থে 'নবযুগের নব প্রশ্ন' নামে সংকলিত।

২। 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮) গ্রন্থে সংকলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। 'নব্যভারতে ভূত ও ভবিষ্যত'—ভারত মহিলা, অগ্রহায়ণ ১৩১৬।

নারীজাতির অবস্থার উন্নতি-সাধন, প্রজাকুলের সুশিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার মধ্যে তিনি 'নব ভারতের জন্ম'কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, শিবনাথের এই মত সেকালের সকলের সমর্থন পায় নি। 'সাহিত্য'-সম্পাদক শিবনাথের ঐতিহাসিক চিন্তার নূতনত্ব স্বীকার করেও জাতিভেদের প্রতি তাঁর অহেতুক আক্রোশের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১]

'নব ভারতের জন্ম' যে ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে এলেই সম্ভব হতে পারে, সে কথা সেকালের সকল মনীষীই বিশ্বাস করতেন; কারণ একথা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু শিবনাথের মনে প্রশ্ন জেগেছে, 'নব ভারতের সামাজিক জীবন কোন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবে?'[২] কারণ প্রাচীন হিন্দু সমাজের উপর আর ভিত্তি রাখা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ জাতীয় চরিত্র গঠনে নানা সামাজিক পরিবর্তনকে অঙ্গীকার করতে হয়। এই প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রী মহাশয় নিজেই দিয়েছেন, 'যে সামাজিকতাতে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে মিলিত করিবে, যাহাতে ঐহিকতার সহিত পারমার্থিকতাকে, স্বাধীনতার সহিত সাধুভক্তিকে, সাম্যের সহিত একতাকে, ব্যক্তিগত সাধনের সহিত সামাজিকতাকে সন্নিবিষ্ট করিবে, সেই সামাজিকতার প্রয়োজন।' প্রকৃত ভক্তিধর্মের সাধন করলেই এই মিলন সম্ভব হবে। ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপনকে এখানে সামাজিক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বরং বলা ভাল, ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তারের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তন নানা উপায়ে সংঘটিত হয়। সমাজে যখন বিপ্লব আসে, তখন তার বাইরের প্রকাশের অন্তরালে একটা গুরুতর কারণ থাকে। পাশ্চাত্য দেশে যখন শ্রমিকদের উপর মালিকদের অত্যাচারের সীমা রইল না, তখনই ঘটলো বিদ্রোহ। অর্থাৎ সমাজ-অনুশাসনের গণ্ডীর বাইরে যে ব্যক্তি মানুষের ভূমিকা আছে, তা স্বীকৃতি পেল এই বিদ্রোহের মাধ্যমে।[৩]

এই সামাজিক আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আদর্শের সংঘর্ষের বিস্তৃত

১। সাহিত্য, মাসিক সমালোচন বিভাগ, আশ্বিন ১৩১৬, ভারত মহিলা পত্রিকার সমালোচনা, পৃঃ ৫০৪।

২। 'নবভারতের নব সামাজিকতা', শিবনাথ শাস্ত্রী, ভারতী, ভাদ্র ১৩১৮, পৃঃ ৪০১-১১।

৩। 'সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত'—১ম ও ২য় প্রস্তাব, যথাক্রমে 'প্রবাসী' পৌষ এবং মাঘ-ফাল্গুন, ১৩০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরে প্রবন্ধাবলি পুস্তকে সংকলিত।

আলোচনা লেখক অন্য তিনটি প্রবন্ধে করেছেন।[১] পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লক্ষ্য করেছি যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের শিক্ষা আমরা পশ্চিম দেশের কাছ থেকে পেয়েছি। কিন্তু সমাজ কল্যাণে আত্ম-সমর্পণের শিক্ষা একান্তই প্রাচ্য ব্যাপার। প্রাচীন হিন্দু সমাজ ছিল 'ত্যাগশক্তি বা আত্ম-নিগ্রহধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।' প্রমাণ, মহর্ষি কণ্বের শকুন্তলার প্রতি উপদেশ এবং সীতার বনগমন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ভোগসর্বস্ব। মিলের ভোগবাদ তাই সেখানে এতখানি বিস্তৃত হতে পেরেছে। এর কতকগুলি সীমাবদ্ধতা অবশ্যই দেখা গিয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু আদর্শ হচ্ছে, ( ) ভোগ লালসার সংযম সাধন; (২) সুখের নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা; (৩) ব্যক্তিগত ভোগ লালসাকে পরিবার ও সমাজের শান্তি ও কল্যাণের অনুগামী করা। শিবনাথ এই প্রাচ্য আদর্শের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিবনাথ আরও মনে করতেন, সুখ 'হৃদয়ের অনুকূল তৃপ্তিময় একপ্রকার মানসিক অবস্থা।' এর প্রয়োজন আছে, তবে এটাই সর্বস্ব নয়। ত্যাগের মধ্য দিয়েই একে পেতে হবে। ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য ও মিলন মানব জীবনের পূর্ণতা সাধন করবে।

সেই সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে লেখক এদেশের জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মূলগত পার্থক্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং বলেছেন 'প্রেমের পথই শ্রেষ্ঠ পথ'। প্রেমেই 'প্রাচ্য ত্যাগ ও প্রতীচ্য ভোগের উভয়ের সমন্বয়' সাধিত হয়। লেখকের এই মত সর্বদা সমর্থনযোগ্য। কারণ উগ্র বিষয়বাদ এবং উগ্র সংসার-বিমুখতা—কোনটিই সমাজের কল্যাণ বহন করে আনতে পারে না। উভয়ের সামঞ্জস্যীকৃত মিলনেই মঙ্গল সাধিত হয়।[২] অন্য একটি প্রবন্ধেও এই কথা বিস্তৃতভাবে সমর্থিত হয়েছে।[৩]

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অপর এক প্রকার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে শিবনাথ বলেছেন যে ইংলণ্ডীয় সমাজে নারীর অবস্থা ধীরে ধীরে হীন হয়ে পড়েছে। এর কারণ সেদেশে মহিলাদের অতিরিক্ত চাকুরী-নির্ভরতা।

১। 'বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ,—.ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব, যথাক্রমে 'প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত। পরে প্রবন্ধবলি পুস্তকে সঙ্কলিত।

২। সাহিত্য-সম্পাদক এ ব্যাপারে এক মত নন, সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩১০, পৃঃ ৭০২।

৩। ভারতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩০৯। পরে প্রবন্ধাবলিতে সংকলিত।

এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকহীন অবস্থায় এসে 'ইন্দ্রিয়াসক্ত ধনিদিগের ইন্দ্রিয়সেবার' যন্ত্রে পরিণত হয়। এথেকে বোঝা যাচ্ছে বিদেশের তৎকালীন নানা সমস্যা শিবনাথকে আলোড়িত করত।

আধুনিক-যুগে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার ফলে একদল দেহ-সর্বস্ব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। কর্মপ্রার্থিনী বালিকারা এদের শিকার হয়ে পড়ছেন। আবার এক শ্রেণীর দরিদ্র ক্লান্তি অপনোদনের জন্য মদ্য পান করে থাকেন। এই অবস্থার কেন সৃষ্টি হয়েছে, লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পারিবারিক সুখের অভাব আমাদের দেশের অনেক পুরুষের দুর্নীতির প্রধান কারণ।' এছাড়া 'বাল্যকালে ধর্মশিক্ষার অভাব'ও মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। এই 'সামাজিক ব্যাধি'র[১] চিকিৎসার জন্য তিনি বাল্যকালের শিক্ষাকে ধর্মানুগ ও সাধুতা-সাপেক্ষ করার কথা বলেছেন।

॥ ৩ ॥

ধর্মালোচনা প্রসঙ্গে সামাজিক সমস্যার উল্লেখ শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মমূলক প্রবন্ধাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সাধন অপেক্ষা সংস্কার উনিশ শতকীয় ধর্মান্দোলনের অধিকতর লক্ষ্য ছিল, এমন বলা অসঙ্গত হবে না। প্রবন্ধে তারই ছবি লক্ষ্য করি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশের অনেক ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তখন সমাজের একদল লোক নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এই নাস্তিক্যবাদের আবির্ভাবে আবার নূতন করে ধর্মকে জানার চেষ্টা সমাজে চলতে লাগলো। ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে এই প্রশ্ন শিবনাথকে আন্দোলিত করেছিল। একটি বক্তৃতাতে[২] তিনি 'ধর্ম কি?' এই প্রশ্নের বিচার করেছেন এবং স্বীয় বক্তব্য নিবেদন করেছেন।

ধর্ম শব্দটি বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মাদি সাধারণভাবে যা বোঝায়, লেখক তার বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে বলেছেন

১। সামাজিক ব্যাধি, যথাক্রমে নব্যভারত, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র—১২৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২। 'বক্তৃতা স্তবক' পুস্তকের অন্তর্গত। পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশ—৮.৮.১৮৮৪। পৃঃ ৪০।

যে, ধর্মের নামে যে সব মত ও বিশ্বাস প্রচারিত আছে বা যে সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, সব ক্ষেত্রে তার সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগ নেই। মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত পতিপ্রাণা সাধ্বীর ধর্মাচরণের কাহিনীর উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, 'ধর্ম চরিত্রের বস্তু'। অর্থাৎ মত ও অনুষ্ঠান অপেক্ষা চরিত্রই শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বর-ভক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে নানা মত আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত সুনিপুণভাবে বিচার করে লেখক বলেছেন যে, 'যে পরম পুরুষ জড় জগতে শক্তিরূপে বাস করিয়া বিবিধ বস্তু সৃজন করিতেছেন, যিনি আত্মার অন্তরে শক্তিরূপে বাস করিয়া পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস নয়নে সত্য বলিয়া দর্শন করা ও তাঁহার অনুগত হওয়াই ধর্ম।' সুতরাং সার কথা হল, ঈশ্বরে আনুগত্য। শিবনাথের এই মত অবশ্যই থিওডোর পার্কারের মতের দ্বারা প্রভাবিত।

একথার পর স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মের স্বরূপ[1] সম্পর্কে আরও জিজ্ঞাসা মনে জাগে। অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে ভারতে ধর্মের রূপবৈচিত্র্য, উৎপত্তি ও বিবর্তনের একটা ইতিহাস রেখে গেছেন। শিবনাথ এই বিবর্তনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দাক্ষিণাত্য ও উত্তরাপথ —উভয় অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ধর্মের যে একটা রূপ থাকার প্রয়োজন আছে, সেকথা লেখক স্বীকার করেছেন, কারণ তা 'অজ্ঞাতসারে সসীমের পশ্চাতে অসীমের ধারণাকে উজ্জ্বল করে'। কিন্তু প্রশ্নটি অন্যতর। পৃথিবীতে যে বিচিত্র ও পরস্পর বিরোধী ধর্মভাব রয়েছে, তার স্বরূপটি কি? ধর্মের দুটি স্বরূপ: (১) এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা বা শক্তি-নির্ভর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও (২) আত্ম-শাসনের নৈতিক দিক। প্রেম সেই শক্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করার একমাত্র উপায়। এই প্রেম আবার ভক্তির জন্ম দান করে। কারণ 'ভক্তি প্রেমের পরিপকাবস্থা।' ধর্ম এই ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

প্রবন্ধটির শেষের দিকের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। লেখক মূল প্রশ্ন থেকে একটু দূরে এসে ধর্ম সাধনার উপায়কেই নির্দেশ করেছেন।

১। 'ধর্মের রূপ ও স্বরূপ', প্রবন্ধাবলি, পৃঃ ৬৮-৭৭।

এই ভক্তিধর্ম সাধন করার কালে ভক্তের মনে নানা অপূর্ণতার বেদনা জাগে। লেখকের মতে এই অতৃপ্তিবোধ আসলে 'আত্মা ও পরমাত্মার গূঢ় গভীর যোগের নিদর্শন স্বরূপ, পরমাত্মার প্রভাবের সূচনামাত্র।' মানব মন স্বভাবতঃই ধর্মান্বেষী। যখনই মানব মনে ধর্মের প্রভাব কমে যায়, তখনই ধার্মিক পুরুষগণ তাঁদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করেন। ফলে দেখা যায়, ধর্মই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পৃথিবীতে এখানেই নিয়মের রাজত্ব। সুতরাং এই নৈসর্গিক ধর্মের প্রতি আত্মসমর্পণই একমাত্র সাধ্য—লেখক এমন উপদেশই দিয়েছেন।[১]

কাজেই 'বিশ্ব প্রপঞ্চের অন্তরালে যে এক অনির্বচনীয় মহাশক্তি বিদ্যমান' তাঁকে কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। তবে সেই মহাশক্তি চেতন না অচেতন—এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। 'ঈশ্বর অচেতন কি সচেতন পুরুষ?'[২] নামক প্রবন্ধে শিবনাথ সেই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিভিন্ন প্রমাণ আহরণ করে লেখক পরিশেষে মন্তব্য করেছেন, মূল শক্তিতে যখন জ্ঞান, ক্রিয়েচ্ছা, প্রেম ও ধর্ম আছে, তখন তিনি 'জড়শক্তি হইলেন না, কিন্তু সচেতন পুরুষ হইলেন।' এই প্রবন্ধ পাঠে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা 'পরম প্রীতিলাভ' করে লিখেছেন যে, প্রবন্ধটিতে 'ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের পক্ষপাতীদিগকে কিরূপে নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতার পথে ফিরাইয়া আনিতে হয়' তার নির্দেশ আছে। অবশ্য তাঁরা প্রবন্ধের কয়েকটি ত্রুটিরও উল্লেখ করে পরিশেষে প্রবন্ধের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'অবশিষ্ট সমস্ত অংশ নির্দোষ বলিলে অতি অল্পই বলা হয়—একজন শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্মের লেখনী হইতে যেমনটি প্রত্যাশা করা যায় তাহা তাহার কোন অংশেই ন্যূন নহে।'[৩] তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের সঙ্গে আমরাও একমত।

কিন্তু মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও কুসংস্কারের প্রতি মোহ এই সচেতন পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাকে অন্য পথে চালিত করে। ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি যাঁদের অন্তরে ঘটে না, তাঁরা দেশাচারকেই ভগবদ্‌পূজা বলে গণ্য করেন

১। 'নৈসর্গিক ধর্ম', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০৯, পৃঃ ১-৬। পরে 'প্রবন্ধাবলি' ও 'সাহিত্য রত্নাবলী' পুস্তকদ্বয়ে সংকলিত।

২। নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯২। পরে 'বক্তৃতা স্তবক' গ্রন্থে সংকলিত।

৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৮০৭, পৃঃ ৮৩-৮৭।

এবং ভ্রান্ত পথে চালিত হন। শিবনাথ লিখেছেন, 'ফল কথা এই লোকে শাস্ত্র দেখিয়া চলে না, কিন্তু লোকাচার দেখিয়াই চলে।'[১] একথা যে যথার্থ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের প্রচলনে ব্যর্থতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভেবেছিলেন যে, শাস্ত্রের দোহাই থাকলে লোকে বিধবাবিবাহকে স্বাভাবিক ও শাস্ত্র-নির্দেশিত ব্যাপার বলে গ্রহণ করবে। কিন্তু সাধারণ্যে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারই মুখ্য বলে পরিগণিত। বিদ্যাসাগরের প্রভূত পরিশ্রম তাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

আবার অন্যবিধ প্রশ্নও মনে জাগে, তা হল, শাস্ত্রের বিভিন্নতা ও দেশভেদে লোকাচারের মধ্যে কোনটা বরণীয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, 'যে শাস্ত্রবিধি ধর্মের অনুকূল, তাহা শিরোধার্য আর যাহা ধর্মের প্রতিকূল তাহা বর্জনীয়।' প্রবন্ধ মধ্যে এই বক্তব্য আরও জোরালো যুক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অন্যত্র অবশ্য বলেছেন যে 'শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার অপেক্ষা…হৃদয় ফিরাইবার ব্যাপারটাতে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে।'[২] তা হলেই ভক্তিধর্মের আবির্ভাব ঘটবে।

দেশাচার জাতিভেদকে জন্ম দেয়। কিন্তু ধর্ম যদি হৃদয়ের বস্তু হয়, তা হলে তা জাতিভেদকে দূরীভূত করে। চৈতন্য, রামানন্দ, নানক, তুকারাম, রামানুজ প্রভৃতি যুগে যুগে সেই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। কাজেই ভক্তি-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে 'জাতিভেদের প্রকোপের হ্রাস' ঘটে। শাস্ত্রী মহাশয় 'ভক্তিধর্ম ও জাতিভেদ'[৩] নামক প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা শিবনাথ-প্রদত্ত উপদেশ ও নীতিমূলক প্রবন্ধগুলি আলোচনা করছি। ধর্ম সম্পর্কে শিবনাথের ধারণাদির কথা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি লোকাচারের ঊর্ধ্বে যে ভক্তিধর্ম রয়েছে, তাকেই একমাত্র সাধ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। উপদেশ ও নীতি-মূলক প্রবন্ধগুলিতেও সে কথাই বিবৃত।

এই প্রকারের প্রবন্ধগুলির সংকলন গ্রন্থত্রয় যথাক্রমে 'ধর্মজীবন'—প্রথম,

১। 'শাস্ত্র, দেশাচার ও ধর্ম', নব্যভারত, ভাদ্র ১২৯১, পৃঃ ১২৮-৩৪।
২। 'শাস্ত্র ও দেশাচার', নব্যভারত, ভাদ্র ১২৯৮, পৃঃ ২৬৭-৭১।
৩। 'ভক্তিধর্ম ও জাতিভেদ', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১১, পৃঃ ৫৮৭-৯৩।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড,[১] 'মাঘোৎসবের উপদেশ' ও 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা'। তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থ হলেও প্রবন্ধগুলির চরিত্র ভিন্নতর নয়। পূর্বালোচিত প্রবন্ধগুলির মত, এগুলিতেও সমাজ, শাস্ত্র এবং নীতির কথা আলোচিত হয়েছে। তবে এগুলি শিবনাথের ধর্মজীবনের স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করেছে—এখানেই প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য।

'ধর্মজীবন' সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশাবলীর সংকলন গ্রন্থ। তিনটি খণ্ডে মোট ৯৭টি বক্তৃতা রয়েছে। বক্তৃতাগুলি ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রদত্ত হয়েছিল।

আজন্ম আস্তিক শিবনাথ যখন পিতার ক্রোধের বলি হয়ে দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে বাধ্য হলেন, তখন তিনি 'ঈশ্বরের শরণাপন্ন' হন। সে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ১৮৯৫ সাল থেকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর মধ্যে প্রায় ৩০ বছরের ব্যবধান। এই ব্যবধানটুকু অবশেষে নিত্য ঈশ্বরচর্চার ফলে দূরীভূত হয়েছিল। মাঝের কয়েকটি বছর ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের সংগ্রামে শিবনাথ অতিবাহিত করলেও সেই সংগ্রামের পশ্চাতে অনুক্ষণ ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব করেছেন। 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার বহুতর প্রমাণ আছে।[২] কিন্তু এই সংগ্রামে তাঁর পরিতৃপ্তি ঘটেনি। প্রতিনিয়ত অন্তরে ঈশ্বরোপাসনার অপূর্ণতা তাঁকে বেদনাগ্রস্ত করে তুললো। 'বিগত বর্ষের অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকাল হইতে আমার অন্তরে গুরুতর অতৃপ্তি উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপে মন আর তৃপ্ত হয় না; সকল কার্যের মধ্যে কি এক প্রকার অসারতা অনুভব করিতে লাগিলাম।' এই অতৃপ্তি সাধকজনোচিত। ফলে সাধনাশ্রমের আবির্ভাব ঘটল। 'ক্রমে ১লা ফেব্রুয়ারী (১৮৯২ খ্রী: ১৯শে মাঘ, ১২৯৮ সাল, সোমবার) উপস্থিত। উক্ত দিবস প্রাতে কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনাপূর্বক ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন ভবনে ব্রাহ্মপরিচারক বা ব্রাহ্ম ওয়ার্কার দলের (সাধনাশ্রম)

১। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ছ'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯-১৯০১ এর মধ্যে। পরে দ্বিতীয় সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। '১৮৯৫ সাল হইতে কয়েক বৎসরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশ পূর্বে 'ধর্মজীবন' নামে ছয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে তিন খণ্ডে শেষ হইবে।' ভূমিকা, ২য় সং।

২। দ্র:, আত্মপরীক্ষা (১৯৫২), অময়চন্দ্র ভট্টাচার্য কৃত 'তত্ত্বকৌমুদী'র সংকলন।

সূত্রপাত করা গেল।'[১] অর্থাৎ স্পষ্টতঃই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিবনাথের 'ধর্মজীবনে' যে একটা মোড় নিয়ে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অপ্রকাশিত[২] 'উপদেশ ও প্রার্থনাদি সংগ্রহে'ও এই মোড় নেওয়ার ইতিহাস সুস্পষ্ট করে লেখা রয়েছে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধর্মজীবনের যে মানসিক তপশ্চর্যা চলেছিল, তাতে শিবনাথ সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। 'ধর্মজীবন' গ্রন্থের উপদেশাবলীতে সেই পূর্ণোপলব্ধির ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। শিবনাথ তাঁর ধর্মজীবনে ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীনতা, মানুষের চরিত্র-গঠন ও মনুষ্যত্বলাভের আদর্শকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। আপন চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি নিরন্তর সাধনা করে গেছেন। এই আত্ম-সংগঠনের কথা 'ধর্মজীবন' গ্রন্থের উপদেশাবলীতে বিধৃত রয়েছে।

শিবনাথের এই উপদেশাবলী তাঁর অন্যান্য বক্তৃতাগুলির মত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এমন অনুমানে বাধা নেই। মুদ্রিত ধর্মগ্রন্থগুলিও সেকালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'যৌবনে তাঁহার ধর্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া অনেক উপকার পাইয়াছি।'[৩] যেমন প্রবন্ধগুলির উপদেশের অন্তরঙ্গতা, তেমনি এদের সাবলীল রচনভঙ্গি, যত্রতত্র অ্যানেকডোটের ব্যবহারে বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার প্রয়াস, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র এবং বাইবেল, পার্কার, নিউম্যান প্রভৃতি বিদেশী গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং তৎসহ সামাজিক প্রশ্নগুলির সহজ অবতারণা সেই প্রভাবের যথার্থ কারণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শাস্ত্রী মহাশয়ের উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। একটি উপদেশে তিনি লিখেছেন, 'একজনের যদি জগৎ ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত থাকে, যদি সে কুসংস্কারাপন্ন হয় তথাপি তাহার যদি ধর্মের জন্য প্রকৃত ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে, প্রাণে ব্যাকুলতা থাকে, চিত্তের একাগ্রতা থাকে, তবে ঈশ্বর তাহার অন্তরে পরমার্থের স্ফূর্তি করিয়া থাকেন।… ফল কথা এই, এ জগতে

১। সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত, (১৯০২) পৃঃ ১-৪।

২। অপ্রকাশিত রচনাবলী অধ্যায়ে এর উল্লেখ করেছি।

৩। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৪১, পৃঃ ১৭০-৭২।

যে চায় সেই পায়।'[১] শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভাব কিছু পরিমাণে নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের ফল একথা বলা বোধহয় অসমীচীন হবে না। বিশেষতঃ উপনিষদের বিস্তৃত ও গভীর পাঠের প্রভাব 'ধর্মজীবনের' প্রতি উপদেশেই রয়েছে। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মমতে অদ্বৈতভাব গ্রহণ করেন নি, তিনি ভক্তিধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাই ছিল যে, তাঁর ঈশ্বর জীবন্ত, শক্তিশালী, জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ। তাঁর সঙ্গে প্রেমযোগেই মানবের পরিত্রাণ সম্ভব।

এইখানে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের তিন খণ্ডের উল্লেখও প্রাসঙ্গিক হবে। 'ধর্মজিজ্ঞাসা'র খণ্ডত্রয়ে একেশ্বরবাদের বিশ্বাস শিবনাথের একেশ্বরবাদের বিশ্বাসের চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।,……The tendency of Monism is even more distinct and pronounced in Babu Nagendranath Chatterjee's works than those of Pandit Sastri.[২] কিন্তু শিবনাথের প্রচারের সাফল্য আরও গভীর ও ব্যাপক। হিন্দু ভক্তের দুই শ্রেণী—বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী ভক্ত ও দ্বৈতবাদী ভক্ত। প্রথমটি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইংরেজি মতে একে Higher Pantheism বলে, আর দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গের অন্তর্গত। সমালোচক বলেছেন, 'ভক্তি ও যুক্তি বিভিন্ন মার্গ হইলেও উভয়ের উপযুক্ত সংমিশ্রণই গৃহীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ। কিন্তু এই পরস্পর বিরুদ্ধগুণের যথাযোগ্য সমাবেশ সহজ নহে। শাস্ত্রী মহাশয় এই দুরূহ সমন্বয় সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং আমার মতে এখানেই তাঁহার ধর্মজীবনের বিশেষত্ব।'[৩] আর এখানেই ধর্মজীবনের উপদেশাবলীর যথার্থ মূল্য।

শিবনাথ-রচিত 'মাঘোৎসবের উপদেশ' ও 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা' গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এগুলি মাঘোৎসবে প্রদত্ত উপদেশ ও বক্তৃতাবলীর সংকলন।

১। ধর্মজীবন, 'ধিয়োঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ' প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, (৩য় সংস্করণ ১৩৫৫), পৃঃ ১৪৭-৪৯।

২। Sitanath Tattvabhusan, Philosophy of Brahmoism (1909), pp. 86.

৩। জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃঃ ১৩৮।

প্রথম গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে[১] মোট বাইশটি উপদেশ সংকলিত হয়েছে। ইংরাজি ১৮৭৯-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে যে উপদেশগুলি শিবনাথ প্রদান করেছিলেন, সেগুলি তিনি নিজেই সংকলিত করে প্রকাশ করেন। ১২৯০ সালে (১৮৮৪) শিবনাথ কোন উপাসনা করেন নি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৫ সাল) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বৎসর থেকে ১৯১৯ (১৩২৬ সাল) খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত তিন বছর পূর্ব পর্যন্ত শিবনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে এই উপদেশগুলি প্রদান করেছিলেন।

'ধর্মজীবন' গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে আমরা শিবনাথের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। উপদেশাবলীতে সেই অতৃপ্তি এবং সাধকোচিত দীনতা নানা ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু উপদেশ দান কালে শিবনাথ অন্তরে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা অনুভব করতেন। ১৮৯৯ (১৩০৫ সাল) খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মাঘে প্রদত্ত 'অপব্যয়ী সন্তান' শীর্ষক উপদেশ তার প্রমাণ। 'সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্তে' ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে শিবনাথ লিখেছেন, 'এবার উৎসবের পূর্বে আশ্রম সম্বন্ধে বড়ই নিরাশা। কলিকাতা আশ্রমের কাজ জমিতেছে না। আশ্রমভুক্ত লোকেদের প্রাণে বল ও শক্তি আসিতেছে না। অপ্রেম ও অসদ্ভাব দেখা দিয়াছে···আমার মনে হইতে লাগিল, তবে আশ্রম তুলিয়া দিই এবং প্রচারক-পদ ত্যাগ করি। উৎসব আরম্ভ হইল। এবারে সংকীর্তন রচনা পর্যন্ত করিতে পারিলাম না। এইরূপ মলিন ও অবসন্ন মন লইয়া মাঘোৎসবের উপাসনা করিতে যাই। ১১ই মাঘ 'I will arise and go to my father'—Prodigal Son-এর এই উক্তি অবলম্বনে উপদেশ দিই। ইহার তাৎপর্য এই,—অবস্থা যতই নিরাশকর হউক না কেন, মানুষ যদি বলিতে পারে, 'I will arise and go to my father,' তাহা হইলে তার উপরে ঈশ্বরের করুণা আসে। ইহাতে আমার মনে একটা Will জাগিল ; অনুতাপ ও আত্মগ্লানির জীর্ণ কন্থা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইল।'[২]

১। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৬৩ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। এতে প্রথম সংস্করণের বাইশটি উপদেশ ব্যতীত আরও উনিশটি উপদেশ সংকলিত হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি।

২। 'সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত', পৃঃ ৭০।

উপদেশগুলি এই আত্মোজ্জীবনের প্রেরণায় উজ্জ্বল। সেই আত্মোজ্জীবন, অধ্যাত্মচিন্তা এবং সমাজ-চিন্তা উভয় প্রকার ভাবনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে উপাসনাগুলি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে এবং তা সমবেত নরনারীর অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করেছে। এদিক থেকেও উপদেশগুলির মূল্য নির্ধারণযোগ্য।

মাঘোৎসবের 'উপদেশ' ও 'বক্তৃতা'র মধ্যে কোন কোন দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপদেশগুলি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত—মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যায় গড়ে ছয় পৃষ্ঠার মত, এবং বক্তৃতাগুলির দৈর্ঘ্য ছয় থেকে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যান্ত বিস্তৃত। অবশ্য বক্তৃতা সাধারণত: দীর্ঘই হয়। আকারগত এই পার্থক্য ছাড়া বিষয়গত পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। 'মাঘোৎসবের উপদেশে' ধর্মের অন্তরঙ্গভাবই অধিকতর স্ফুট, কিন্তু বক্তৃতাবলীতে ধর্মালোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ও তৎকালীন সমাজালোচনাও করা হয়েছে।

'মাঘোৎসবের বক্তৃতা'র প্রথম সংস্করণে[১] মোট নয়টি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছিল। বক্তৃতাগুলি তৎকালীন শ্রোতাদের কাছে কি প্রকারের সমাদর লাভে সমর্থ হয়েছিল, সে সম্পর্কে (শিবনাথের মৃত্যুর শোক সংবাদ বিজ্ঞাপিত করে) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছেন, '১১ই মাঘের প্রাতে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা উপভোগের সামগ্রী ছিল।'[২]

উভয় গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বক্তব্য আছে। আর এই বক্তব্যগুলিই বক্তৃতাদাতার চরিত্রকেও ফুটিয়ে তুলেছে। সর্বশাস্ত্রের সত্যগ্রহণ, ব্রহ্মকৃপার জয়ঘোষণা, পৌত্তলিকতাকে অস্বীকার ও তিরস্কার, উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাপুরুষগণের উক্তির বিশদ ব্যাখ্যান, প্রাসঙ্গিক তুলনার অবতারণা ও ঈশ্বরপ্রেমের মহিমা-কীর্তন প্রবন্ধগুলির মূল কথা। ফলে বহু প্রবন্ধে একই ধরণের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অবশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ হিসাবে এদের মধ্যে পুনরুক্তি অনিবার্য ছিল।

১। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে (মাঘ, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) আরও তিনটি বক্তৃতা সংযোজিত হয়েছে।

২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৮৪১ শক, ৯১৫ সংখ্যা, পৃঃ ১৯৮।

॥ ৪ ॥

স্বদেশপ্রেমিক শিবনাথের রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। বর্তমান পর্যায়ে সেই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত চারটি বিশেষ প্রবন্ধের সাহায্যে তাঁর রাজনৈতিক ধারণার একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

এই প্রবন্ধ চতুষ্টয় বাংলা দেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশ যখন আন্দোলিত হচ্ছিল, প্রবন্ধগুলি সেই সময়ের শিবনাথের চিন্তাধারার দ্বারা পরিপুষ্ট।

আঘাত না পেলে চৈতন্যের জড়তা ঘোচে না। দীর্ঘ কালের বিদেশী শাসনে বাংলা তথা ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে একটা নিস্ক্রিয়তা কালাপাহাড়ের মত চেপে বসেছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্র আঘাতে ভারতবাসীর জড়তা গেল টুটে—দেশ স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হল। তৎকালীন নেতৃবৃন্দ—যাঁরা পূর্ব থেকেই স্বদেশকে ইংরেজ-শাসন-মুক্ত করার যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন—তাঁরা স্বদেশবাসীকে স্বাধীনতার পথ প্রদর্শনের জন্য নানা প্রয়াস পেতে লাগলেন। সাহিত্যিক শিবনাথের লেখনী এই সময়ে স্বাধীনতার প্রেরণা যোগাবার জন্য মুখর হয়ে উঠেছিল। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এর বহু পূর্বেই দেশকে পরাধীনতামুক্ত করার জন্য শিবনাথ নিজে তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।[১] তাঁর অন্তরঙ্গচক্রের "প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রথম কথা ছিল—'স্বায়ত্বশাসনই (তখনও স্বরাজ শব্দের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।' 'তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"[২] 'স্বদেশের হিতকর্মে' উৎসর্গীকৃত

১। 'আমাদের লইয়া তিনি একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলীতে তাঁহার মুখেই আমরা স্বায়ত্বশাসনের কথা প্রথম শুনিতে পাই।' ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৬, পৃঃ ৭২।

২। বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা (১৯৫৪ সং), পৃঃ ১২৬।

শিবনাথের জীবন দেশের বর্তমান অবস্থায় গভীরভাবে আন্দোলিত হতে লাগল। তিনি স্পষ্টতঃই অনুভব করলেন, দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হলে জনচিত্তে যে 'ক্ষুদ্রাশয়তা' রয়েছে, তাকে উন্মুলিত করা যাবে না। এই 'জাতীয় হীনচিত্ততা' বা inferiority complex থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য ও 'প্রবল প্রতিপক্ষগণের সমক্ষে চিন্তারাজ্যে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি—এই জ্ঞানটা স্বদেশীয়গণের মনে বর্ধিত' করার জন্য শিবনাথ একটা 'স্বদেশী ধূয়া'[১] তুলে দিতে চেয়েছেন। 'ধূয়া তুলিয়া দেওয়া একটা মস্ত কথা, ইহাতে আর কিছু না করুক যদি সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য রাজ্যের দিকে চাওয়াটা ঘুচায় তাহা হইলেও মহালাভ।' স্বায়ত্ত-শাসনের মানসিক প্রস্তুতির জন্য এই ধূয়ার যে প্রয়োজন ছিল, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে পঠিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথাই বলেছিলেন। শিবনাথও এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আন্দোলনকে স্বাগত সমর্থন জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ যে পাঁচটি প্রস্তাব করেছিলেন, তার মধ্যে একটিতে 'জাতীয় স্বাবলম্বন সভার' প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বাধিক অনুভব করেছিলেন। এই সভা বিদেশী সাহায্য-পুষ্ট না হয়ে 'তাহা সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের কর্ম হইবে।' শিবনাথ সম্ভবতঃ হিন্দু মেলার আদর্শকে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পুনঃ প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন।

এই স্বদেশচিন্তা কিন্তু শিবনাথের চিন্তাকে একদেশদর্শী করে নি। ইংরেজ-উচ্ছেদ তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রথম কথা ছিল, কিন্তু একথাও তিনি সে সময়ে ভেবে দেখেছিলেন যে, দেশকে জাগাবার শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী ইংরেজের সংশ্রবেই এসে শিখেছে। তিনি বলেছেন, 'ভারতবাসী আবার উঠিবে; নবালোকে আবার নব দিন দেখিবে;—ইংরাজ তাহার সহায় মাত্র। ইংরাজ যাহা কিছু করিবেন তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।'[২] কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কখনই হিংসাত্মক হবে না—'বিপ্লব ও অরাজকতা ইহার প্রকৃষ্ট পথ নহে।' মনে রাখতে হবে, এখানে শিবনাথ অহিংসনীতি প্রচার করলেও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা পত্রের চতুর্থ প্রতিজ্ঞা ছিল, 'অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া (তখনও অস্ত্র আইন

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বদেশী ধূয়া, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১২, পৃঃ ১২৪-৩০।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, জাতীয় একতা, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১১, পৃঃ ২৩৯-৪১।

প্রচলিত হয় নি) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।' 'জাতীয় স্বাবলম্বন সভা'র মধ্যে দেহচর্চাকেও তিনি স্থান দিয়েছিলেন। অহিংসা নীতির পূজারী হলেও শিবনাথের দেশপ্রেম ক্লীবত্ব ও দৈহিক নিষ্ক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁর এই অহিংসা নীতির পিছনে মহাত্মা গান্ধীরও কিছু প্রভাব আছে বলে অনুমান করি। গান্ধিজী এই প্রবন্ধ রচনার কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন[১] ('I met Pandit Shivanath Shastri')। শিবনাথের সঙ্গে তাঁর কি কথাবার্তা হয়েছিল, তা জানবার কোন উপায় নেই। তবুও অনুমান করি, শিবনাথের সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত সম্ভবতঃ দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও কথাবার্তা হয়েছিল, কারণ সে সময় গান্ধিজী 'কার্জনের দরবার' উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছিলেন।

যাই হোক, ভারতবাসীকে 'নবালোকে' উদ্দীপ্ত করার জন্য ও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি কয়েকটী উপায় নির্দেশ করেছিলেন। 'ইংরাজ-বিরূপতা' ব্যতীত, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, সংবাদপত্রের বহুল প্রচার, যান-বাহনের ব্যাপক প্রচলন, ডাক ব্যবস্থা প্রভৃতি এই ঐক্য বৃদ্ধির সহায়ক। ভারতের মধ্যে ভাষার বিভিন্নতা, জাতিভেদের প্রাবল্য প্রভৃতির জন্য যে ঐক্য ব্যাহত হয়েছিল, 'জাতীয় স্বাবলম্বন সভা'র দ্বারা সে বিভেদ দূরীভূত হতে পারে, এই ছিল শিবনাথের বিশ্বাস। এছাড়া 'ভারতবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন সুপ্রসিদ্ধ গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের' আদর্শ প্রচারকেও তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

শিবনাথের স্বাধীনতা-চিন্তার লক্ষণীয় মৌলিকতা হচ্ছে, তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মানসিক স্বাধীনতা বা মানসিক ঔদার্যের প্রয়োজন বিশেষভাবে বোধ করেছিলেন। ('রাজা ও প্রজা' প্রবন্ধ পাঠে রবীন্দ্রনাথের এই প্রকারের চিন্তা লক্ষ্য করা যায়।) দেশের মধ্যে যে স্বাধীনতার আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই 'নব শক্তির' আবির্ভাবমাত্র বিদেশীয় রাজাদিগকে শঙ্কিত ও তন্মনস্ক দেখা যাচ্ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ইংরেজ-বিদ্বেষ আমাদের মনকে ক্ষুদ্রাশয় করে তুলেছিল; সেই সীমাবদ্ধতার দিকগুলি

১। M. K. Gandhi, My Experiements with Truth, Vol. 1. pp. 549.

শিবনাথ তাঁর 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি'[১] নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। বিদেশের সব কিছুই খারাপ, আমরা স্ব-নির্ভর ও স্বয়ংপূর্ণ—একথা ভাবার মধ্যে আর্থিক ও সংস্কৃতিগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। 'অনুকরণ সর্বথা পরিহরণীয় কিন্তু অনুসরণ সর্বথা অবলম্বনীয়।' এছাড়া স্বদেশের অতীতের প্রতি 'অতিরিক্ত ভক্তি' বর্তমানকে অবহেলা করতে শিক্ষা দেয় ফলে স্বকর্মের সমালোচনা না করে অপরের সমালোচনায় কালক্ষেপমাত্র হয়। সামাজিক জীবনকে অবহেলা করে রাজনৈতিক জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার ফল হয় মারাত্মক। কারণ 'সামাজিক জীবনের অধোগতি নিবন্ধনই রাজনৈতিক জীবনের অধোগতির' মূল কারণ। সুতরাং এগুলি পরিহার করতে পারলেই পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে স্বরাজের প্রচার করছিলেন, তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে শিবনাথের এই প্রকার মনোভাবের মিল ঘটে নি। কেউ বা আবার তাঁকে সমর্থন করেছেন।[২] বিপিনচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে দেশের তৎকালীন অবস্থায় শিবনাথের এই প্রকার প্রচার সমর্থন করতে পারেন নি। অপ্রকাশিত ডায়েরীতে শিবনাথ লিখেছেন, 'বিপিন দুঃখ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসমাজের দিক হইতে আমরা 'স্বরাজে'র পক্ষ সমর্থন করিতেছি না। এবং স্বদেশের প্রেমের ব্যাধি লিখিয়া লোককে তদ্বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছি। এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলাম।' (১১.২.১৯০৭)

তিনি সেই সময় সমাজ বিষয়ে চিন্তা করলেও তাঁর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেছিল, এমন অনুমান করি না। বরং তাঁর মত আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ পাই 'স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি' প্রবন্ধ রচনার প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে 'থুড়ি থুড়ি মা কালী'[৩] প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'অদ্য স্বদেশ প্রেমের ব্যাধির আর একটা লক্ষণ ব্যক্ত করিতে যাইতেছি, তাহার নাম "থুড়ি, থুড়ি মা কালী" দিতেছি। থুড়ি, থুড়ি, একটা

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বদেশ প্রেমের ব্যাধি. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, পৃঃ ৫৭-৬০।

২। 'সৌভাগ্যের বিষয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় চিন্তাশীল মনীষী দেশের কথায় মন দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের আলোচনা করিলে আমরা উপকৃত হইব সন্দেহ নাই।'—সাহিত্য. আষাঢ় ১৩১৩, পৃঃ ১৯২ (খ)।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, থুড়ি, থুড়ি মা কালী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃঃ ৬৩৬-৪১।

প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ, মেয়েলী কথা। মানুষ যখন নিজের একটা কথার ভ্রম বুঝিতে পারে এবং তাহা সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন "থুড়ি থুড়ি" বলিয়া থাকে।···আমি দেখিতেছি এই স্বদেশপ্রেমের হুজুগে কতকগুলি লোক যেন "থুড়ি, থুড়ি, মা কালী" বলিয়া ভ্রম সংশোধন করিতে যাইতেছেন।' বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চরণে বসে শিবনাথ জীবনের পাঠ নিয়েছিলেন। সেকারণে তাঁর চক্ষে এই "থুড়ি থুড়ি মা কালী" দলের মানুষগুলি বড় ছোট প্রতীয়মান হয়েছে। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য 'Mass education'-এর প্রয়োজন তিনি বোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ "থুড়ি থুড়ি মা কালী" বাবুদের কাছে দেশের নারীজাতির মুক্তি ও জাতিভেদ প্রথার অবসানের জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধটির ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি লক্ষণীয়। আসলে জাতীয় জাগরণের পক্ষে এই ধরণের তীব্র কশাঘাতের প্রয়োজনও ছিল।

॥ ৫ ॥

প্রাবন্ধিক শিবনাথের সাহিত্যচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে। অন্যান্য বহু প্রবন্ধের মধ্যে—বিশেষ করে 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' এবং 'আত্ম-চরিতে' সাহিত্য সম্পর্কে শিবনাথের ধারণা ইতস্তত: ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সেগুলি তাঁর সাহিত্য-ধারণার ক্রমবিকাশকে সূচিত করে না।

এই প্রকারের প্রবন্ধ-পঞ্চকের মধ্যে যে প্রবন্ধ তিনটি আমরা প্রথমে আলোচনা করছি, সেগুলিতে শিবনাথ সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য, স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনে সাহিত্যের ভূমিকা ও সাহিত্য-সাধনার দুটি পীঠস্থানের আলোচনা করেছেন। অবশিষ্ট প্রবন্ধদ্বয়ে কাব্য সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বসমূহ ও সে-সম্পর্কে লেখকের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। শিবনাথের সমগ্র সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য এই প্রবন্ধগুলিতে বিধৃত; সেদিক থেকে প্রবন্ধগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিবনাথের সাহিত্যচিন্তা সে সময়ের যুবকদের মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'Society for the training of young men' নামক সভা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তৎকালীন মনীষীদের কয়েকটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর তারিখে শিবনাথ এই সভায় 'জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য' নামে যে বক্তৃতা

দেন তার 'ফলে সোসাইটি একটি নূতন কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়। সভ্যগণ সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় ভাব প্রচারকল্পে ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাস হইতে 'দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন' নামে একখানি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।'[১]

'জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য'[২] —১ম ও ২য় প্রস্তাবদ্বয় একই বক্তব্যের দুটি ভাগ। শিবনাথের মধ্যে যে একটী স্বদেশপ্রেমিক সত্তা ছিল, তা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রেরণা দান করতো। সমগ্র জাতিকে তিনি সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের জাতীয় জীবনের অস্থিরতা শিবনাথের অন্তরকে ব্যথিত করেছিল। আমাদের জাতীয় জীবনে নব-শক্তির অভ্যুদয় ঘটাতে হলে স্বদেশের প্রতি প্রেম ও উদ্দীপনার প্রয়োজন আছে, শিবনাথ তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছিলেন। জাতীয় চিত্তে এই স্বদেশপ্রেম ও উন্নতির উদ্দীপনা সঞ্চারের ব্যাপারে তিনটি উপায় তিনি নির্দেশ করেছেন :—

(১) রাজনৈতিক আন্দোলন,
(২) সংবাদপত্রের প্রচার,
(৩) জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি।

শিবনাথ স্পষ্টতঃই বলেছেন, 'আমাদিগকে মাতাইতে পারে, উদ্দীপ্ত করিতে পারে এরূপ একটা প্রেম বা একটা আশা বা একটা আকাঙ্ক্ষা জাতীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হউক; দেখিবে শক্তি, সাহস, দানশক্তি, সমবেত কার্যের বুদ্ধি সকলি প্রকাশ পাইবে। জাতীয় উদ্দীপনা জাতীয় শক্তির দীক্ষাগুরু।' এই আকাঙ্ক্ষার পথ বেয়েই Unification of Italy সম্ভব হয়েছিল।

স্বদেশোদ্ধারের জন্য বিস্তৃত সাহিত্যক্ষেত্রকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কারণ 'সাহিত্য স্বজাতি প্রেমিকদিগের হস্তে একটি মহাযন্ত্র স্বরূপ।' ইংরেজের স্বদেশচিন্তা গ্রীক সাহিত্য থেকে আহরিত। সেরূপ প্রয়োজন হলে বিদেশী সাহিত্যের স্বদেশচিন্তা আমাদের সাহিত্যে প্রবাহিত করতে

১। যোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র (১৩৬৬ সংস্করণ), পৃঃ ২০১।
২। প্রদীপ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩০৭ সাল। পরে 'প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থে সংকলিত।

হবে। কেবলমাত্র বিদেশী রাজাকে গালাগালি দিলেই দেশোদ্ধার কর্ম সমাপ্ত হবে না।

সাহিত্যে এই উদ্দীপনার সঞ্চার করতে হলে দেশের আদর্শকে সামনে রেখে চলতে হবে। 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্তব্যপরায়ণ মানুষের ন্যায় দেশের ভবিষ্যৎটা চক্ষের সমক্ষে ও স্বদেশপ্রেমটা হৃদয়ে রাখিয়া বসিতে হয়, তবে জাতীয় উদ্দীপনার কারণ হইতে পারে।' দেশকে জাগাতে হলে মানুষকে বড় হতে হবে। 'ঘরে ঘরে এই মানুষ গড়া কাজটা সাহিত্যের হস্তে। এই জন্যই জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটা চিরসম্বন্ধ দেখিতে পাই।'

এই উদ্দীপনা প্রকাশের ফল দু'প্রকার:—(১) জাতিচিত্তের আকাঙ্ক্ষা থেকে জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি হয় এবং (২) জাতীয় সাহিত্য আবার জাতীয় উদ্দীপনাকে বেগবান করতে পারে।

প্রথম প্রকার ফলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বঙ্গসাহিত্য। মধ্যযুগে চৈতন্যের আবির্ভাব জাতীয় আকাঙ্ক্ষার ফল। তাঁর আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম চরিত-সাহিত্য রচিত হল, বৈষ্ণব-শাক্তের দ্বন্দ্ব নিয়ে উভয় কাব্য-ধারায় সমান্তরাল সাহিত্য রচনার সুযোগ এসেছিল। সুতরাং চৈতন্যের আবির্ভাব-জনিত উদ্দীপনা ছাড়া 'আমরা বঙ্গসাহিত্যের এই নববিকাশ দেখিতে পাইতাম না।'

প্রসঙ্গক্রমে লেখক চৈতন্য পূর্ববর্তীকালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উল্লেখ করে বঙ্গসাহিত্যের সূচনাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

আবার উনিশ শতকে রামমোহনের প্রেরণাও জাতীয় সাহিত্যকে পুষ্টিদান করেছিল। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষায় যে ধর্মীয় ও সামাজিক আলোচনা সম্ভবপর, এবং 'গদ্য কিরূপে লিখিতে ও পড়িতে হয়', রামমোহন তা শিখিয়ে গদ্য সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত-ও বাংলা গদ্যসাহিত্যে 'এক নবযুগ প্রবর্তন' করলেন। শিবনাথ যথার্থই দাবী করেছেন যে, বাংলাদেশ অন্ততঃ গদ্য-সাহিত্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজকে মনে রাখবে।[১]

১। 'বঙ্গদেশ আর কিছুর জন্য না হউক, অন্ততঃ বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি ও কলেবর পুষ্টির জন্য ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী।'

জাতীয় উদ্দীপনা যে সর্বত্র উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি করবে, এমন দাবী শিবনাথ করেন না। বরং তিনি দেখেছেন যে, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন। শিখ জাতির অভ্যুত্থানকালে পঞ্চনদ ভূমিতে মুসলমান আক্রমণাদি কারণে 'জাতীয় অবসাদের মধ্যে সাহিত্যের প্রসার' সম্ভব ছিল না বলেই হিন্দুজাতির অন্তঃশায়ী ধর্মভাব বাবা নানক ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অপূর্ব সঙ্গীতরসরূপ ধারণ করেছিল। শুধু এই সঙ্গীতই নয়, একটা জাতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটি ভাষা সৃষ্টিতেও সমর্থ হল—তা হচ্ছে গুরুমুখী ভাষা।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, এই প্রক্রিয়া থেকে আরও প্রক্রিয়া ঘটতে পারে, অর্থাৎ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে যে জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সেই সাহিত্য আবার সেই জাতি বা অন্য কোন জাতিকে উদ্দীপিত করতে পারে। আসলে, সাহিত্য ও জাতি পরস্পরনির্ভর বলেই এমনটি সম্ভব। শিবনাথ এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণও দিয়েছেন।

ফরাসী জাতির মধ্যে এমনিতেই বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। রুশোর 'Social Contact Theory'-র শিক্ষা ফরাসী বিপ্লবে 'প্রচণ্ড ঝটিকার আকারে আত্মশক্তিকে প্রকাশ করিয়াছিল।' আমেরিকার দাস-বিপ্লবেও Mrs. Stoe-এর Uncle Tom's Cabin বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল।

শুধু বিদেশেই নয়, আমাদের দেশেও 'নীলকর নিকরে' অত্যাচারিত বাংলাদেশের দুরবস্থার কথা প্রকাশিত হয়েছিল 'নীলদর্পণে' (১৮৬০)। এর অনুবাদ ক্রিয়া ব্যাপারে জড়িত থাকার দরুণ 'লঙের হল কারাগার'ও জরিমানা। জরিমানার টাকা দিতে এগিয়ে এলেন সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'এই মহা উদ্দীপনার ফলস্বরূপ নীলকরের অত্যাচার জন্মের মত বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইল।'

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, জাতীয় সাহিত্য জাতীয় উদ্দীপনার পোষকতা করে।

লেখক এতক্ষণ উদ্দীপনা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় ও উদাহরণ সহযোগে স্বীয় বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এই উদ্দীপনা ও সাহিত্যের আশ্রয় হল মানবজীবন। মানুষের উচ্চ আদর্শ ও চরিত্রের শোভা যদি বজায় না থাকে তা হলে জাতীয় জীবনে উদ্দীপনা বা জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির আনুকূল্য ঘটে না। লেখকের মতে 'তাই বলি, প্রথমে

মানুষ, তৎপরে সাহিত্য।' মন্তব্যটি সাবধানে বিচার্য। এতে সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়নি। বরং সাহিত্য যার অবলম্বন সেই মানুষকেই মহত্ত্ব দান করা হয়েছে। শিবনাথের সমগ্র জীবন কতকগুলি আদর্শ চরিত্রের (যথা, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ) গভীর সংস্পর্শে এসেছিল বলেই পূর্বোক্ত ধারণা তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছে। 'অগ্রে জাতীয় জীবন, পরে জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ।' পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বার্থ-চিন্তাকে অপসারিত করে, অদম্য সাহস ও অটুট অধ্যাবসায়ের সাহায্যে জাতির জীবন ও সাহিত্যকে এক নবরূপ দান করে গেছিলেন। 'এইরূপ চরিত্র ও হৃদয়ের সংস্পর্শেই জাতীয় উদ্দীপনার আবির্ভাব হয়।'

একে উদ্দীপনা বা প্রেরণা (Inspiration) যাই-ই বলি না কেন, লেখকের মতে এর থেকেই হৃদয় জেগে ওঠে এবং তদুপযুক্ত ভাষার স্ফুরণ ঘটে। তখন ভাষার রুক্ষণশীলতাও দূরীভূত হয়। বাংলা গদ্যসাহিত্য এর প্রমাণ। সুতরাং সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় উদ্দীপনাময় চরিত্রের প্রয়োজন সমধিক।

তদানীন্তন কালের বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা লেখককে বেদনা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখকের দীর্ঘ মন্তব্যটি আমরা উদ্ধার করছি। কারণ এর মধ্যে তদানীন্তন সাহিত্যের অবস্থা এবং সেই সাহিত্য সম্পর্কে শিবনাথের মতামত আমরা জানতে পারব।

'যে বৃক্ষে পাতার বাহার অধিক, তাহাতে ফল ধরে না; বর্তমান সাহিত্যের সেই দশা। ভাষার চটক; অলঙ্কারের ছটা; পদাবলীর নৃত্য সকলি সুন্দর, কিন্তু তাহা রঙ্গভূমির অকুশল নটের ভাষার ছটাময় শোক-প্রকাশের ন্যায় শোককে উদ্দীপ্ত না করিয়া হাস্যকেই উদ্দীপ্ত করে। এ সাহিত্যের, এ ভাষার চটক যাহা চায়, ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে। চায় স্বদেশপ্রেম জাগুক, জাগায় স্বদেশ হিতৈষিতায় অরুচি। চায় লোকে পরার্থ তৎপর হউক, কাজে হয়, অতি স্বার্থক। এরূপ উচ্ছ্বাসময়, কল্পিত উত্তেজনাময়, ভাষার ভাবে অবসন্ন হইয়া এক একদিন ভাবি, 'হে হরি, কতদিন এই সাহিত্যের হস্ত হইতে নিস্তার পাইব।'

তৎকালীন সাহিত্য সংগঠন সম্পর্কে শিবনাথের বক্তব্যও 'জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চিত্তে লঘুতা'[১] নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। সেই

১। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১১, পৃঃ ৪০৩-৮।

সময়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সাহিত্যের অবস্থার উল্লেখ করে শিবনাথ বলেছেন যে, আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে সাহিত্য আলোচনা অধিক পরিমাণে হচ্ছে। সেখানে Royal Society, British Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে। এরপর লেখক দেশীয় সাহিত্যোদ্যোগের কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, Asiatic Society of Bengal 'আমাদের মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।' এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'দীনেশচন্দ্র সেন, অথবা পরিষদের অন্যতম সভ্য নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয় এ বিষয়ে যাহা করিয়াছেন, তাহা সর্বদা প্রশংসার যোগ্য।'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শিবনাথের সঙ্গে এই প্রবন্ধ রচনার কিছু পূর্ব থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিবিড় যোগ ঘটে। ১৩১০ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি ৮০৲ টাকা সংগ্রহ করে পরিষৎকে দান করেন। সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃন্ময় মূর্তিটি (Bust) এবং তাঁর ব্যবহৃত পাগড়ীটি ইংলণ্ড থেকে শিবনাথই এনে দিয়েছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, শেষ বয়সে শিবনাথকে 'যশোহর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি এই সম্মানকর পদ প্রত্যাখ্যান করেন।'[১]

যাই হোক, বঙ্গদেশে তৎকালে সাহিত্যে যে লঘুভাব প্রকাশিত হয়েছিল, শিবনাথ তার কারণ হিসাবে বঙ্গীয় জনচিত্তের আশাহীনতাকেই দায়ী করেছেন। এই আশাহীনতা আবার একতার অভাবে ও বিদেশী শাসনের কারণে ঘটেছিল—'একখানি বহুশত মণ প্রস্তরের যাঁতার ন্যায় একটি বিদেশীয় শক্তি আমাদের উপর চাপিয়া রহিয়াছে।'

দেশবাসীর একতা, 'জ্ঞানের বিষয় সাধারণের গোচর করিবার জন্য তদনুযায়ী সামাজিক ব্যবস্থা' এবং একদল স্বাধীনবৃত্তি ও অবসরবান্ (Leisured class) লোকের সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগের দ্বারাই দেশীয় সাহিত্যে গাম্ভীর্য আসবে—এই ছিল শিবনাথের ধারণা।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৬, পৃঃ ৬৮-৬৯।

। সাহিত্য-তত্ত্ব ও শিবনাথ । 'কাব্য ও কবিত্ব'[১] প্রবন্ধে কাব্য বলতে শিবনাথ ছন্দোবদ্ধ পদকেই বুঝিয়েছেন এবং কাব্যের কবিত্ব কোথায়—এই প্রশ্নের এক সুন্দর মীমাংসা দিয়েছেন। একথা বলতে গিয়ে তিনি ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের বিশাল ও বিস্তৃত বিতর্ককে আশ্রয় না করে নিজস্ব ধারণাকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন,—'পাঠ করার পরেও যদি মনে প্রশ্ন হয়, ইহাতে কবিত্ব আছে কিনা ? তবে খুব সম্ভব তাহার মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব নাই।' কাব্যের কবিত্ব কাব্যের ঠিক কোনখানে অবস্থিত থাকে, লেখক তা বলতে পারেন না, কিন্তু ব্যঞ্জনের স্বাদের মত তা আছে এবং 'আত্মার রসনা' সেই 'সৌন্দর্য চাখে'।

ছন্দকে কাব্যত্বের লক্ষণ বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়। লেখক তা স্বীকারও করেন—'ছন্দঃ ও তালের সঙ্গে সৌন্দর্যের, সুতরাং কবিত্বের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।' কিন্তু ছন্দই যে কবিতা নয়, তাও তিনি মনে করেন। তা যদি হত তাহলে 'ছন্দোবন্ধন-নিপুণ শ্রুতিজীবী কবিমাত্রেই সুকবি হতেন—ভাবজীবী ব্রাউনিঙের মত ব্যক্তি কবি হতে পারতেন না। ছন্দকে লেখক ভ্রমরের গুঞ্জনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাতে ধ্বনি আছে কিন্তু প্রাণকে তা কিছু দেয় না। 'প্রকৃত কবির পক্ষে এই একটা বিঘ্ন, যাহা সরাইয়া তবে তাঁহাকে কাব্য রচনা করিতে হয়।' দেহাত্মবাদী আচার্য বামনের 'কাব্যং গ্রাহ্যং অলঙ্কারাৎ' মতকে লেখক এইখানে অস্বীকার করেছেন, এমন বলা যায়। কারণ এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'কবিত্বের সহিত ছন্দঃ আছে, অথচ ছন্দ যেমন কবিতা নয়, সেইরূপ কবিতার সঙ্গে অলঙ্কার থাকে অথচ কবিত্ব নয়।' ছন্দে ও অলঙ্কার বিন্যাসে কবিতা হয় না। প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার রীতিকে শিবনাথ এখানে অনুসরণ করছেন।

সাহিত্যদর্পণাকার বিশ্বনাথ কাব্যের কাব্যত্ব খুঁজেছেন রসে—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং'। এই রস হচ্ছে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর'। একথা বলার গূঢ় তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাস্বাদ যেমন অনুভূতিগম্য, তাকে ভেঙ্গে বলা যায় না, তেমনি কাব্য রসাস্বাদনও।

কবির প্রধান লক্ষণ লেখকের মতে 'তন্ময়তা' অর্থাৎ 'বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত একীভূত হওয়া, তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া এবং তাহার মধ্যেই বাস

১। কাব্য ও কবিত্ব, প্রদীপ, আশ্বিন ১৩০৭। পরে 'প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থে সংকলিত।

করা। অভিনেতাও এই তন্ময়তাগুণে বড় হয়।' এর অপর নাম 'সমদুঃখ-সুখতা' বা সাধারণীকরণ।

বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লেখক কালিদাসের একটী শ্লোকাংশ উদ্ধার করেছেন—'শৈলরাজাধিতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ' এবং তার অনুবাদ দিয়েছেন এইভাবে—

গিরীশ-নন্দিনী হায় পড়িয়া বিপাকে,
চাইতে তুলিয়া পদ না যায়, না থাকে।

—কবির এই তন্ময়তাকে লেখক 'ভাবাবেশ ও প্রেমাবেশ' বলেছেন। আবেশ কি জিনিষ? লেখকের মতে কাঁচ পোকা যেমন তেলাপোকাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, তাই হল আবেশ। 'এই আবেশে না ধরিলে কবিতা লিখিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।' আবেশযুক্ত কবি একাকী, পাঠক সেখানে অনুপস্থিত। পাঠক সম্মুখে উপস্থিত থাকলে কবিতা রচিত হয় না, রচিত হয় বক্তৃতা।

এরপরে লেখক বলেছেন যে, কবিনামখ্যাত ব্যক্তিগণ এই ভাবে 'শ্রুতিজীবী' ও 'ভাবজীবী' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রুতিজীবীরা পাঠকের 'কর্ণের' উপস্থিতি ভুলতে পারেন না। ভাবজীবীরা প্রাণস্পর্শে উন্মুখ। কাজেই কবিতায় পাঠক যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন তবেই সে কবিতা শ্রেষ্ঠ হবে। কারণ তখন ভাবে ভাবে কোলাকুলি হবে। লেখক এই প্রসঙ্গে স্কচ কবি বার্ণসের 'To Mary in Heaven' নামক কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধার করেছেন ও তার ভাবার্থ দিয়েছেন।[১] উদ্ধৃত অংশে সমগ্র প্রকৃতি ও প্রণয়-প্রণয়ী প্রেমযোগে আবদ্ধ হয়ে এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করেছে। এই তন্ময়তা সৃষ্টিকে প্রকৃত কাব্যের লক্ষণ বলে শিবনাথ মনে করেন।

কিন্তু শিবনাথ এই তন্ময়তার উপর যে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার সাহিত্যিক ফল তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও সর্বত্র উত্তম হয়নি। শিবনাথের বিষয়গত তন্ময়তা বর্ণনামূলক আখ্যায়িকা কাব্যের ক্ষেত্রে কতকটা

১। কবিতাটির আরম্ভ এই প্রকার:

'That sacred hour can I forget?
Can I forget the hallowed grove
Where by the winding Ayr we met,
To live one day of parting love!'

সাফল্য এনেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আত্মতন্ময়তামূলক গীতিকবিতাধর্মী রচনার ক্ষেত্রে ততখানি সাফল্য আনতে পারে নি। কারণ অতিরিক্ত আত্মতন্ময়তা রূপরসবিশিষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী নয়—তার উদাহরণ আছে বিহারীলালের কাব্যকলায়।

কাব্যের অন্য লক্ষণ শিবনাথ বলেছেন, 'উদ্দীপনা'। এই উদ্দীপনার ফলে কবিসৃষ্ট ভাবাবর্তে পাঠকের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ কবিতার সৌন্দর্য দর্শনে উদ্দীপিত হয়। সুতরাং সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিই হল উদ্দীপনা। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কবি মিল্টনের Paradise Lost-এর পঞ্চম সর্গ থেকে—যেখানে সুপ্তোত্থিত অ্যাডাম ইভ্‌কে জাগাচ্ছেন। কবি এর অনুবাদে সচেষ্ট না হয়ে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সমভাববহ মেঘনাদ-প্রমীলার দৃশ্য তুলে ধরেছেন।[১] উভয় চিত্রেই দাম্পত্য প্রেমের উদ্দীপনা চিত্রিত হয়েছে। এই উদ্দীপনা হৃদয়কে এক পরম স্নিগ্ধতায় পূর্ণ করে তোলে। এই 'প্রধান সুখ'টি ব্যতিরেকে আমাদের জীবনে 'স্বার্থ বিষয়াসক্তি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার গোহাড় পড়িয়া থাকিবে।' সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে শিবনাথ এখানে ব্যক্তিগত নীতিপরায়ণতাকে মিশিয়ে দিয়েছেন এবং ফলতঃ বঙ্কিমী যুগের সাহিত্য ধারণারই পোষকতা করেছেন।

সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক অন্য প্রবন্ধটির নাম 'ঋষিত্ব ও কবিত্ব'।[২] এই প্রবন্ধটিতেও পূর্বোক্ত প্রবন্ধের বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে লেখক কবিগণকে ঋষিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যাঁরা বেদমন্ত্রসকল দেখেছেন, তাঁরাই ঋষি। অর্থাৎ তাঁরা সত্যকে সাক্ষাৎ করেছেন। সত্যদ্রষ্টা নিউটনও সেকারণে ঋষি। আমরা নিয়ত বহু জিনিষ দেখছি, কিন্তু আমাদের সত্যের সঙ্গে যথার্থ সাক্ষাৎকার ঘটে না। একথা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কেও সত্য। 'ঋষিরা বিশ্বব্যাপী জ্ঞানবস্তুকে দিব্যচক্ষে' দেখেন! সেরূপ 'কবির দৃষ্টি ক্ষুদ্র পরিমিত পদার্থকে অতিক্রম করিয়া অসীম জ্ঞানবস্তুর উপরে স্থাপিত হইতেছে।' ঋষিরা যে গুণে সত্যের আপাত-আবরণ উন্মোচন করেন, তার নাম তন্ময়তা। একেই লেখক 'মানবের প্রতিভা' বলেছেন। সকলেই এই

১। মেঘনাদবধ কাব্য, পঞ্চম সর্গ :—কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে'—ইত্যাদি।

২। ঋষিত্ব ও কবিত্ব, ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭, পৃঃ ৪৬-৫৯। পরে 'প্রবন্ধাবলি'তে সংকলিত।

প্রতিভার অধিকারী হতে পারেন না বলে সবাই ঋষি হতে পারেন না। ঋষিদের মত কবিদের প্রতিভা বিকাশের প্রণালীও লেখকের মতে 'তন্ময়তা'। শেলী পাখিটির সঙ্গে (Sky lark) 'তাদাত্ম্য'-বোধ করেছিলেন বলেই কবিতাটি এত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সমগ্র বিশ্ব এক বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হয়ে অখণ্ডতা পেয়েছে। এখানেই 'সৃষ্টি রাজ্যের গূঢ় সৌন্দর্য'। কবি এই গূঢ় সৌন্দর্যকে সাক্ষাৎভাবে দেখেন এবং এখানেই তাঁর কবিত্ব। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, ভবভূতির প্রেমের রূপ-বর্ণনা, শেলীর Skylark ও Cloud কবিতার স্বচ্ছ অনুবাদ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, সর্বত্রই এক প্রেমের লীলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'এই সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ দর্শনেই কবির কবিত্ব।'

উপসংহারেও লেখক ঋষি ও কবিকে এক গোত্রভুক্ত করেছেন। সেটি যথার্থ। কারণ 'পশ্যদেবস্য কাব্যম্' একথা আমাদের শাস্ত্রে বিদিত। সেকারণেই প্রাচীনকালে ঋষিরাই কবি ছিলেন।

এরপর পূর্বোক্ত প্রবন্ধটির মত এই প্রবন্ধটিও শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-চরণে গিয়ে পৌঁছেছে। 'জগতের সহিত এই আত্মীয়তা স্থাপিত হইলে মানব ও ঈশ্বরে প্রেম সহজেই জন্মে। এই জন্যই বলি, ঋষি ও কবি আমাদের প্রকৃত বন্ধু।'

॥ ৬ ॥

পরিশেষে আমরা শাস্ত্রী মহাশয় রচিত কয়েকটি মৌলিক চিন্তাবহ বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধের আলোচনা করছি। এগুলিতে কোন সামাজিক সমস্যা বা আধ্যাত্মিক নীতিপ্রচার মুখ্যস্থান গ্রহণ করে নি। বরং এগুলিকে মানসিক-উন্নতি-সহায়ক প্রবন্ধ বলাই সঙ্গত। শিবনাথ তৎকালীন নানাবিধ সমস্যা আলোচনার ফাঁকে মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়েও যে মস্তিষ্কচালনা করতেন, এই প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ। কোন সমস্যা-পীড়িত নয় বলে এই প্রকারের রচনাগুলি স্বতন্ত্র মর্যাদা-সম্পন্ন।

'স্বাধীনতা'[১] নামক প্রবন্ধে শিবনাথ কোন স্বাধীন জাতি যে পুনরায় পরাধীনতার শৃঙ্খল পড়তে বাধ্য হয়, তার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে স্বাধীনতার

১। প্রবন্ধটির 'উপক্রমণিকা', 'প্রথম অধ্যায়', ও 'দ্বিতীয় অধ্যায়' যথাক্রমে 'নব্যভারত'-এর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও ভাদ্র ১২৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থেকে গেছে।

যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, তা যথার্থই মূল্যবান্। শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন, 'জগতের ধনধান্যে, সুখ শান্তিতে, মানবমাত্রের সমাধিকার এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত শরীর মনের শক্তিসকলকে নিজের ও জগতের কল্যাণার্থ নিয়োগ করিবার যে সমাধিকার, সেই অধিকারদ্বয়কে উপভোগ করিতে পারার নাম স্বাধীনতা।' আরও বলেছেন 'স্বেচ্ছাচারিতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়।' এই স্বাধীনতার জন্ম হয় 'আধ্যাত্মিক মুক্ত ভাব' থেকে। শিবনাথের স্বাধীনতার চিন্তার বৈশিষ্ট্যই হল তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক সকল প্রকার স্বাধীনতাকে ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে একীভূত করে ভাবতেন।

'মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল'[১] নামক প্রবন্ধে শিবনাথ প্রথমেই মানব-চরিত্র বলতে কি বোঝায় তার তিনটি লক্ষণ প্রদর্শন করেছেন—(১) মানুষের আকৃতিগত বা physical structure সম্পর্কে আমাদের সাধারণ সংস্কারের সঙ্গে (General idea) তার হৃদয়মনের দোষগুণ মিশে যে সাধারণ সংস্কার, 'ইহাই তাহার চরিত্র।' (২) 'মানব প্রকৃতির অব্যক্ত গূঢ় শক্তিই চরিত্র।' এবং (৩) আত্মশাসন। চরিত্র গঠনেরও তিনটি উপাদান—(১) ধর্মনিয়মে বিশ্বাস, (২) 'কর্তৃত্বশক্তি জ্ঞান' বা Sense of individuality এবং (৩) আত্মসংযম। এই তিনপ্রকার উপাদানে চরিত্র গঠন করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। সত্যানুসন্ধান, চরিত্রবান্ লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ ও একান্তমনে পরমেশ্বরের উপাসনাই এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায়ত্রয়।

রবিবাসরীয় ছাত্রসমাজে প্রদত্ত এই উপদেশটি সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন, তা যথার্থ,—'শিবনাথবাবুর যতগুলি উপদেশ আমরা দেখিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে এইটি অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ হইয়াছে। দৈনিক জীবনে এই প্রকার উপদেশে অনেক উপকার হইয়া থাকে।'[২]

'চিন্তা সঞ্চরণ'[৩] নামক প্রবন্ধটি শিবনাথের মৌলিক চিন্তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদেশ থেকে অন্যদেশে যেমন সম্পদের প্রবাহ চলে (flow of wealth) তেমনি 'জাতিসকলের চিন্তাও···এইরূপে সঞ্চরণ করে।' সংস্কৃতি বিনিময়ের এই সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিকটি শিবনাথ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা

১। ১২৯০ সালে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত, পরে 'বক্তৃতাস্তবক' ও 'সাহিত্য' গ্রন্থাবলী'তে গৃহীত।

২। গ্রন্থ সমালোচনা, নব্যভারত, ফাল্গুন ১২৯০, পৃঃ ৪৮৬।

৩। প্রবাসী, কার্তিক ১৩১১, পৃঃ ৩৫৫-৬০।

অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন। পরিশেষে এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'আমার বোধহয় কোনও প্রতিভাশালী লেখক যদি চিন্তা সঞ্চরণ বা Migration of ideas বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে এই বিষয়ে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়।'

আসল ও নকলের মধ্যে নকলের প্রতি আমাদের অধিক আকর্ষণের কারণ হিসাবে 'নিরেট খাঁটি বস্তুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অল্প'—একথা শিবনাথ বলেছেন তাঁর 'আসল ও নকল' প্রবন্ধে।[১] আসলের সারবত্তা নকলের উপস্থিতিতেই উজ্জ্বলভাবে প্রমাণিত হয়। তবুও নকলের প্রতি আসক্তির একটা কারণ হিসাবে শিবনাথ চমৎকারভাবে বলেছেন, 'মানব প্রকৃতি আসলকে ভালবাসে' কিন্তু 'আসলকে আমরা এতই ভালবাসি যে তাহার নকল দেখিয়া ভুলিয়া যাই।'

'যাঁহারা সাধনাগুণে পারমার্থিক সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সিদ্ধপুরুষ।' সাধনা দ্বারা এই সত্যের সাক্ষাৎকার হয়। আবার কোন নূতন শক্তির স্পর্শেও মানুষের অন্তরে সাধুত্বের আবির্ভাব ঘটে। আসলে মানবের অন্তরে যে স্বাভাবিক ঈশ্বর প্রেরণা সমুপস্থিত তা মানুষকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। যুগ যুগ ধরে সাধুরা জগতে এই সাক্ষ্য রেখে গেছেন। একথার বিশদ আলোচনা করেছেন শিবনাথ তাঁর 'সাধুদের সাক্ষ্য'[২] নামক প্রবন্ধে।

এই প্রকার একজন সাধুর জীবনের করুণ কাহিনীর কথা ব্যক্ত হয়েছে 'সক্রেটিসের মৃত্যু' প্রবন্ধে।[৩]

'মানবজীবন'[৪] প্রবন্ধে শিবনাথ মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য কোথায় তা আলোচনা করেছেন। মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, 'অনুতাপের গভীরতা', 'আত্মপ্রসাদের উচ্চতা' এবং কর্তব্যজ্ঞান ইতর প্রাণীতে অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া ইতর প্রাণীর মধ্যে 'অনন্তের ধ্যান ও ধারণার' উপস্থিতি কখনই চিন্তা করা যায় না।

১। 'সাহিত্য রত্নাবলী' (১৯১৭) গ্রন্থে সংকলিত।
২। 'সাহিত্য রত্নাবলী' পুস্তকে সংকলিত।
৩। ঐ
৪। ঐ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনীমূলক রচনাবলী

॥ ১ ॥

কোন ব্যক্তিজীবন যখন নানা মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তিজীবন হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র জাতির সম্পদ ও পূর্বাপর ইতিহাসের বিষয়বস্তু। দেশকালের মধ্যে বিধৃত কোন জাতির ইতিহাস লেখা যেমন সহজ নয়, তেমনি জাতির সম্পদ যে বড মানুষ, তাঁর জীবনচিত্র রচনাও সহজ নয়। দেশের ইতিহাসের মূল কথা যেমন বাহ্যিক ঘটনাধারা মাত্র নয়, তেমনি বড মানুষের জীবনের ইতিহাসও নিরস তথ্যপঞ্জী মাত্র নয়। দেশের ক্ষেত্রে জাতিগত অভিপ্রায় আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করাই ঐতিহাসিকের লক্ষ্য, বড় মানুষের ক্ষেত্রে জীবনের বাহ্যরূপের অন্তরালে যে গভীরতম মনোজীবন আছে, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনই যথার্থ জীবনীকারের লক্ষ্য। আসল কথা, জীবনী রচনার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অন্নময় ও প্রাণময় কোষের বিচার-বিশ্লেষণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি সেই অন্নময় ও প্রাণময় কোষ অতিক্রম করে মনোময় কোষের ক্ষেত্রে বিচারণাও প্রয়োজন। তন্ময় ও মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির সুন্দর সম্মিলনই যথার্থ জীবনীকারের সার্থকতার চাবিকাঠি।

এই সম্মিলন সম্ভব হয় জীবনীকারের ভাবদৃষ্টির গ্রন্থণসূত্রে। যে জীবনীর কেন্দ্র শক্তি হচ্ছে ভাবসত্য, সেই জীবনী সর্বদা সাহিত্যের দরবারে অভিনন্দনযোগ্য। সুতরাং যথার্থ জীবনীসাহিত্যে মহৎ ও বৃহৎ জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপকে ভাবদৃষ্টির সূত্রে গ্রথিত করে একটি সাহিত্য-প্রতিকৃতি তৈরী করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই অত্যাবশ্যক ভাবদৃষ্টির অভাব বা পার্থক্যের জন্যই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রচিত বিভিন্ন জীবনীগুলিও ফলত: এক হয়ে ওঠে নি।

অন্যদিকে যাঁরা সাধারণ মানুষ, প্রত্যক্ষভাবে বৃহত্তর দেশের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত নন, তাঁদের নিয়েও এক শর্তে জীবনী লেখা যেতে পারে। কোন সাধারণ মানুষের জীবনে বৃহৎ ও মহৎ কর্মের ইতিহাস না থাকতে পারে, কিন্তু থাকতে পারে অনেক সদ্গুণের উদাহরণ। সেদিক থেকে সেই সাধারণ মানুষের জীবনও অন্যের কাছে অনুকরণযোগ্য ও দৃষ্টান্তস্থল হয়ে উঠতে পারে। আর

সে সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানেই জীবনী রচনার অবকাশও আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনীসাহিত্যেও পূর্বালোচিত ভাবদৃষ্টির সমুৎসার প্রয়োজন। কারণ উদ্দিষ্ট জীবনের সাহিত্যিক প্রতিকৃতি রচনার পক্ষে সেই ভাবদৃষ্টি অপরিহার্য।

॥ ২ ॥

উনিশ শতকের খ্যাত-অল্পখ্যাত নানা ব্যক্তির চরিতবিষয়ক প্রবন্ধকার শিবনাথ শাস্ত্রী। এই প্রবন্ধগুলিতে উচ্ছ্বাসের ফেনিলতার পরিবর্তে বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় রয়েছে কারণ জীবনী রচনার ব্যাপারে শিবনাথের একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রামতনু লাহিড়ী ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনের হারিয়ে যাওয়া নানা ঘটনা সম্পর্কে খেদ করতে গিয়ে শিবনাথ লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখার প্রথা না থাকাতে এইরূপ চমৎকার গল্প সকল পাওয়া যায় না। আমাদের লেখকদিগের সংস্কার আছে যে জীবন-চরিত লিখিতে হইলে বড় বড় লোকদিগেরই জীবনচরিত লেখা কর্তব্য—তোমার আমার মত লোকের জীবনচরিত আবার কি লিখিব। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম, যে কেহ সৎপথে থাকিয়া নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে আপনার উন্নতিসাধন করিয়াছে সে সকলেরই জীবনচরিত লেখা কর্তব্য।'[১] এই আদর্শের কথা স্মরণ করেই শিবনাথ খ্যাত ও স্বল্পখ্যাত বহু ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করে গেছেন।

শিবনাথ যে সব জীবনী রচনা করেছেন, তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ কোন জীবনেরই তিনি সামগ্রিক ইতিহাস লেখেন নি। এ আমাদের ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানবজীবনের খুঁটিনাটি তাঁকে কখনই আকর্ষণ করেনি, করেছিল শুধু বিশেষ গুণগুলি। এই বিশেষ দৃষ্টি তাঁকে পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত লিখতে দেয় নি। অবশ্য পাঠকের এই ক্ষোভ 'আত্মচরিত' পাঠে কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বহু জীবনী-প্রবন্ধের সুসজ্জিত মালিকা; সেখানে পৃথক পৃথক ফুলের সন্ধান বড় নয়, বড় হ'ল তার মিলিত শোভা। (এই গ্রন্থটির আলোচনা আমরা স্বতন্ত্রভাবে করেছি)। এছাড়া বহু প্রবন্ধে

১। অপ্রকাশিত ডায়েরি, তারিখ ১৩.৫.১৮৮৪।

সংক্ষিপ্ত আকারে এমন বহুজনের কথা তিনি লিখেছেন, যাঁরা সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের গৌরবে নয়, বিশেষ বিশেষ গুণের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। শিবনাথ রচিত যে জীবনচরিতগুলি আমরা আলোচনা করছি তা হচ্ছে এই—রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণদাস পাল, নবীনচন্দ্র রায়, রঙ্গনাথ শাস্ত্রী, জেমসেটজী তাতা, ম্যাক্সমূলার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ সিংহ ও সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের জীবনী।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥ যে মনীষীর আবির্ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সামাজিক ইতিহাস রচনার মুখ্য উপকরণ হয়েছিল, তিনি রামমোহন রায়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বসবাস করতে আসার পর থেকেই তাঁর বিচিত্রমুখী কর্মোদ্যোগ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। শিবনাথ রচিত 'রামমোহন রায়'[১] পুস্তিকাটিতে এই বিচিত্র কর্মযজ্ঞের কিছুটা পরিচয় রয়েছে।

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, সমাজ সংস্কারের পুরোহিত, গদ্যসাহিত্যের জনক ও ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রবক্তা রামমোহনের জীবন আলোচনা করা শিবনাথের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রবন্ধ-প্রস্তাবগুলিকে গদ্যসাহিত্যের গ্রানিট স্তর বলে উল্লেখ করেছেন, শিবনাথ রামমোহনের সমগ্র জীবনকে তুলনা করেছেন, 'একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি'র সঙ্গে। কারণ তিনি এই পৃথিবীতে 'সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া, সাধারণের উপর মস্তক' তুলে দাঁড়িয়েছেন। মহর্ষি শঙ্করের যোগ্য উত্তরাধিকারী রামমোহনের চরিত্রের কয়েকটি গুণ আলোচনা করে শিবনাথ রামমোহনকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান, স্বাবলম্বন-শক্তি, সাধুভক্তি বা reverence, ধর্মে বিশ্বাস, ঈশ্বর-নির্ভরতা, দায়িত্ববোধ ও সমাজ-সচেতনতা রামমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল বলে শিবনাথ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য একথাও তিনি বলেছেন যে, দায়িত্ব-জ্ঞানই তাঁর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ছিল বলে তিনি যত বড় সমাজ-সংস্কারক তত বড় ঈশ্বরভক্ত হয়ে উঠতে পারেন নি।

১। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৮৮৬ (বেঙ্গল লাইব্রেরী)। পরে 'প্রবন্ধাবলি' ও 'সাহিত্য রত্নাবলী'তে পুনর্মুদ্রিত। আমরা ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি।

শিবনাথ যথার্থই বলেছেন, 'ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্যের চালক ও পোষক ছিল।'

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে হলেও রামমোহনের জীবনের এই মূল্যায়ন যে যথার্থ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামমোহনের একটি শিশুপাঠ্য জীবনী শিবনাথ 'মুকুল'[১] পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। সেখানেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিবনাথ বলেছেন, 'এই বঙ্গদেশে যত মহাজনদের সংশ্রবে আসিয়াছি এবং যাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হইয়াছি, তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি।'[২] অন্যত্র বলেছেন, '…to the best of my knowledge and belief, if any man in modern India deserves the title of *rishi* or spiritual seer, it is certainly Devendranath Tagore.'[৩] বহু প্রবন্ধের মাধ্যমে শিবনাথ দেবেন্দ্রনাথের নানা প্রশস্তি করে গেছেন। শ্মশানে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার সঞ্চার, 'সাধননিষ্ঠা ও স্বাবলম্বন', প্রাচ্যমুখী চিন্তাধারা, সমাজমুখীনতা, উচ্ছ্বাসহীন ভক্তি, পারমার্থিক নীতি, সৌন্দর্য-সাধনা প্রভৃতি নয় প্রকার মৌলিকতা শিবনাথ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে লক্ষ্য করেছেন। তাছাড়া, শিবনাথের মতে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম 'সাধনের সামগ্রী ছিল; প্রদর্শনের সামগ্রী নহে;…লোকে কি চায় তাহা না দেখিয়া ঈশ্বর কি চান তিনি তাহাই দেখিতেন।' ভাষান্তরে 'His aim in life was to be always steeped in the joy of communion.'[৪]

দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব শিবনাথ আরও কয়েকটি গুণের মধ্যে নিহিত থাকতে দেখেছেন।[৫] সেখানে তিনি বলেছেন, 'ধন সম্পদের মধ্যে জন্মিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গতি হইয়াছিল বিষয় বিরাগের দিকে। এই খানেই তাঁহার মহত্ত্ব।' মন্ত্রসত্যকে দর্শন করেছিলেন বলেই দেবেন্দ্রনাথ ঋষি।

১। মুকুল, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা, ভারতী, বৈশাখ ১৩১৯, পৃঃ ১০।

৩। Shivanath Sastri, Maharshi Devendranath Tagore, Men I have Seen, Pp. 78.

৪। Ibid, Pp. 88.

৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কোথায়? প্রবাসী, চৈত্র ১৩১১, পৃঃ ৬৩৮-৪০।

সাধারণ মানুষের জীবনের পরিবর্তনের শক্তি পরিধি থেকে কেন্দ্রাভিমুখী, 'কিন্তু মহর্ষির জীবনের গতি···কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।' এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর-ভক্তি থেকেই তাঁর মর্ত্যপ্রীতি বিকশিত হয়েছিল।

মহর্ষির জীবনের সবদিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন শিবনাথ একটি বক্তৃতায়।[১] দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্র, শিবনাথ প্রমুখদের মত-পার্থক্য ও দলগত বিচ্ছেদের কথা আমরা জানি। শিবনাথ প্রবন্ধের শুরুতেই মহর্ষির মতপার্থক্যের কারণগুলি উল্লেখ করে পরে তাঁর জীবনের নানা সৎ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর ফলে দেবেন্দ্রনাথের তথাকথিত সীমাবদ্ধতা কতকটা অপসারিত হয়েছে, গুণগুলি আরও মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহর্ষি সমাজ-সংস্কার অপেক্ষা অনন্তের পূজাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন, নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রামমোহনের চিন্তার অপমৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টভাবের আধিক্যের আশঙ্কা করেছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে পরবর্তী দলের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মাত্র তিন পৃষ্ঠাধিক আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসামূলক সমালোচনা করে শিবনাথ দীর্ঘ সাতাশ পৃষ্ঠা ধরে দেবেন্দ্র-প্রশস্তি রচনা করেছেন। তাঁর চরণে বসে কি উপদেশ পেয়েছেন এবং তাঁর জীবনে কি জীবন-নীতি দেখেছেন, সেকথা বলতে গিয়ে শিবনাথ বলেছেন, 'মহর্ষিতে যাহা দেখিয়াছি, তাহা এ জীবনে আর কোথাও দেখি নাই, এবং আর যে দেখিব, তাহা মনে হয় না।'

শিবনাথ লিখেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পরিবর্তন কোন সাধুসঙ্গ বা কোন বাহ্যিক ঘটনা দর্শন বা অনুতাপের ফলে ঘটেনি। ঘটেছে শ্মশান-চিন্তার মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব 'জ্যোতিঃ-প্রকাশে'। 'His joy was so great that where the people saw only darkness in a room after night-fall, he beheld light.[২] রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।'[৩] বিষয়-চিন্তার মধ্যে এক পরম ঈশ্বর-নির্ভরতা শিবনাথ মহর্ষির জীবনে লক্ষ্য করেছিলেন। মহর্ষির প্রবল জ্ঞান-তৃষ্ণার কথা

১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ, মাঘোৎসব ১৮৩১ শক।

২। Shivanath Sastri, Maharshi Devendranath Tagore, Men I Have Seen Pp. 88.

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্র পূজা (১৩৬৫), পৃ: ২৫।

বলতে গিয়ে শিবনাথ নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। উনিশ শতকীয় আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থপাঠে গভীর মনঃসংযোগের প্রমাণ 'স্বহস্তে পেনসিলে লিখিত মতামত' বহু নোটগুলি। টেনিসনের কবিতা, আমিয়েলের জার্ণাল, ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞান, কোন্ বিষয়েই তাঁর না আগ্রহ ছিল।

শুধু দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রকার সদ্‌গুণের আলোচনা করে নয়, আপন অন্তরে সেই সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন করে শিবনাথ দেবেন্দ্রনাথকে পূজা দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে শিবনাথের গভীর শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে দেবেন্দ্রনাথকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর একটি চিঠিতে—'সে দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে আপনি যে আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের চিরসম্পত্তি। আপনার দৃষ্টান্তের কথা সকল লোককে তিনি বলিয়া বেড়ান। ইহাতে কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন যে তিনি দৈবেন্দ্রিক হইয়াছেন।'[১]

'বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের' মত প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রচুর ভাব সম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।'[২] প্রদীপ পত্রিকায়[৩] প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি পড়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই শিবনাথ শাস্ত্রী-উল্লিখিত 'যোগবাশিষ্ঠের' সূত্র অনুসরণ করে 'বিদ্যাসাগর চরিতের' দ্বিতীয়াংশ[৪] রচনা করেছিলেন। এথেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনুমান করা সহজ হয়।

বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা সম্পর্কে আরও একটি সুবিদিত প্রবন্ধের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০৯ শক ; চিঠির তারিখ ১৮ই চৈত্র ৫৭ ব্রাহ্ম সংবৎ।

২। ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫ পৃ: ৭৬৪।

৩। প্রদীপ, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০৫, পৃ: ১৩১-২২। পরে প্রবন্ধাবলি ও সাহিত্য রত্নাবলীতে সংকলিত।

৪। চারিত্র পূজা (১৩৬৫), পৃ: ৪৫-৫৫।

বিদ্যাসাগর' ('চরিতকথা') প্রবন্ধটির কথা বলছি। শিবনাথের বক্তব্যের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্যের বহুলাংশে মিল লক্ষ্য করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বলেছিলেন যে, বিধবাবিবাহ আন্দোলন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকের দ্রষ্টা শিবনাথ বলেছেন, 'ওটা ত বাহিরের মানুষের কাজ।' অন্তর পুরুষটি ছিল 'মানব জীবনের মহত্বজ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত। 'বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন' এবং সেকারণেই 'স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন।' রামেন্দ্রসুন্দর একেই বলেছেন 'বস্তুত: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।' শিবনাথ একমাত্র রামমোহনকে বিদ্যাসাগরের তুলনাস্থল বলে মনে করেছেন, 'রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই; উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই; উছলিয়া গিয়াছিল।' সুতরাং 'বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়া বঙ্গভূমি উঠিয়াছে, আর কে তাহাকে নামাইতে পারে?'

শিবনাথ বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি তাঁর 'ভুবন বিখ্যাত' দয়ার জন্য বলেছেন। এবং সেই দয়া জাতিধর্ম নির্বিশেষে সঞ্চারমান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর একেই বলেছেন, 'বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার।'

অকৃত্রিমতা বিদ্যাসাগরের আর একটি লক্ষণীয় গুণ। বিদ্যাসাগর 'গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্নসম্ভূত, প্রকাণ্ড ওক্ বৃক্ষের ন্যায় শৈবাল রাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন…তাঁহাতে তাজা খাঁটি মানুষের সন্ধান' ছিল।

আপন জীবনের উপর বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রভাবের কথা শিবনাথ অন্যত্র বলেছেন, 'His memory is a precious legacy, and I shall cherish it till death closes upon me ; and a part only, a small part of that legacy I leave behind for those who are coming after us'.[১]

১। Shivanath Sastri, Pandit Iswarchandra Vidyasagar, Men I have Seen, P p. 19.

'এ জীবনের অন্যতম গুরু' কেশবচন্দ্রের দান সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধটিতে[১] শিবনাথ দেবেন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে অনুসৃত আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। শিবনাথ প্রথমেই কেশবচন্দ্রের সমালোচনা করে তারপর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। নববিধানের প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন প্রভৃতির কারণে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। সেকথা মনে রেখেও শিবনাথ তাঁর মহৎ দানের উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন, (১) সর্বাবস্থায় ঈশ্বরে আস্থা স্থাপনের যে শিক্ষা কেশবচন্দ্র দিয়েছিলেন, তা তৎকালীন নাস্তিক্যধর্মী যুবচিত্তকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিল; (২) ঈশ্বর-সাধনার সঙ্গে মানবের সামাজিক জীবনের কোন বিরোধ নেই—কেশবচন্দ্রের এই মত যথার্থ; (৩) ব্রাহ্মসমাজে পাপবোধ বা অনুতাপের কথা প্রচার কেশবচন্দ্রই প্রথম করেছিলেন—সেদিক থেকে তাঁর মতের একটা গুরুত্ব আছে; (৪) কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন—পরবর্তীকালে একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে; (৫) ব্রাহ্মসমাজে তিনিই প্রথম জ্ঞানমার্গের পরিবর্তে ভক্তিমার্গের কথা প্রচার করেছিলেন—এদিক থেকে তাঁর একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে; (৬) সকলে মিলে একসঙ্গে ঈশ্বরাধনার নির্দেশও কেশবচন্দ্রই প্রথম ব্রাহ্ম-সমাজে দিয়েছিলেন— সমবেত ঈশ্বর-সাধনার মূল্যও অনস্বীকার্য।

প্রবন্ধের উপসংহারে শিবনাথ রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দানের সমষ্টিগত মূল্যায়ন করে ব্রাহ্মসমাজের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, ধর্মক্ষেত্রে কেশব ও শিবনাথ দুই বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ অপক্ষপাতগুণে শিবনাথ কেশবচন্দ্রের যে মূল্যায়ন করেছেন, তা পরবর্তীকালেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং তার ফলেই কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হয়েছে। শিবনাথ অন্য একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্রের প্রতি এই বলে ভক্তি নিবেদন করেছেন যে, 'বঙ্গদেশ যখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যের সমুত্থান হইয়াছিল। আবার চারিশত বর্ষ পরে যখন বঙ্গভূমি-ভারতভূমি পতিত দশাপন্ন, তখন এখানে মহাপুরুষদের সমাগম

১। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজকে কি দিয়েছেন?' নামে ১৩১০ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা।

হইল। আজ যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আমরা এখানে সমাগত, তিনি সেই শ্রেণীর একজন মহাপুরুষ।···সকল নিষ্ঠুর ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা এবং প্রভু পরমেশ্বরে তাঁহার একান্ত নির্ভর তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক।[১]

'We came into the world in the same year—1847, entered the church on the same day, and were from that day united in love and spiritual companionship'[২] বলেছিলেন শিবনাথ বন্ধুবর আনন্দমোহন বসুর সম্পর্কে। অন্যত্র বলেছেন 'সৌভাগ্যক্রমে এ জীবনে কতগুলি লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদের শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রেমকে অধিকার করিয়াছে। আমার হৃদয়ের অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন যৌবনসুহৃৎ আনন্দমোহন বসু ইহার একজন।'[৩] উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, উচ্চ শিক্ষার পথিকৃৎ আনন্দমোহনের জীবন শিবনাথের কাছে আদর্শস্থল ছিল। মনে রাখতে হবে, আনন্দমোহন শিবনাথের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু বহুক্ষেত্রে শিবনাথ এই গৌরবময় বন্ধুকে গুরুর আসনে বসিয়ে যোগ্য অর্ঘ্য দান করেছেন। ভারতের প্রথম র‍্যাঙ্গলার, সিটি কলেজ ও ভারত সভার প্রতিষ্ঠাতা, নিরলস এই কর্মীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী শিবনাথ 'মুকুল'[৪] পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

'নিজের নাম বলিলেই সকলে' যাঁদের চিনতে পারেন, 'এই সকল মানুষকে স্বনামা পুরুষ বলে।···এরূপ লোকের সংখ্যা যে দেশে যত অধিক সে দেশ তত উন্নত।'[৫] 'বিশেষ যাঁহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মিয়া' আপনগুণে বড় হয়েছেন, তাঁদের জীবন আলোচনা শিবনাথের কাছে বড়ই স্পৃহণীয় ছিল। প্রসঙ্গত, শিবনাথের আপন জীবনের ক্রমোন্নতিও এই প্রকার ছিল। কৃষ্ণদাস পাল, রঙ্গনাথ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র রায়—এঁরা প্রত্যেকেই

১। স্কটিশ চার্চ কলেজ ৮. ১. ১৯১০ তারিখে কেশবচন্দ্রের জন্মদিবসে প্রদত্ত। G. C. Banerjee সম্পাদিত 'Keshub as seen by his opponents' (1930) গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ১০৭-১০।

২। Shivana h Sastri. Anandamohan Bose, Men I have Seen, Pp. 40.

৩। প্রদীপ, আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০৫, পৃঃ ৩৬৬-৭০।

৪। মুকুল, ভাদ্র ১৩০৫।

৫। মুকুল, বৈশাখ ১৩০৪।

'গরীব ও অসহায় অবস্থা' থেকে ধীরে ধীরে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। আবার জেমসেটজী তাতা অশেষ শ্রমের দ্বারা উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন, তাও এ. দেশের পক্ষে সর্বদা অনুকরণযোগ্য বলে শিবনাথ মনে করতেন। ম্যাক্সমূলারের সংস্কৃতে অনুরাগ এবং প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন তাঁকে জগতের চক্ষে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। 'যে ব্যক্তির জ্ঞানলাভে রুচি নাই বা যে শ্রম করিতে কাতর, সে কখনও এ পৃথিবীতে কোনও বড় কাজ করিয়া তুলিতে পারে না'—এই ছিল শিবনাথের বিশ্বাস। জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়।

দেশের গৌরব শিবনাথের অন্তরে নিত্য প্রেরণা দান করতো। তাই অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সিবিল সার্বিস পরীক্ষাতে সর্বপ্রথম' স্থানাধিকার তাঁর চিত্তকে আনন্দ দান করেছিল। ক্রিকেটবিদ্ রণজিৎ সিংহ ও কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস উভয়েই শিবনাথের কাছে আগামী ভারতের 'নূতন দিনের' পথকর্তা হিসাবে বন্দিত হয়েছেন।[১]

লক্ষণীয় যে, শিবনাথের গৌরববোধ শুধু স্বজাতিতেই আবদ্ধ ছিল না, স্বদেশবাসী ও বিদেশী উভয়েই তাঁর কাছে সমশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আশাবাদী শিবনাথ ভারতের নূতন যুগকে আপন প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করেছিলেন, দর্শন করেছিলেন জ্ঞানবীর ও কর্মবীরদের বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে।

॥ ৩ ॥

স্বজাতির সম্পর্কে আত্যন্তিক গর্ব অনুভব করতেন শিবনাথ। তাঁর রচিত জীবনচরিতগুলি প্রশস্তিমূলক ও সংক্ষিপ্ত। অতিরিক্ত তথ্যভারে এগুলি দুর্বহ হয়ে ওঠে নি। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, বিপিনচন্দ্র পালের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও ভাষার ফুলঝুরি শিবনাথে অনুপস্থিত। কিন্তু মনোজীবনের মুখ্যদিকগুলি শিবনাথের রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাপুরুষদের অন্তর্জীবন থেকে নানা সত্য উদ্ধার করে শিবনাথ তাঁদের মৌলিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

১। জীবনীগুলি যথাক্রমে 'মুকুল' বৈশাখ ১৩০৪, আষাঢ় ১৩০৭, বৈশাখ ১৩০৫, ফাল্গুন ১৩০৭, অগ্রহায়ণ ১৩০৭ এবং পৌষ ১৩০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্র রায় সম্পর্কে আরও একটি রচনা দ্রষ্টব্য, সাধুজীবন (১৮৯১) পৃঃ ১-২৪।

উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতের জীবনের সার্বিক পরিবর্তন কতকগুলি মনীষীর চরিত্রকে অবলম্বন করে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে শিবনাথ এই চরিত্রগুলির মূল তত্ত্বকে নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন।

আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছাড়া এঁদের আলোচনা করার আরও একটা উদ্দেশ্য শিবনাথের ছিল বলে মনে হয়। আমরা দেখেছি, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য শিক্ষাসর্বস্ব একদল যুবক বার বার বলেছেন, 'If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism'[১] একদল আবার মেকলের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, 'a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.' দেশের মাটির সঙ্গে এই শিক্ষার যোগ যে কতখানি হয়েছিল সে সময়ে, এ থেকে সেকথা বোঝা যাচ্ছিল। অর্থাৎ এক কথায় 'ভীরু বাঙালীর' আন্তর সম্পদ বলে কিছু নেই, এমন একটা ধারণা সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। শিবনাথ সঙ্গত কারণেই হিন্দু কলেজের উপর্যুক্ত নবাবঙ্গগণের ব্যবহারের অনুমোদন করেন নি। সেকারণেই রামমোহন থেকে সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি চরিত্র আলোচনা করে তিনি দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, এঁদের মধ্যে যে সম্ভাবনা সঞ্চিত ছিল, একটা জাতির সার্বিক জাগরণের পক্ষে তা ছিল প্রচুর। শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য, ক্রীড়াজগৎ, ধর্মজগৎ—জীবনের সব ক্ষেত্রেই বাঙালী যে পশ্চাদ্‌পদ নয়, সেকথাই শিবনাথ বড় করে বাঙালীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। গভীর স্বদেশ-প্রেমই তাঁকে এই জীবনী রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি।

কবি ও ভাবুকের চোখে 'জীবনের গভীর সত্য, অনতিপ্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও মর্যাদা ধরা' পড়ে। জীবন সমালোচকের চোখে ধরা পড়ে তার ভাল-মন্দের কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এই দুই দৃষ্টি নিয়ে জীবনীগুলি রচনা করেছিলেন বলে তাদের মধ্যে উদ্দিষ্ট চরিত্রগুলির আন্তর-সৌন্দর্য যেমন দেখতে পেয়েছেন, তেমনি দেখতে পেয়েছেন তাদের ভাল-মন্দের কার্য-কারণ শৃঙ্খলা।

১। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের উক্তি।

॥ ৪ ॥

"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (২৫.১.১৯০৪)। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় অবশ্য ১১ই ডিসেম্বর ১৯০৩—এই তারিখ দেওয়া আছে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার বহুপূর্বেই শিবনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন সম্পর্কে একাধিক রচনা প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমেই সেগুলির উল্লেখ করছি। এগুলি শিশুপাঠ্য জীবনী হিসাবেই স্বীকৃত, ইতিহাস হিসাবে নয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে শিবনাথের পরিচয় হয়। তারপর তাঁর সম্পর্কে শিবনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'সখা' পত্রিকায় (মার্চ, ১৮৮৫, পৃঃ ৪১-৪৫)। আরও পরে এই রচনাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে রামতনুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আশ্বিন ১৩০৫ সংখ্যার 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি একটি নিতান্তই শিশুপাঠ্য রচনা ; কিন্তু রামতনুর জীবন-বিকাশের ক্রম ও গুণাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত। প্রথম রচনাটি (পরিচয়ের ১৬ বৎসরের মধ্যে) লাহিড়ী মহাশয়ের জীবৎকালে রচিত বলে এটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে রামতনু লাহিড়ীর জীবনাবসান ঘটে। এই সময়ে 'তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাঁহার পুত্র শরৎকুমারও আমাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। গৃহে আসিয়া ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার একখানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা হইল।'[১] সেই ইচ্ছানুসারে শিবনাথ কেবলমাত্র লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরাগীদের জন্য একটি 'ক্ষুদ্রাকার জীবন-চরিত' লেখার পরিকল্পনা করেন, 'কিন্তু তৎপরে মনে হইল, লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোদ্যমে রাম-মোহন রায়, ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাগুরু তাঁহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গসমাজের

১। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সর্ববিধ উন্নতি ঘটিয়াছে; এবং সেই প্রভাব এই সুদূর সময় পর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে। আবার সেই উন্নতির স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া অত্যগ্রসর দলের সঙ্গে মিশিয়াছেন, এরূপ দুই একটি মাত্র মানুষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় একজন। অতএব তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।'[১] অর্থাৎ 'রামতনু লাহিড়ী'র সঙ্গে 'তৎকালীন বঙ্গসমাজ' যুক্ত হল।

বঙ্গ ইতিহাসের এক সম্ভাবনাময় যুগে আবির্ভূত এবং সেই যুগের সমাজ-সংস্কারের অন্যতম নায়ক রামতনুর জীবনালোচনার আরও একটা ব্যক্তিগত কারণ আছে; তা হল রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কে শিবনাথের অশেষ শ্রদ্ধা। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে শিবনাথ পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে পটলডাঙ্গা মীরজাফর্‌স্ লেনে হরগোপাল সরকারের সঙ্গে একত্র বাসা করলেন। হরগোপালবাবুর সঙ্গে রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ হয়। তিনি ব্যতীত অন্নদায়িনীর ভগিনী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীও ঐ একই বাসায় থাকতেন। 'বিশেষত ইঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে রামতনুবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া তাঁহাতে আমি সাধুতার যে আদর্শ দেখিলাম তাহা ভুলিবার নহে।'[২] সে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

তারপর দীর্ঘ উনত্রিশ বছরের গাঢ় পরিচয় শিবনাথকে লাহিড়ী মহাশয়ের একান্ত ভক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্রন্থটির রচনারম্ভ বা প্রকাশ সম্ভব হয় নি। এই বিলম্বের একটি কারণ লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন, তা হল, গ্রন্থটিকে সর্বপ্রকার তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য 'বহু অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ'পাঠে সময় দান।

দীর্ঘ তিন বছর অধ্যয়নের পর ১৯০১ সালের শেষভাগ নাগাদ এই গ্রন্থ রচনার কাজে শিবনাথ হস্তক্ষেপ করেন বলে অনুমান করি। এ ব্যাপারে আমরা শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীর কোন কোন অংশ প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করছি। 'ঘরে বসিয়া রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত গ্রন্থের কিয়দংশ লিখিলাম।' (১৫.১২. ১৯০১-খাণ্ডোয়া)। এই তারিখের পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা

১। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৯৮-৯৯

সম্পর্কে কোন উল্লেখ ডায়েরীতে দেখিনি। খাণ্ডোয়া বাসকালে ১.১.১৯০২ তারিখের ডায়েরীতেও 'রামতনুবাবুর জীবনচরিত' রচনার কথা পাই। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর সেপ্টেম্বর ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন—'বেড়াইয়া আসিয়া রামতনু লাহিড়ীর জীবন চরিতের এক ফরমার প্রুফ দেখিলাম' (বালিগঞ্জ, ২.৯.১৯০৩, বুধবার)। এবং ৯.৯.১৯০৩ তারিখে লিখেছেন—'রামতনু-চরিতের ১১শ অধ্যায় লিখিতে বসিলাম।' গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয় ১৪ই অক্টোবর ১৯০৩ তারিখে—'রামতনু লাহিড়ী জীবনচরিতের অবশিষ্টাংশ লিখিলাম।'

'রামতনু লাহিড়ী ও বঙ্গসমাজ' ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশের ইতিহাসের একখানি প্রামাণ্য দলিল। গ্রন্থটিকে তথ্যবহুল এবং ইতিহাসানুগ করার ব্যাপারে শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নের ক্রটি ছিল না। তৎকালীন সমাজেতিহাস জানার জন্য প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অধ্যয়ন করেছেন—সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে যে পরিবর্তন, সংস্কার ও উন্নতি সূচিত হয়েছিল, তার অংশভাক্ ছিলেন। সেকথা স্মরণ করেই আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, 'এই ঘটনাবহুল অবস্থার বৈষম্য ও বিভিন্ন মতের প্রচারে বিচিত্রভাবে পুষ্ট, নবচ্ছন্দে বিকাশোন্মুখ যুগের ইতিহাস শাস্ত্রী মহাশয় নখদর্পণে দেখিয়াছেন। তিনি প্রাঞ্জল ও কৌতূহলোদ্দীপক সুন্দর ভাষার আকর্ষণে আমাদিগকে মুগ্ধের ন্যায় টানিয়া লইয়া বিগত অর্ধ শতাব্দীর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন।'[১] ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও স্মৃতিনির্ভরতা ব্যতীত তিনি তৎকালে প্রাপ্তব্য সকল প্রকার রচনাপাঠ এবং ওয়াকিবহাল সকল মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকা, লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যক্তিগত ডায়েরী ও অন্যান্য বহু ব্যক্তির ডায়েরী, আত্মজীবনী (যথা, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী), নানা চরিতগ্রন্থ ও ইতিহাসগ্রন্থ, প্রচলিত কিংবদন্তী প্রভৃতি থেকে তিনি এই ইতিহাসাখ্য গ্রন্থটির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। শিবনাথের উপাদান সংগ্রহের সেই কাহিনী তাঁর ডায়েরী থেকে কতকটা জানতে পারি—'বেড়াইয়া আসিয়া…রামতনুবাবুর নামে

১। বঙ্গসাহিত্যের মাসিক বিবরণী—সাহিত্য (৬) চরিত শাখা, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃঃ ১৮১।

লিখিত প্রায় ৩৩ খানি পত্র পড়িয়া তাহা হইতে notes লইলাম' (বালিগঞ্জ, ২.৯.১৯০৩)। অথবা 'শরৎকুমার লাহিড়ী পুত্রসহ আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পিতার জীবনচরিত বিষয়ে অনেক কথা হইল।' (৩০.৯.১৯০৩)।

'১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্রমাসে বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়।'[১] আর '...১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে একদিন তিনি কেমন করিয়া খাট হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।...অবশেষে ঐ সালের ১৩ই আগষ্ট দিবসে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।'[২] রামতনু লাহিড়ীর পঁচাশি বৎসরের এই দীর্ঘ জীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে শিবনাথ কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস এবং যে পরিবেশে রামতনুর জন্ম হয়েছিল, তৎকালীন বঙ্গদেশের সেই ক্ষয়িষ্ণু রূপটিকে ভূমিকা হিসাবে অত্যন্ত সরসভাবে বর্ণনা করেছেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামতনুর জন্ম এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের কলকাতায় আগমন ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গদেশের রেনেসাঁসের জন্ম—এই ঘটনাগুলি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। আবার ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রামতনুর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশের উনিশ শতকীয় নব-জাগরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বয়ং রামতনু লাহিড়ী। বঙ্গদেশের এই সময়ের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে শিবনাথ যে রামতনুর জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন—তাতে তাঁর ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রামতনু ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রজ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কলকাতায় আসেন এবং অশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে ডেভিড্ হেয়ারের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হন এবং হেয়ারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজে আসেন। সে সময়ে হিন্দু কলেজে দিগম্বর মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকীয় Intellectual giants-গণ বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছিলেন। এখানে তিনি গুরু হিসাবে ডিরোজিওকে বরণ করেন এবং তাঁর মনে 'মহাবিপ্লব ঘটিতে লাগিল।' যাই হোক, '১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিন্দু কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ঐ কালেজে এক নিম্নতন শিক্ষকের কর্ম পাইলেন।'

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃঃ ২৭।
২। তদেব, পৃঃ ৩০৯।

১৮৪৬ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে যোগ দেন। এই শিক্ষকতা কার্যে রামতনুর দক্ষতা তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। শিবনাথ বিস্তৃতভাবে তাঁর অধ্যাপনা প্রণালীর বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অবসর গ্রহণোপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগর কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ আল্‌ফ্রেড্ স্মিথ যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, 'In parting with Baboo Ram Tanoo Lahiri I may be allowed to say that Government will lose the services of an educational officer, than whom no officer has discharged his public duties with greater fidelity, zeal and devotion, or has laboured more assiduously and successfully for the moral elevation of his pupils'.[১] এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর প্রথম যুগের শিক্ষাপ্রাপ্ত, ডিরোজিওর শিষ্য রামতনু জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষা পদ্ধতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তার ফলে উনিশ শতকের শিক্ষাপদ্ধতিরও বহুলাংশে উজ্জীবন ঘটেছিল। গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য—'স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় এই বিচিত্র ইতিবৃত্তে এক সম্ভ্রমজনক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নব-প্রবর্তিত যুগের দোষের লেশ স্পর্শ করে নাই, নব শিক্ষা তাঁহাকে উদার বিশ্বহিতের পথে নিয়োগ করিয়াছিল, উহা উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তির মুখে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই।...তাঁহার সাধুজীবন নিঃশব্দে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই প্রভাব কবির লেখনী ও সংস্কারকদের আগ্রহকে অলক্ষিতভাবে নিয়মিত করিয়া সমগ্র শিক্ষিত সমাজটিকে স্বীয় পুণ্যগণ্ডীর মধ্যে আনিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।'[২]

জীবনীগ্রন্থ হিসাবে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর প্রসিদ্ধি তর্কাতীত। শুধুমাত্র লাহিড়ী মহাশয়ের নয়, বাংলার তৎকালীন যে সকল মনীষী নব-জাগরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের

১। তদেব, পৃঃ ২১৮।

২। বঙ্গসাহিত্যের মাসিক বিবরণী—সাহিত্য (৬) চরিত শাখা, ভারতী. জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।

প্রায় প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যমূলক বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত হলেও বর্তমানকালে সুলভ নয় এমন বহু জীবনচরিতের মূল্যবান সংকলন হচ্ছে এই গ্রন্থটি। উনিশ শতকের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সম্পর্কে এই প্রকার আকর-গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নেই, এমন মন্তব্য অযৌক্তিক হবে না।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' চরিতগ্রন্থ হিসাবে রচিত হলেও গ্রন্থটির মূল্য-এর ঐতিহাসিকতায়। শিবনাথ একথা জানতেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, 'মনে এই একটা সন্তোষ রহিল যে, বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম; এবং যে সকল মানুষ জন্মিয়া বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের স্থূল কথা রাখিয়া গেলাম।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যোগ্য যে, তিনি History of Brahmo Samaj (Vol. I & II) গ্রন্থও লিখেছিলেন।

যাঁরা সত্যই বড়, সাধারণের সঙ্গে থাকে তাঁদের নিবিড় সংযোগ: ফলে তাঁদের জীবন জাতীয় চিন্তা ও সাধনার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে মনে হয়, বাংলাদেশের মানুষের ইতিবৃত্ত রচনায় শিবনাথ ছিলেন পথপ্রদর্শক।

অন্যদিকে গ্রন্থটি হচ্ছে এক শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে অনুশীলিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সমন্বায়িত ইতিহাস। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক স্যার রোপার লেথব্রিজ তাই মন্তব্য করেছেন,[১] 'The pandit's work is quite the most scholarly book of its kind, as well as the most serious and sustained effort to combine, in a biographical work, Oriental and Western modes of thought, that has yet appeared in Bengali.'

১। Ramtanu Lahiri/Brahmin and Reformar/A History of the Renaissance in Bengal/from the Bengali of/Pandit Sivanath Sastri M.A./Edited by/ Sir Roper Lethbridge, K.C.I.E./Late Scholar of Exeter College, Oxford/ Formerly Principal of Krishnagar College, Bengal/and Fellow/of the Calcutta University./With Twenty-nine illustrations./London/Swan Sonnenschein and Co. Limited/Calcutta : S. K. Lahiri & Co./1907, Vide, Editor's Preface.

তাছাড়া সেকালের বড মানুষের এই বিবরণে সজ্জমনেরও[১] একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিত্র আরও সাবলীল হয়ে উঠেছে শিবনাথের পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টির স্বচ্ছতায়। মনে রাখতে হবে শিবনাথ এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ফলে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সম্পর্কে ভিন্নতর মনোভাব হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু শিবনাথ ছিলেন অসাধারণ পক্ষপাতশূন্য মনের অধিকারী এবং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক। ফলে অন্ধ-ভক্তি বা তীব্র বিদ্বেষ কোনটিই গ্রন্থের ঐতিহাসিকতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

গ্রন্থটির অপর বৈশিষ্ট্য গ্রন্থের কালপর্ব বিভাগের কৌশলে। পনেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক একটি কালপর্বের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে। শিবনাথ ১৮২৫-৪৫ পর্বকে 'বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল' ও ১৮৫৬-৬১ পর্বকে 'বঙ্গসমাজের মাহেন্দ্রক্ষণ' বলে যেমন নির্দেশ করেছেন, তেমনি ১৮৭০-৭৯ পর্বকে 'ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই পর্ববিভাগ স্পষ্টতঃই তাঁর ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দেয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্রন্থটি কি সামগ্রিক দৃষ্টিতে যথার্থই ইতিহাসের মর্যাদা পেতে পারে? কারণ উপাদান সংগ্রহ পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আপন জীবনের স্মৃতিসম্ভার, প্রচলিত কিংবদন্তী, জীবিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও এই গ্রন্থরচনায় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রকার উপাদান ইতিহাসের প্রকৃতিকে বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে, সন্দেহ নেই। কারণ কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক মূল্য বহুক্ষেত্রে নগণ্য। ফলে গ্রন্থটির প্রারম্ভে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে শিবনাথ যে সব কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন, সেগুলি পুরোপুরি ইতিহাসের বিষয় কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। এই প্রকারের ত্রুটির কথা মনে রেখেও বলা চলে যে, গ্রন্থটিতে সামগ্রিকভাবে সমাজের রূপটি ধরা পড়েছে। তবে যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রত্যক্ষ দর্শক ছিলেন শিবনাথ, তার বর্ণনা অপেক্ষা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বর্ণনা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে কিছুটা মলিন বলে মনে হয়।

১। যোগানন্দ দাস, ১৩৩৯ : তত্ত্ববোধিনী সভার শতাব্দ বৎসর, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৫।

শিবনাথ নিজেও গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত মনে করতেন না।[১] প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'আমি ইহা নিজেই অনুভব করিতেছি যে এই প্রথম সংস্করণে অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি থাকিয়া গেল।' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টার অবধি ছিল না। তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে এই প্রকারের চেষ্টার উল্লেখ দেখি।—অন্যান্য কাজের মধ্যে 'রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিতের জন্য দুর্গামোহন দাসের জীবনচরিত revise করা' শিবনাথের ২২-১২-১৯০৮ তারিখের কাজ ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পরও যে গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত হয়েছে, সে কথাও শিবনাথ দাবী করেন নি—'…এ সংস্করণটি যে নির্দোষ হইল এমন মনে করা যায় না।'

আমরা এই গ্রন্থের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করছি।[২] ত্রুটিগুলি প্রধানতঃ সাল তারিখের উল্লেখ-সংক্রান্ত। রামমোহনের জন্মকাল শিবনাথ উল্লেখ করেছেন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে। তারিখটি বিতর্কমূলক। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার আনুমানিক প্রকাশকাল '১৮৫৭ কি ৫৮ সাল' বলে শিবনাথ উল্লেখ করেছেন। সঠিক তারিখটি হল, ১৮৫৪। একাডেমিক এসোসিয়েশন ১৮৪৩ সালের বহু পূর্বে ১৮৩৯ সালে উঠে যায়। দেবেন্দ্রনাথের জন্মের সঠিক তারিখ ১৮১৭ বলে উল্লিখিত হলেও তার পূর্বে 'অনুমান' শব্দটি অযথার্থ। রাজেন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল '১৮৫৩ সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারম্ভে' বলে উল্লিখিত হয়েছে। আসলে ঐ তারিখ ২রা মে ১৮৫৩ হবে। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রকাশকাল শিবনাথ বলেছেন ১৮৫৮। সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক তারিখ বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশকাল। শিবনাথ রামগতি ন্যায়-রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) এবং রমেশচন্দ্র দত্তের Literature of Bengal (1895, Revised Edn.)-এর অনুকরণে দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশকাল ১৮৬৪ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ

১। 'আধুনিক কালে ঊনবিংশ শতকের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি পূর্ণতা পেয়েছে এবং এই গ্রন্থের অনেক ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি জ্ঞানগোচর হয়েছে।'—প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস-সাধনা (১৩৬০), পৃঃ ৫৪-৫৫।

২। অন্য কয়েকটি ত্রুটি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, আমার পড়াশুনা, শনিবারের চিঠি. বৈশাখ ১৩৭৫।

দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে 'ইং ১৮৬৫' সালটি মুদ্রিত আছে। তাছাড়া শিবনাথের মাতুলের সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ১৩ই বৈশাখ ১২৭২ সংখ্যায় দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনা করা হয়েছিল।

আরও কয়েকটি ত্রুটি পরবর্তীকালের গবেষণায় ধরা পড়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র এই জাতীয় ত্রুটিগুলির উপর নির্ভর করে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মর্যাদা বিচার করা উচিত হবে না। কারণ সমসাময়িক তথ্য সংগ্রহে শিবনাথকে যে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার কথাও মনে রাখতে হবে। শিবনাথের গ্রন্থ-রচনায় নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'যে মহাত্মার জীবনচরিত অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার সহিত এই ক্ষুদ্র সমালোচক বিশেষ পরিচিত। কাজেই বলিতে পারি যে, কোথাও কোন কথা তিলমাত্র অতিরঞ্জিত হয় নাই; বরং কোন কোন বিষয়ে আরও অধিক কথা লিখিলে ক্ষতি হইত না। কিন্তু গ্রন্থকার হয়ত এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।'[১]

গ্রন্থটির আকর্ষণ অন্য একটি কারণেও। তা হল এই গ্রন্থের বর্ণনা ও ভাষার অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি। শিবনাথের ভাষায় এমন একটা সারল্য ও যাদুশক্তি আছে যে, পাঠকমাত্রেরই অন্তরে তা আগ্রহ ও উৎসাহ জাগিয়ে তোলে। লেখকের আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শ প্রতি বাক্যের মধ্যে যেন পরিব্যাপ্ত। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে অঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত এক উদ্যানে বালক রামতনুর ভ্রমণবিহারের বর্ণনা (পৃঃ ৩৪-৩৫), ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশের বিবরণ এবং রামতনুর জীবনাবশেষের চিত্র তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অতি কঠিন তৎসম শব্দের পরিমিত ব্যবহার, সাধারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বাক্য ও আবেগবহুল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রবহমান বাক্য ব্যবহার ভাষার মধ্যে সহজেই মিষ্টতা ও বৈচিত্র্য সঞ্চারে সমর্থ হয়েছে। লেখকের স্বভাবসিদ্ধ শব্দ-শুচিতার স্পর্শও যেন তাতে পাওয়া যায়।

চিত্রসম্পদ্ গ্রন্থখানির অপর এক বৈশিষ্ট্য। প্রথম তিনটি সংস্করণই ৩৫টি চিত্র-সম্বলিত ছিল। এর কোন কোনটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। প্রাচীন বাংলার কোন জীবনী গ্রন্থ এতগুলি চিত্র যুক্ত ছিল না। এটিও পাঠকের একটি বড় আকর্ষণস্থল ছিল।

১। গ্রন্থসমালোচনা, প্রবাসী, চৈত্র ১৩১০, পৃঃ ৫৫৪-৫৫।

॥ ৫ ॥

আত্মচরিত ॥

আত্মজীবনী রচনায় শিবনাথ বরাবর অনিচ্ছুক ছিলেন। এমনকি তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী শিবনাথের জীবনী লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিবনাথ আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন, 'ছি ছি এমন কাজ করিও না।······ আমার আবার জীবনচরিত লেখা হইবে ভাবিলেও আমার লজ্জা হয়।'[১] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিবনাথকে আত্মজীবনী রচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁকে লিখিত কবির একটি চিঠিতে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন[২] 'নিজের জীবনবৃত্ত লিখিতে আপনি যখন অনিচ্ছুক, তখন আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম। এক্ষণে অবসর মত ভারতীর জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব।' পত্র রচনার তারিখ ৮ই শ্রাবণ ১৩০৫। এই পত্রটি থেকে আত্মচরিত রচনায় শিবনাথের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রাথমিক নিস্পৃহতা সত্ত্বেও শিবনাথ স্বীয় জীবনচরিত মৃত্যুর এক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গেছেন। এর দুটি কারণ অনুমান করি। এক রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ ও দুই লাবণ্যপ্রভা বসুর সাক্ষাৎ তাগিদ—যাঁকে শিবনাথ জীবনে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন বলে তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরীতে উল্লেখ করেছেন। হেমলতা দেবী লিখেছেন, 'তাঁরই বিশেষ অনুরোধে শিবনাথ "আত্মজীবনী" লিখিতে আরম্ভ করেন।'[৩]

অবশ্য লাবণ্য দেবী কখন এই প্রকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবুও রবীন্দ্রনাথের অনুরোধের প্রায় চার বছর পরে তিনি অপ্রকাশিত 'আত্মচরিতের খসড়া' (যাকে আমরা অন্যত্র হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা নামে উল্লেখ করেছি) রচনা করতে আরম্ভ করেন পুত্র প্রিয়নাথ কর্তৃক প্রদত্ত একটি খাতায়। রচনারম্ভের তারিখ ২৯.১১.১৯০২। এটি সমাপ্ত হয় ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখে।

১। হেমলতা দেবী, গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন, শিবনাথ-জীবনী।
২। পত্রটির মুদ্রিত প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৩, পৃঃ ৬৭।
৩। শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ২৮৪।

কিন্তু এর মধ্যেই তিনি প্রকাশিত 'আত্মচরিত' রচনায় হাত দেন বলে অনুমান করি। ৩.৯.১৯০৩ তারিখের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে শিবনাথ লিখেছেন, 'বেড়াইয়া আসিয়া আমার জীবনচরিতের অনেকটা লিখিলাম।' রচনা-সমাপ্তির তারিখ আত্মচরিতে দেওয়া আছে ৫ই জুন ১৯০৮। কিন্তু ডায়েরী পাঠে জানতে পারি যে, অন্ততঃ ২৩এ জুন ১৯০৮ পর্যন্ত 'আত্মচরিত' রচিত হয়েছিল।[১] তারপর তিনি ৩০এ জুন তারিখে যাঁর একান্ত অনুরোধে এই আত্মচরিত লেখা হয়েছিল, তাঁকে পাণ্ডুলিপিটি পাঠের জন্য দিয়ে আসেন, 'আজ প্রাতে লাবণ্যকে আত্মজীবনচরিতখানা দিয়া আসিলাম।'[২] এরও বহু পরে সম্ভবতঃ মুদ্রণের প্রয়োজনে তিনি আত্মচরিতখানি সংশোধন করেন—'আত্মজীবন কতকটা revise করি।'[৩] আত্মচরিত রচনায় শিবনাথের অনিচ্ছার আরও একটা প্রমাণ যে ১৯০৮ সালের মধ্যে রচিত হলেও গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় আরও দশ বছর পরে। গ্রন্থটি রচনার এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শিবনাথের আত্মচরিত প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি আত্মচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (১৮৯৮) দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী (১৯০৪এ গ্রন্থাকারে), রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৯০৯) প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ রাজনারায়ণ বসুর মতই সুলিখিত জীবন-চরিতের নাম আত্মজীবনী না দিয়ে 'আত্মচরিত' লিখেছেন। ডায়েরীতেও বার বার 'আত্মচরিত' কথাটির উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির নামকরণ সঙ্গত হয়েছে; এতে তাঁর চারিত্রিক ভাল-মন্দের কথাই অকপটে আলোচিত হয়েছে।

জীবনী লেখা নির্ভর করে কোন ব্যক্তির জীবনের নানা ঘটনাকে শিল্পসম্মতভাবে একত্রে নিবদ্ধ করার কৌশলের উপর। কিন্তু আত্মচরিত রচনার মূল প্রেরণা হল, আত্মোপলব্ধি। সেই আত্মোপলব্ধিকে প্রমূর্ত করতে

১। 'অদ্য আমার সুলিখিত জীবনচরিতে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার অনেকটা লিখিয়া ফেলিলাম।'—অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ—২৩. ৬. ১৯০৮।

২। তদেব, ৩০. ৬. ১৯০৮।

৩। তদেব, ১৭. ৫. ১৯০৯।

হলে নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। তাই আত্মজীবনী রচনার প্রথম শর্ত তথ্যনিষ্ঠা।

শিবনাথ যখন এই আত্মচরিত রচনা শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন বছর। এই বয়সে স্বাভাবিকভাবেই বাল্যকালের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী শিবনাথের মানসপটে বাল্যকালের ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত ছিল বলে, আত্মচরিতের প্রথমভাগ তথ্যবহুল ও যথাযথ হয়েছে। তবুও একটা জিনিষ লক্ষণীয় যে, আত্মচরিতের প্রথম দিকে সাল-তারিখের উল্লেখের সময় শিবনাথ স্থিরনিশ্চয় হতে পারেন নি। এর কারণ পঞ্চান্ন বছর বয়সে পনেরো বছর বয়সের ইতিহাস লিখতে গিয়ে স্মৃতির উপর তাঁকে বহুল পরিমাণে নির্ভর করতে হয়েছিল।

পূর্বেই একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৭৮ সাল থেকেই তিনি ডায়েরী লিখতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও প্রায় আমৃত্যু তিনি ডায়েরী লিখেছেন। আত্মচরিত রচনাকালে শিবনাথ এই ডায়েরীগুলি ব্যবহার করেছিলেন এবং একারণেই এই সময় থেকে (১৮৭৮ সাল) আত্মচরিতের বিবরণ যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমন সঠিক সনতারিখ যুক্ত। বর্ণনাও তাই অধিক জীবন্ত।

আত্মচরিতের তৃতীয় উপাদান হিসাবে চিঠিপত্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই চিঠিগুলি ব্যবহারের ফলে এক একটি বর্ণনা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। মাতুল দ্বারকানাথকে লিখিত নিজের পত্র ও পিতার লিখিত বিভিন্ন পত্র শিবনাথ যে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রাক্কালের বর্ণনায় ব্যবহার করেছিলেন, তা অনেকটা নিশ্চয় করে বলা যায়।

সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিও শিবনাথের আত্মচরিতের উপাদান কিছুটা পরিমাণে জুগিয়েছিল বলে মনে হয়। এগুলির সাহায্য যে তিনি নিয়েছিলেন, তা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। যেমন, বাল্যকালের গদ্য-পদ্যাত্মক রচনাগুলির সন্ধান কেন তিনি দিতে পারলেন না, তা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'অবলা-বান্ধবের পুরাতন ফাইল না পাওয়াতে পারি নাই।'[১] এই প্রকার 'সমালোচক' পত্রিকার ফাইলও তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। আত্মচরিতে উল্লিখিত ভ্রমণমূলক বর্ণনাগুলি তিনি

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২৯।

স্পষ্টতঃই তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিজের পাক্ষিক কার্যাবলীর বিবরণ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[১]

এই প্রসঙ্গে আর একটি উপাদান উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে আত্মচরিতের যে খসড়া রচনা করেন, তাকে ভিত্তি করেই আত্মচরিতের অনেক অংশ রচনা করেন। আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য উভয় রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করছি :—

'কলিকাতা শহরের প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত।···গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানি না, অনুমান করি, এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পোর্তুগিজেরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোর্তুগিজদিগের যাত্রা বিবরণে 'ময়দা' নামে এক গ্রাম এখনো বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, পোর্তুগিজেরা এই পথেই আসিয়া থাকিবে। গ্রামের পার্শ্বে মাঠে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভগ্ন জাহাজ ও বোটের নিদর্শনস্বরূপ অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাদি চলিত। এইরূপে গ্রামখানি যে বহুকালের নয় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।'[২]

'আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি। আমাদের আদি নিবাস জেলা ২৪ পরগণায়, কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব অনুমান ২৮ কি ৩০ মাইল ব্যবধানস্থিত, মজীলপুর গ্রামে। এই গ্রাম এক্ষণে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ঐ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা কোথা হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই।···গ্রামটি গঙ্গার চড়াতে স্থাপিত ছিল। তাহার উভয় পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এখনও মজীলপুর ও জয়নগর এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে গঙ্গার বাদা বলে ; এবং

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের পাক্ষিক কার্যাবলীর বিবরণ তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। শিবনাথ নিজেও একজন প্রচারক ছিলেন, তাঁর কার্যাবলীর বিবরণও পত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রথম পরিচ্ছেদারম্ভ, পৃঃ ১২।

এখনও আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর জল পবিত্র গঙ্গার জল বলিয়া গণ্য হয়। পর্তুগীজগণ যখন প্রথম এদেশে আগমন করেন, তখন এই পথে আসিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার শৈশবে আমি শুনিয়াছি যে গ্রামের পূর্বভাগবর্তী খালে মাটির মধ্যে জাহাজের নঙ্গর কাছি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।'[১] অথবা,

'১৯০১ সালের গ্রীষ্মকালে আমার পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ কটকের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-বন্ধু মধুসূদন রাওর দ্বিতীয়া কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ অদ্য পর্যন্ত একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।'[২]

'১৯০১ সালের এপ্রেল মাসে কটকের সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম মধুসূদন রাও মহাশয়ের কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে প্রিয়নাথের পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।'[৩]

চরিত্র, দৃষ্টি এবং উপলব্ধির বিভিন্নতা হেতু আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক গিবন, সমাজবিপ্লবী রুশো, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর প্রকৃতি তাই কখনই এক নয়। অথচ তিনজনেই সত্য প্রচারের ব্রত নিয়েছিলেন। ঐ একই কারণে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও শিবনাথের আত্মচরিতের মধ্যেও পার্থক্য আছে।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ভগবৎ-উপলব্ধির ইতিহাস। রাজনারায়ণ বসু তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও জীবনাদর্শের একটা সমর্থন দিতে চেয়েছেন 'আত্মচরিতে'। এদিক থেকে তাঁর রচনা Mill-এর Autobiography-র সমগোত্রীয়। 'কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' পাই সত্যিকার আত্মজীবনীর রস। Samuel Pepys-এর যে বিখ্যাত ডায়েরী তার অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি, তার অকপট অথচ আতিশয্যহীন আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতার জন্য এতদিন রসিক-চিত্তের প্রশংসা পেয়ে এসেছে, সেই আদর্শেরই একটা সুন্দর নিদর্শন দেখি শিবনাথের আত্মচরিতে। সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যভাবে অথচ গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অল্প কথায় কেমন করে এক একটি চরিত্র-চিত্রকে

১। শিবনাথের 'হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা', প্রথমাংশ।
২। আত্মচরিত, পৃঃ ২৬৩।
৩। 'হস্তলিখিত কুলপঞ্জিকা'. ১২শ স্তবক।

জীবন্ত করে তোলা যায়, তার অনেক দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন। তা ছাড়া শিবনাথের নিজের জীবনের সাধনাটিরও মূল্য কম নয়। তাঁর পরিজনের ছবি যেমন ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়, তেমনি তাঁর নিজের আদর্শনিষ্ঠা ও আত্মদানের রূপটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি আত্মপ্রচারের।'[১]

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে ঈশ্বরোপলব্ধির যে কথা গভীর অনুভবের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে, শিবনাথের জীবনীতে তা হয় নি। এর একটা কারণ হল যে, দেবেন্দ্রনাথ যতখানি ঈশ্বরভক্ত, ততখানি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। শিবনাথের ঈশ্বরভক্তি ও আধ্যাত্মিকতায় সন্দেহ প্রকাশের কারণ নেই। কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে সমাজের নানা সংস্কারের কাজে। 'বোধ হয় সেই কারণে আত্মচরিতে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ছবি সেরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, যেরূপ আশ্চর্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহর্ষির আত্ম-জীবনীতে।'[২]

শিবনাথ শাস্ত্রী এমন একটা যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে যুগে আপন কর্মচক্রের চতুর্দিকে এক বিদগ্ধ জনমণ্ডলীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। আত্মচরিতে তিনি আপন মহত্ত্বের চেয়ে এঁদের মহত্ত্বকে বহুগুণিত করে দেখেছেন, ভেবেছেন এঁদের মহত্ত্বই তাঁকে বড় হওয়ার পথে অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়েছে। তাই সেই সব বড় মানুষদের কথাই তিনি আত্মচরিতে বড় করে এঁকেছেন। রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর, মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মাতা গোলোকমণি দেবী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তাঁর আত্মচরিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর নিজের কথার চেয়ে পারিপার্শ্বিকের কথা এখানে বড় হয়েছে, শিবনাথ তাই সকলের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

তাছাড়া শিবনাথ একাগ্রভাবে নূতন যুগকে দেখেছেন। সেকারণে

১। সুনীলচন্দ্র সরকার, আমাদের জীবনী সাহিত্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯।

২। গ্রন্থ সমালোচনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক ১৮৪১ শক, পৃঃ ১২৭-২৮।

আপন জীবনের প্রসঙ্গে আপন দেশ-কাল-পাত্রের কথাই বেশি করে বলেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিদিনের ভালমন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সমসাময়িক ইতিহাসের এক আশ্চর্য সম্বন্ধসূত্র যেন তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মহৎ অনুভব ও রাজনারায়ণ বসুর আঞ্চলিক ভাবাদর্শ যেখানে তাঁদের আত্মজীবনীতে প্রধান হয়ে উঠেছে, সেখানে শিবনাথের আত্মচরিতে প্রধান হয়ে উঠেছে যুগধর্মের পরিচয়।

শিবনাথের আত্মচরিতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর প্রসাদগুণ। এই প্রসাদগুণই রচনাটিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। উপন্যাসের সুখপাঠ্যতা বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় সঞ্চারিত। বক্তব্য-বিন্যাসের পরিচ্ছন্নতায়, সহজ কৌতুকবোধে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বর্ণনায়, প্রকাশভঙ্গির অকপটতায়, বর্ণনার কালানুক্রমিকতায় ও কাহিনীর সংলাপধর্মিতায় আত্মচরিতটি স্বাদু ও হৃদ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, লেখকের অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গি। যে নিরপেক্ষতা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'কে ইতিহাসের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই নিরপেক্ষতা আত্মচরিতেও সুস্পষ্ট। বিরোধী ব্যক্তিরাও তাই শ্রদ্ধার পাত্ররূপে বর্ণিত হয়েছেন। যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতার ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর শিবনাথের মনে কোন্ অনুভূতি আলোড়ন জাগিয়েছিল, আমরা তা একবার স্মরণ করি। 'কি সুখেই ভারত আশ্রমে ছিলাম, আর কি দুঃখই পরে ঘটিল, তাহাই মনে হইত। আমরা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত্যুর অন্যতম কারণ, এই মনে হইয়া সেই দুঃখ ঘনীভূত হইল। ...৮ই জানুয়ারি প্রাতে তাঁহার আত্মা নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। সে প্রাতে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। বৈকালে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া পাদুকাবিহীন পদে সকলের সঙ্গে আমরা অনেকে শ্মশানঘাটে গেলাম, এবং অশ্রুজলে ভাসিয়া এ জীবনের অন্যতম গুরুকে চিতানলে অর্পণ করিয়া আসিলাম।'[১] এই শ্রদ্ধার জন্যই আচার্য-পত্নীর প্রতি কটাক্ষের আশঙ্কায় তিনি আনন্দচন্দ্র মিত্র-রচিত 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি' শীর্ষক পুস্তিকাটির প্রচার জোর করে বন্ধ করে দেন।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ২০০।

দুঃখ করে তিনি লিখেছিলেন, 'হায়, হায়, দলাদলিতে মানুষকে কি অন্ধ করে!'[১]

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আত্মসমালোচনা এসে গেছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের অধঃপতনের জন্য আপনাকে দায়ী করে বার বার ধিক্কার দিয়েছেন। 'ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই যে নিরাশার বাণী ইহা প্রাণে আবেগের অতিরঞ্জিত' কাজ হলেও এর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাণের আর্তি বারংবার প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আরও মহৎ করে তুলেছে। নিজেকে ছোট করতে গিয়ে এমন বড হয়ে যাওয়ার অদ্ভুত শিল্পকর্মের উদাহরণ তাঁর আত্মচরিত।

আত্মচরিতের শেষার্ধকে সুখপাঠ্য ভ্রমণকাহিনীও বলা যায়। কয়েকবার সমগ্র ভারত-ভ্রমণের বর্ণনা ও ইংলণ্ড ভ্রমণের কাহিনী গ্রন্থটিকে ভ্রমণকাহিনীর রসে আপ্লুত করেছে। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ-চরিত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের সত্যানুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থটি যে ত্রুটিমুক্ত, তা নয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র মত এই গ্রন্থটিতে সাল-তারিখের ভুল নেই বলা চলে। তবে কোথাও কোথাও কালানুক্রম ভঙ্গ হয়েছে। যেমন, 'পুষ্পমালা'কে তিনি দশম পরিচ্ছেদের ১৮৭৬-৭৭ কালপর্বের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আসলে বইটি ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রকারের সামান্য ত্রুটি অবশ্যই অবহেলা করা যায়।[২]

১। তদেব, পৃ. ১৫০।

২। একথা এ প্রসঙ্গে বলা অবাস্তব হবে না যে, গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) সম্পাদনাকালে (যে সংস্করণ থেকে সিগনেট সংস্করণ মুদ্রিত) সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় প্রথম সংস্করণের বহু প্রসঙ্গ ত্যাগ করেছেন। তার মধ্যে কোন কোনটি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ইণ্ডিয়ান লীগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অনাগ্রহের প্রসঙ্গ। প্রথম সংস্করণের ২১৮-১৯ পৃষ্ঠায় (সপ্তম পরিচ্ছেদ) দেখি বিদ্যাসাগরকে ইণ্ডিয়ান লীগের সভাপতি হতে বলায় তিনি তার মধ্যে অমৃতবাজারের ঘোষভ্রাতাদের অন্তর্ভুক্তির কথা জেনে বলেন, 'যা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?' দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এই মূল্যবান্ উক্তিটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

॥ 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' ॥

আত্মচরিতের পরিপূরক একটি রচনা 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' নামে শিবনাথের মৃত্যুর বহুপরে তাঁর পুত্রবধূ অবন্তী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এটি প্রকাশ-লক্ষ্য সচেতন রচনা নয়; একটি দিনলিপির[১] মুদ্রিত রূপ।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৫ই তারিখে) 'মির্জাপুর' নামক জাহাজে রওনা হয়ে শিবনাথ বিলাতে প্রায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করেন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি 'রোহিলা' নামক জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ডায়েরীতে ১৫ই এপ্রিল থেকে ২০এ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর দৈনন্দিন লিপি লেখা আছে। অর্থাৎ এতে শিবনাথের প্রায় ছয় মাসের ইংলণ্ডবাসের বিবরণ ও ইংলণ্ড সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে।

শিবনাথের ইংলণ্ড যাবার প্রেরণার কথা এবং ইংলণ্ডে থাকাকালে তাঁর চমৎকার আত্মচিন্তার পরিচয় আমরা এই ডায়েরীতে পাই। ইংলণ্ড যাবার ইচ্ছা শিবনাথ বহুদিন থেকেই লালন করে আসছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাবার সুযোগ হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি লিখেছেন, 'পুরাতন সংকল্প। সংকল্পটী এই, জগদীশ্বর যদি অনুকূল হন তবে ৩ বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়া থাকিয়া সেখানকার ধর্মজীবন, রীতিনীতি, রাজ্যশাসন ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতির প্রণালী মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া আসিব। তাহা হইলে এখানে আসিয়া অনেক কাজ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে, তাহার পূর্বে আমার সংস্কৃত জ্ঞানটা একবার ঝালাইয়া লওয়া আবশ্যক। এবং এখানকার দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসম্প্রদায়সকল বিষয়ের কিছু কিছু জানা কর্তব্য। নিজের ঘরের কাছের কথা না জানিয়া দূরে জানিতে যাওয়া বাতুলের কার্য। ...তৎপরে ১৮৮৬ সালের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যাত্রা করা যাইতে পারে।'[২]

১। অপর একটি খাতাতে ১০ই জুন থেকে ১২ই ডিসেম্বর ১৮৮৮ পর্যন্ত শিবনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক-চিন্তা ও প্রার্থনাদি লিখে রেখেছিলেন; সেটি 'ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা' নামে কয়েক দফায় 'রবিবাসরীয় যুগান্তর' পত্রিকায় ১৯শে মে ১৯৫৭ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২। অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ—১০ই এপ্রিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শিবনাথের ১৮৮৫ সালে যাবার ইচ্ছা ১৮৮৮ সালে পূর্ণ হয়েছিল। উদ্ধৃত অংশে বিবৃত বিলাত গমনের উদ্দেশ্য 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে আরও বিস্তারিত-ভাবে শিবনাথ নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[১] এই উপলক্ষ্যে তত্ত্বকৌমুদী লিখেছিল, 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন দেশের যেরূপ অবস্থা ও আমাদের যেরূপ লোকাভাব, তাহাতে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে কোনমতেই বিদায় দিতে পারিতাম না; বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অধিকতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের কার্য করিতে পারিবেন এই ভরসায় আমরা তাঁহার দূরদেশে যাওয়ার অনুমোদন করিতেছি।'[২] শিবনাথও ঐ সময়ে 'নববর্ষের ভাষণে' বিদায় প্রার্থনা করে বলেন, যে, 'তিনি এই উদ্দেশ্য ও আশা লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন যে সেখানে গিয়া তিনি গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা দ্বারা এবং সেখানকার উন্নতচেতা নরনারীদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত পালনের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত হইতে পারিবেন।'[৩] —'ইংলণ্ডের ডায়েরী' তাঁর সেই সদিচ্ছারই দৈনন্দিন কাহিনী।

আমরা জানি 'শাস্ত্রী মহাশয়ের বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে বাবু দুর্গামোহন দাসই বিশেষ উদ্যোগী ও উৎসাহদাতা'[৪] ছিলেন। এই দুর্গামোহন শিবনাথকে আমেরিকা পাঠাতেও চেয়েছিলেন। শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, তিনি আমেরিকাতেও যেতে চেয়েছিলেন। 'সুবিধা হইলে শিবনাথবাবু আমেরিকাও দর্শন করিয়া আসিবেন। আমরা আশা করি নিরাপদে তিনি এই দূরদেশসকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এ দেশের রমণীগণের উন্নতিপক্ষে সহায়তা করিতে পারিবেন।'[৫] শিবনাথ আমেরিকা যেতে পারেন নি সম্ভবতঃ আর্থিক কারণে। না হলে হয়ত আমরা 'আমেরিকার ডায়েরী'ও পেতাম।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, শিবনাথ 'ব্রাহ্ম মিশনারীর ও মিশনের কার্য সমুচিতরূপে করিতে আরও সমর্থ'[৬] হবার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, ভাষা-

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, পৃঃ ২৩-২৫।
২। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা, সংবাদ বিভাগ, ১লা বৈশাখ ১৮১০ শক।
৩। তদেব, 'নববর্ষের ভাষণ' অংশ।
৪। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৮১০ শক, সংবাদ বিভাগ।
৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১২৯৫, মে ১৮৮৮, পৃঃ ১।
৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়েরী, তারিখ—৬.৫.১৮৮৮, পৃঃ ৩৩।

তাত্ত্বিক বা পণ্ডিত বা দার্শনিক হওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এর পশ্চাতে সর্বজনীন মনুষ্যপ্রীতিই সর্বাধিক সক্রিয় ছিল বলে অনুমান করি। রবীন্দ্রনাথ শিবনাথের এই 'মানুষের ভালমন্দ দোষ-গুণ সব লইয়াই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি'কেই[১] বড় করে দেখেছিলেন। 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'র বহু পৃষ্ঠাতেই এই গভীর মনুষ্যপ্রীতির পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি। তাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের ভিত্তি তিনি দেখেছেন ভৃত্যগণকে 'প্লীজ' বলার মধ্যে, মাদ্রাজের বন্দরে ইংরেজগণ কর্তৃক মুটেদের উপর অত্যাচার তাঁকে ব্যথিত করেছিল, 'দানে দয়া ও পাপীর প্রতি প্রেম' যাতে ব্রাহ্মসমাজে অধিকতর সক্রিয় হয়, তার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

'ইংলণ্ডের ডায়েরী' শিবনাথের সাহিত্য-জীবনের নানা সূত্রের ধারক। 'নয়নতারা', 'ছায়াময়ী পরিণয়', 'রঘুবংশ' প্রভৃতি পুস্তকাদির রচনা বিষয়ক নানা নির্দেশ এর মধ্যে লিখিত রয়েছে। শিক্ষা-সম্পর্কীয় বিভিন্ন আন্দোলন এবং ধ্যান-ধারণার কথা এই ডায়েরী পাঠে জানতে পারেন। মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলন সম্পর্কে শিবনাথ সেই সুদূর বিদেশেও কত নিরলস ছিলেন, তা আমরা এথেকে জানতে পারি।

শিবনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকেও 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'র মূল্য আছে। 'ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যে তিনি দাদাভাই নৌরজীর সহ-যোগিতায় প্রফেসর ষ্টুয়ার্ট এবং স্মিথ, কেইন, ম্যাকলারেন প্রভৃতি পার্লামেণ্ট সভ্যদিগকে আসামের কুলিদের প্রকৃত অবস্থা গোচর করাইয়া তাঁহাদের দিয়া পার্লামেণ্ট প্রশ্ন করাইয়াছিলেন এ তথ্য এই ডায়েরী প্রকাশের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল।···ইংলণ্ডে অবস্থানকালে 'আসাম কুলী য়্যাক্ট'-এর বিশদ আলোচনা করিয়া শিবনাথ অতি সহজেই উদারপন্থী 'পেল্‌মেল গেজেট'এর সুবিখ্যাত সম্পাদক উইলিয়ম ষ্টেডকে প্রভাবিত করিয়া তাঁহার দ্বারা 'A plea for Slavery in India' শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।'[২]

'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে সেদেশের তৎকালীন মনীষীবৃন্দের চরিত্রের কিছুটা পরিচয় আছে। মিস্ সোফিয়া ডব্‌সন কলেট (যাঁকে শিবনাথ কলেট দিদি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।
২। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ইংলণ্ডের ডায়েরীর ভূমিকা, পৃঃ ২০-২১।

বলতেন), মিস্ ক্যাথারিন ইম্পে (যাঁকে শিবনাথ কাথুরাণী বলে ডাকতেন), প্রফেসর ঈ. বি. কাওয়েল, স্যার মনিয়র-মনিয়র উইলিয়মস্, ফ্রান্সিস নিউম্যান, ডঃ মার্টিনো জেমস্, স্টপফোর্ড ব্রুক প্রভৃতি যনামধন্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে শিবনাথের সাক্ষাৎকারের এক চমৎকার বিবরণ এর মধ্যে আছে।

ডায়েরীর প্রধান গুণ এর অন্তরঙ্গতা। এই টুকরো লেখাগুলির মধ্যে শিবনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের আলেখ্য আছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের তুলনা করে তিনি যে সব মন্তব্য করেছেন, তাদের মূল্য কম নয়। ব্রাহ্ম-সমাজকে কি ভাবে সাধারণের চক্ষে উন্নীত করা যায়, সে সম্বন্ধে শিবনাথের আন্তরিক ভাবনার পরিচয় আছে 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে। তাছাড়া তিনি মাঝে মাঝে যেমন আত্মবিচার করেছেন, তেমনি করেছেন ঈশ্বরনির্ভরতার প্রকাশ। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাই যদি ডায়েরীটির বক্তব্য হত, তা হলে এর আবেদন কখনই সর্বজনীন হত না।

ডায়েরীটির মধ্যে নিঃসন্দেহে তৎকালীন যুগের একটা চিত্র ফুটে উঠেছে। 'ঐ যুগ সমস্ত পৃথিবীতে এক নূতন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা আনিয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত মানবসমাজকে আলোড়িত ও নূতন করিয়া গড়িয়াছিল। গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে একটী পথ রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছে।'[১] এই সব প্রশস্ত চিন্তার মধ্যে যে এই স্মৃতিলিপির শ্রেষ্ঠমূল্য নিহিত আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[২]

॥ ৭ ॥

॥ শিশুসাহিত্য ও শিবনাথ শাস্ত্রী ॥

প্রাচীন ভারত অধ্যাত্মচর্চা ও দর্শনচর্চার পীঠস্থান ছিল। সেকারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন গল্প-গাথার মধ্যেও নানা দার্শনিক তত্ত্ব এসে প্রবেশ লাভ করত। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদির মধ্যে গল্পের সঙ্গে তত্ত্বও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

১। ধর্মতত্ত্ব, পুস্তক সমালোচনা, ১লা ও ১৬ই আষাঢ় ১৩৬০, পঃ ৫৮।

২। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ ইংলণ্ড থেকে ফিরে এলে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (পৌষ ১২৯৫) 'অভ্যর্থনা' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি পাঠ করা যেতে পারে।

জীবনধারণের মান ও চিন্তার পার্থক্যহেতু এই গল্পচিন্তার মধ্যেও কালক্রমে নানা পরিবর্তন এসেছে। রূপকথায় দার্শনিক তত্ত্ব বহুল পরিমাণে সরল, সামাজিক ও ব্যবহারিক হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকে ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এই রূপকথা, ব্রতকথাতেও মার্জনার ছাপ পড়েছে। গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা চিরকালীন বলে গল্প চলে যায়নি, তবে গল্পরসের পাকে ও পরিবেষণে পরিবর্তন ঘটেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী এই উনিশ শতকের মানুষ। কিন্তু তিনি এই গল্প প্রবাহের শেষের দিকের ঢেউ বলে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে নীতিবাদ ও গল্পরস উভয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

উনিশ শতকের গল্পরসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, গল্পরচনার কৌশলে চিন্তাযুক্ততা এবং যাদের জন্য গল্পরচনা, তাদের কথা ভাবা। বিশেষতঃ শিশুদের জন্য তত্ত্বরচনার পরিবর্তে মনোরম রচনার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করছিলেন।

'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় শিবনাথ এমনধারা রচনারই চর্চা করেছেন। শুদ্ধ গল্পরস ব্যতীত মনীষীদের জীবনচর্চার মধ্যে শিশুদের সামনে যে একটা আদর্শস্থাপন করা যায়, সেকথা শিবনাথ অন্তরের সঙ্গে অনুভব করতেন বলেই 'সখা' ও 'মুকুল' পত্রিকায় বহু খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। 'মুকুল' থেকে সংকলিত এমন কয়েকটি শিশুপাঠ্য জীবনীর সংকলন 'স্বনামা পুরুষ'।[১] ছোট গল্পের সংকলনটির নাম 'ছোটদের গল্প'।[২] শিবনাথ-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা অধ্যায়ে এদের কথা আলোচনা করেছি।

শিবনাথ জীবিতকালে একটি শিশুপাঠ্য রচনার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'উপকথা' নাম দিয়ে[৩] ৬৫ পৃষ্ঠার এই সংকলন-খানি ৫টি বিদেশী গল্পের অনুবাদ। 'মুকুল' পত্রিকা প্রসঙ্গেও এর আলোচনা করেছি। ডেনমার্কীয় এই রূপকথাগুলি হ্যান্স-অ্যাণ্ডারসনের কয়েকটি অপূর্ব রূপকথার স্বচ্ছ অনুবাদ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিদেশী রচনা-সমূহের এ দেশীয় ভাষায় অনুবাদের একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৮৮৫ শকাব্দ, প্রকাশক, নিউস্ক্রিপ্ট।

২। প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৮৮২ শকাব্দ, প্রকাশক—নিউস্ক্রিপ্ট।

৩। বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এর নামপত্রটি এইরূপ: উপকথা/শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক/অনুবাদিত।/কলিকাতা/২১১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে/শ্রীকার্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।/মূল্য ৵০ দুই আনা।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির পরিপূরক 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' এই উদ্দেশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র 'সখা' বা 'মুকুল' সম্পাদনাকালেই শিবনাথ শিশু সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তা নয়। এর বহুপূর্বে শিবনাথ যখন 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করছিলেন, তখন থেকেই তিনি এ সম্পর্কে চিন্তা করতেন। 'বর্তমান সময়ে শিশুদিগের পাঠোপযোগী বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় শোচনীয় অবস্থা। তাহাদের শিক্ষোপযোগী গ্রন্থও নাই এবং শিক্ষোপযোগী প্রণালীও নাই।··· এক পার্শ্বে কতকগুলি নীরস ও আকর্ষণবিহীন পাঠ্যবিষয় অপর পার্শ্বে শিক্ষকদের ভ্রূকুটি ও বেত্রাঘাত উভয়ের মধ্যে নির্বাক শিশুরা ভীত ও বিরক্ত হইয়া দিনপাত করে।···বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পুস্তক একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পৃষ্ঠে অর্পিত হয়। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি এরূপ ভার লইলে মনুষ্য গর্দভ না হইয়া থাকিতে পারে না।···শিশুদিগের ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। সেই সেই সময়ে তদুপযুক্ত বিষয়গুলি তাহাদের সমক্ষে ধারণ করা উচিত, তাহা হইলে তাহাদের পড়িতে আনন্দ হয় এবং পাঠ করিয়া উপকারও লাভ করে।'

'···শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার সময় দুইটী কথা স্মরণ রাখা উচিত, (১ম) পাঠ্য বিষয়গুলি যেন তাহাদের আমোদজনক হয় (২য়) সেগুলি পঠিত হইয়া যেন তাহাদের মনোবৃত্তির বিকাশের সাহায্য করে।···দেখা যায় বাল্যকালে কল্পনাশক্তি প্রবল থাকাতে শিশুরা উপন্যাস ও আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে ভালবাসে; সুতরাং সে সময়ে গল্পের আকারে ইতিহাসের স্থূল স্থূল বর্ণনা, বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের স্থূল স্থূল ঘটনা অতি অল্প আয়াসেই তাহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারা যায় এবং সেই আকারে তাহাদিগকে ধর্মনীতি বিষয়েও শিক্ষা দিতে পারা যায়।'[১]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ; কিন্তু এটি শিশুসাহিত্য সম্পর্কে শিবনাথের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকাশ।

১। সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয় রচনা, ১২ই ফাল্গুন ১২৮০ (২৩.২.১৮৭৪), পৃঃ ২২৬-২৮।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ-কথা

শিবনাথের রচিত এই সব গদ্য-প্রবন্ধগুলির সাহিত্যমূল্য কতখানি, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। প্রথমতঃ, মনে হয়, তাঁর লেখাগুলি essay-জাতীয় রচনা নয়। কারণ এদের মধ্যে সৃষ্টিকর্মের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর কোন প্রবন্ধেই বক্তব্য অপ্রধান নয়, কোথাও বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোন সজ্ঞান প্রয়াস নেই। Essay-এর মধ্যে যে ব্যক্তিগত উপাদান বা egoistical elements প্রধান হয়ে ওঠে, তাঁর গদ্য-প্রবন্ধে তা কোথাও মুখ্য হয়ে ওঠে নি। ইংরেজিতে যে জাতীয় লেখাকে treatise বা discourse বা dissertation বলে শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ সে জাতীয় রচনা। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যের দিক থেকে essay-জাতীয় লেখার মূল্য treatise বা discourse বা dissertation জাতীয় লেখার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। সেকারণে essay-জাতীয় রচনার যতটুকু সাহিত্যমূল্য প্রাপ্য, শিবনাথের প্রবন্ধগুলি তার দাবী করতে পারে না।

সুতরাং treatise (প্রবন্ধ) জাতীয় রচনা হিসাবে শিবনাথের গদ্যলেখাগুলিকে বিচার করতে হবে। প্রবন্ধ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে প্রকৃষ্ট বন্ধন। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে যদি লেখক তাঁর বক্তব্যের বিভিন্ন উপাদান ও অংশকে অন্বিত ও সুসংবদ্ধ করে নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারেন, তবেই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের উদ্ভব ঘটে। 'তথ্যপ্রমাণের যথাযথ সমাবেশ, ভাবে, ভাষায়, চিন্তার প্রাখর্যে, সমন্বয়ে এবং পরিচ্ছন্নতায়··· প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই···প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।'[১] উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখক তাঁর মতবাদের যৌগিকতায়, চিন্তার পরিচ্ছন্নতায়, যুক্তি-তর্কের সুচিন্তিত প্রয়োগে ও বিষয়-বিশ্লেষণের সহজাত শক্তিতে পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করে থাকেন। আমাদের বিচার করে দেখা দরকার, শিবনাথের গদ্য-প্রবন্ধগুলি এইসব দিক থেকে কতটা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শিবনাথের প্রবন্ধগুলির উপলক্ষ্য যেমন এক নয়, তেমনি তাঁর রচনাভঙ্গিও

১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত. বাংলা সাহিত্যের একদিক (প্রথম সংস্করণ) পৃঃ ২৬।

এক নয়। তাঁর গদ্যলেখাগুলিকে রচনাশৈলীর দিক থেকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) উপদেশ, ব্যাখ্যান ও বক্তৃতামূলক প্রস্তাব ;

(২) সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত ছোট প্রবন্ধ ;

(৩) বিচার-বিশ্লেষণমূলক বড় প্রবন্ধ ;

(৪) বিস্তৃত চিন্তামূলক আলোচনা গ্রন্থ।

এদের মধ্যে প্রথম জাতীয় রচনায় শিবনাথ স্পষ্টতঃই রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের ধারা-রক্ষী। তাঁর পূর্বসূরীরা যেমন তাঁদের চিন্তালব্ধ বা উপলব্ধ সত্যকে সহজভাবে নিজের ভঙ্গিতে উপদেশ ও ব্যাখ্যানে ব্যক্ত করেছেন, তেমনি শিবনাথও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বা মাঘোৎসবে প্রদত্ত উপদেশাবলীতে নিজের ধর্মচিন্তা ও ঈশ্বর-উপলব্ধিকে সহজ ও সরল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মত তাঁর উপদেশ ও ব্যাখ্যান নিছক 'শাস্ত্রের বুলি' বা 'ধর্মের কচকচিতে' পর্যবসিত হয় নি, উপলব্ধির গভীরতায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ও প্রকাশভঙ্গির অকপটতায় তা শিবনাথের আপন মনের কথা হয়ে উঠেছে। এই রচনাগুলির সঙ্গে শিবনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগ পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়। লেখাগুলির মধ্যে আমরা শাস্ত্রবিদ্ এবং ধর্মের ধারক ও বাহক শিবনাথকে যতখানি পাই, তার চেয়ে বেশি করে পাই তাঁর ধ্যাননিমগ্ন, রসোজ্জ্বল ও অনুভূতিস্পন্দিত হৃদয়টিকে। বলা বাহুল্য শিবনাথের হৃদয়-সংবাদ লেখাগুলির মধ্যে যতখানি পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়েছে, ততখানি পরিমাণেই তা সাহিত্যগুণোপেত হয়ে উঠেছে। আর শিবনাথের বক্তৃতাধর্মী রচনার লক্ষ্য সত্যের সন্ধান হলেও তাঁর ব্যাখ্যান-জাতীয় রচনার মত তার সঙ্গেও অনেকখানি অনুভূতি ও আবেগ জড়িয়ে আছে। বক্তৃতা শুধু যুক্তিনির্ভর হলে তা শ্রোতার মনে সহজে দাগ কাটে না, তাই উৎকৃষ্ট বক্তার বক্তৃতামাত্রেই আবেগ ও অনুভূতির ডানায় ভর করে শ্রোতার মনে প্রবেশ করতে চায়। বক্তার অঙ্গভঙ্গি ও স্পন্দিত কণ্ঠস্বরও তাতে সহায়তা করে থাকে। শিবনাথ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে তথ্যসমাবেশ ও যুক্তিনির্ভরতা ছাড়াও নিশ্চয় অনেকখানি আবেগ ও অনুভূতি জড়িত ছিল। কিন্তু সেই সব বক্তৃতার যে লিখিত রূপ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তার সঙ্গে শিবনাথের আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি

জড়িত নেই বলে তাদের আবেদনও অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। তৎসত্ত্বেও এই জাতীয় লেখার মধ্যে তাঁর যে গভীর বিশ্বাস, অন্তর্দর্শন, সমাজ ও ধর্মচিন্তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তা আমাদের চিত্তকে অনেকটা স্পর্শ করে। এগুলির মধ্যে ভাল লেখার গুণের চেয়ে ভাল বক্তৃতার গুণগুলি আছে এবং সেদিক থেকেই এদের সাহিত্যমূল্য স্বীকার করতে হবে।

শিবনাথ যে সমস্ত ছোট ছোট প্রবন্ধ সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে রচনা করেছেন, তাতে ব্যাখ্যান বা বক্তৃতার চেয়ে তথ্যযুক্তি বেশি এসেছে; এগুলির মধ্যে তিনি তাঁর সমাজ-চেতনা, ধর্ম-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনাকে বেশি পরিমাণে কাজে লাগিয়েছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে লেখাগুলির মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়; বক্তব্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা অন্বয়সূত্র বজায় রেখে একটা যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা আছে। অবশ্য আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক, তথ্য-তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক উপাদানগুলির মধ্যে অনেক ফাঁক ধরা পড়ে। তিনি বঙ্কিমের মত মননশীল লেখক ছিলেন না বলে সেই ফাঁকগুলিকে ভরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাও করেন নি। এই ত্রুটি সত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও মতামতের সুসম্বদ্ধতার পরিচয় আছে। একটা নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে তিনি নিজের বক্তব্যকে মোটামুটি গুছিয়ে বলার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত 'চিন্তা সঞ্চরণ', 'বিদ্যাসাগরের জীবনী', এবং 'গৃহধর্মের' অন্তর্গত বিভিন্ন প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিবনাথের রচিত বড় প্রবন্ধগুলিতে তিনি পরিসর অনেক বেশি পেয়েছেন, বক্তব্যকে আরও গুছিয়ে বলার সুযোগ পেয়েছেন এবং স্বভাবতঃই এগুলির মধ্যে তাঁর বিষয়-বিশ্লেষণী শক্তিরও অধিকতর পরিচয় আছে। তবে কোন কোন প্রবন্ধে প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটেছে, প্রসঙ্গ থেকে তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন, ফলে লেখাগুলির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধতা ও পূর্ণ নিটোলত্ব আসে নি। এ জাতীয় লেখার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কোন কোনটি। তাতে শিবনাথ তাঁর সাহিত্যচিন্তাকে সমাজ ও ধর্মচিন্তার সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে ফেলেছেন। তবে জাতিভেদ-বিষয়ক প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ক্রমান্বিত উপস্থাপনায় প্রাবন্ধিক শিবনাথের মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে।

শিবনাথ যে সমস্ত বিস্তৃত চিন্তামূলক আলোচনা গ্রন্থ লিখেছেন তাতে তাঁর জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও ধর্ম সাধনার ফল পরিবেষিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনী একটি জীবনের সূত্রে বিধৃত একটি যুগের কাহিনী, তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শিবনাথের তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা ও ইতিহাসবোধ এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্টতঃই ফলপ্রদ হয়ে উঠেছে। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এদের গুরুত্ব অনেকখানি। 'আত্মচরিতে' বাল্য ও শৈশব-স্মৃতির বর্ণনায় শিবনাথের মনের যে ঋজুভঙ্গি ও বিশুদ্ধ রসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, তা লেখাটির মধ্যে নিঃসন্দেহে কতকটা সাহিত্যস্বাদ এনে দিয়েছে।

প্রারম্ভেই বলেছি, শিবনাথের গদ্যগ্রন্থগুলি প্রবন্ধ-জাতীয় রচনা। ফলে রসগত মূল্যে নয়, চিন্তার মূল্যেই সেগুলি মূল্যবান্। তিনি যে কাব্যচর্চা করেছেন, কালক্রমে তার মূল্য অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে গেছে, তিনি যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন, তাদের রসাবেদনও অনেকটা স্তিমিত। কারণ, সাহিত্য-শিল্পের ভাব ও রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের মূল্য হ্রাস পাওয়াও খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-জাতীয় রচনাগুলি জ্ঞানের ভাণ্ডারের অক্ষয় সম্পদ। জ্ঞানপিপাসুদের কাছে তাদের মূল্য আরও অনেক কাল ধরে যে স্বীকৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃই তিনি বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সুলেখক ছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্পাদক শিবনাথ

প্রথম অধ্যায়

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

আমরা প্রথমেই শিবনাথ-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করছি এবং পরে একে একে সেগুলির আলোচনা করছি।

১. মদ না গরল ?—১৮৭১।
৪. সোমপ্রকাশ—১৮৭৩-৭৪।
৩. সমদর্শী or the Liberal—১৮৭৪।
৪. সমালোচক—১৮৭৮।
৫. তত্ত্বকৌমুদী—১৮৭৮।
৬. সখা—১৮৮৫-৮৬।
৭. মুকুল—১৩০২-১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
৮. সঞ্জীবনী—১৯০৮।

১ ॥ মদ না গরল ? ॥

কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত সংস্কার সভা' (Indian Reform Association) নামক একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার পাঁচটি শাখার মধ্যে 'সুরাপান নিবারণী' অন্যতম শাখা ছিল। এই শাখার মুখপত্রের নাম 'মদ না গরল ?'। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত। সে সমুদায়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।'[১] মিস্ এস্ ডি. কলেট লিখেছেন,[২] 'The object of this section is to

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১০৭।
২। Brahm › Year Book—1876, Pp. 49.

arrest the growth of intemperance among native population, especially among the better educated classes. A monthly Bengali journal entitled *Madh na Garal* (Wine or Poison) was started in April, 1871, and was largely distributed gratis. Much useful information, collected by the section, was published in this journal.' পত্রিকাটি যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই প্রথম প্রকাশিত হয় তার অন্য একটি প্রমাণ রয়েছে ভারত সংস্কার সভার বার্ষিক বিবরণীতে—'A monthly journal in Bengali has been started for the diffusion of temperance principles, under the name of "Madh na Garal ?" (Wine or Poison ?). The first number was issued in April'.[১] পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত ছিল। 'সোমপ্রকাশে' তার ইঙ্গিত রয়েছে—"২৭ আষাঢ়, বুধবার।—আমরা আহ্লাদিত হইলাম 'মদ না গরল' নামক পত্রিকাখানি পুনর্বার আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।"[২] পত্রিকাটি যে কতদিন জীবিত ছিল তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। তবে ১২৮০ বঙ্গাব্দ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেও যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি প্রমাণ আমরা উল্লেখ করছি।—"এত দিনের পর কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (১২৮০) মাসের 'মদ না গরল' প্রকাশিত হইয়াছে। মদ না গরল বিনামূল্যে বিতরিত হয়, সুতরাং ভিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না। সুতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। যদি জন্মভূমিকে সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা থাকে তবে সকলে যত্ন করিয়া মদ না গরলকে রক্ষা করুন।"[৩]

বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও এদেশে পত্রিকাটির সন্ধান পাই নি। কাজেই পত্রিকাটিতে কি ধরণের লেখা প্রকাশিত হত বা পত্রিকাটির আকারই বা কেমন ছিল, তা জানতে পারি নি। তবে অন্য একটি পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে পরোক্ষভাবে মদ না গরলের চরিত্রের একটা আভাস পাই।—" "মদ

১। Annual Report of the Indian Reform Association, 1870-71, Pp 15.

২। সোমপ্রকাশ, ১লা শ্রাবণ ১২৭৯।

৩। সুলভ সমাচার, সংবাদসার বিভাগ, ৩০এ বৈশাখ ১২৮১ সংখ্যা, পৃ: ৫২৪।

না গরল" বলেন হাবড়ার সন্নিকট পুরাতন সায়েরে খুরুট নিবাসী এক ভদ্র, ধনাঢ্য লোক আপন ভদ্রাসনের সম্মুখে একখানি মদের দোকান খুলিয়াছেন। ভদ্রলোক আগে মদ স্পর্শ করা মহা পাপ জানিতেন, এখন তাহার ব্যবসায়ও চালাইতে লাগিলেন কালে আরো কি হয় ?"[১]

বঙ্গদেশে সুরাপান নিবারণী আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'মদ না গরল' প্রথম ভূমিকা গ্রহণ করে নি। সুরাপান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে প্রথম সুরাপাননিবারণী সভা স্থাপন করেন। কিন্তু এই সভার কোন মুখপত্র ছিল না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার যে মাদকনিবারণী সভা স্থাপন করেন, তার মুখপত্র হিসাবে 'হিতসাধক'[২] এবং 'Well Wisher' নামে দুটি পত্রিকা যথাক্রমে বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় স্বয়ং প্যারীচরণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সভ্য ছিলেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী প্যারীচরণের প্রভাবেই মদ্যপান-বিরোধী হয়ে ওঠেন।[৩] প্যারীচরণের আন্দোলন ও 'হিতসাধকের' অনুসরণ করেই 'মদ না গরলের' প্রকাশ।

এই পত্রিকার মাধ্যমে যে আন্দোলন চালানো হয়েছিল, তার পরিণামে এবং কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বড়লাটের নিকট প্রেরিত আবেদনের ফলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার কয়েকটি বিধি প্রবর্তন করেন। সেদিক থেকে শিবনাথের কৃতিত্ব কম নয়।

'মদ না গরল'-এর প্রভাব অন্যত্রও দেখা গেছে। এই পত্রিকার আন্দোলনেই কেশবচন্দ্রকে 'আশাবাহিনী' বা 'ব্যাণ্ড অফ্ হোপ' দল গঠনে প্রেরণা দিয়েছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না।[৪]

এই পত্রিকাতেই পত্রিকা সম্পাদনের ব্যাপারে শিবনাথের হাতে খড়ি হয়। 'মদ না গরল'-এর প্রচার এবং আন্দোলনের ফল দেখে মনে হয় সম্পাদক হিসাবে চব্বিশ বছরের এই যুবকটি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

১। ভারত সংস্কারক, ৭ই অগ্রহায়ণ ১২৫০, পৃঃ ৩৭০।

২। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৫৬।

৪। প্রবাসী, (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়), অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃঃ ৩০৪।

২। সোমপ্রকাশ ॥

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের এক অক্ষয় কীর্তি। এই পত্রিকাটি প্রকাশের যখন পরিকল্পনা হয়, তখন থেকেই শিবনাথ এর কথা শুনে এসেছেন। সংস্কৃত কলেজে শিবনাথ যখন পড়তেন, সে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথের সঙ্গে 'সোমপ্রকাশের' প্রকাশনা ব্যাপারে পরামর্শাদি করতেন। যাই হোক, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে দ্বারকানাথ বায়ু পরিবর্তনের জন্য কাশী যেতে মনস্থ করেন। কাশী যাওয়ার পূর্বে তিনি ভাগিনেয় শিবনাথকে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনার ভার দিয়ে যান। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক·· হইয়া বসিলাম। বড়মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।·· সোমপ্রকাশের কার্যভার প্রধানত আমার উপর পড়িয়া যাওয়াতে সংবাদপত্রাদি পাঠে ও লেখাতে অনেক সময় দেওয়া আবশ্যক হইল।'[১]

শিবনাথ ঠিক কোন সংখ্যা থেকে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন 'সোমপ্রকাশে' তার উল্লেখ নেই। অথচ পূর্বে অন্য একটি উপলক্ষ্যে দ্বারকানাথ যখন সম্পাদকের কর্মভার মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে অর্পণ করেন, তখন 'সম্পাদককৃত বিজ্ঞাপনে' তার উল্লেখ করেছিলেন।[২] কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা আমরা শিবনাথের ভার গ্রহণের তারিখ নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। তাতে সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সুবিধা হবে।

১লা পৌষ ১২৮০ সংখ্যা পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশে'র বিজ্ঞাপনে (পৃঃ ৬০) গ্রাহকবর্গকে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু ১লা পৌষ ও পরবর্তী ৮ই পৌষ ১২৮০ সংখ্যা থেকে পর পর কয়েকটি সংখ্যায় কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে টাকা পাঠাবার কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

'গ্রাহকগণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে যাঁহারা সোমপ্রকাশের

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১:৮।

২। সোমপ্রকাশ, ৫ই জুন ১৮৬৫ সংখ্যা।

মূল্য মণি অর্ডারে পাঠাইবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে রেজীষ্টারি করিয়া পাঠাইয়া দেন। —অধ্যক্ষস্য।'[১]

কাজেই অনুমান করি শিবনাথ সম্ভবত: এই সংখ্যা থেকেই (১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৩) সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ; যদিও এই সংখ্যার সম্পাদকীয় দ্বারকানাথেরই রচনা বলে মনে হয়। কারণ সম্পাদকীয়টি ছিল পূর্ববর্তী ৪র্থ সংখ্যার অনুবৃত্তিমাত্র। পরবর্তী ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৮ই পৌষ) সম্পাদকীয় স্তম্ভের বিষয়বস্তু ভিন্নতর ছিল—'ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন' নামক ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন সভার কথা, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে মিস্ মেরী কার্পেন্টারের কথা আলোচিত হয়েছে।

শিবনাথ মাত্র সাত মাস 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করেন। ৫ই শ্রাবণ ১২৮২ (২০ এ জুলাই ১৮৭৪) সংখ্যা পর্যন্ত সোমপ্রকাশের 'নিয়মাবলী'তে টাকাকড়ি-চিঠিপত্র কেদারনাথ চক্রবর্তীর নামে পাঠানোর অনুরোধ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কিন্তু ১৯ এ শ্রাবণ ১২৮১ (৩রা আগষ্ট ১৮৭৪) সংখ্যায় দ্বারকানাথের নামেই টাকা পাঠাতে বলা হয়েছে। ১২ই শ্রাবণ ১২৮১ (২৭.৭.১৮৭৪) তারিখে 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে, 'আমরা অনেকদিন বিদেশে ছিলাম, সম্প্রতি দেশে আসিয়া নিজ গ্রাম ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের দুরবস্থা দর্শন করিয়া দুঃখিত হইলাম।' 'ভারত সংস্কারক'ও ২রা শ্রাবণ ১২৮১ তারিখে দ্বারকানাথের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানিয়েছে। সুতরাং শিবনাথ ৫ই শ্রাবণ (২০.৭.১৮৭৪) সংখ্যা পর্যন্ত 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা করেছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একথা লিখেছেন।[২]

'সোমপ্রকাশে'র খ্যাতি ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই সাত মাস শিবনাথকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কলকাতায় শিক্ষকতা ছিল তাঁর প্রধান কর্ম। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদনা করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম।' কাগজটির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে তাঁর চেষ্টার কথা উল্লেখ

১। 'সোমপ্রকাশ', বিজ্ঞাপন, ১লা পৌষ ১২৮০, পৃঃ ৬১।

২। 'পরবর্তী ২৭এ জুলাই হইতে বিদ্যাভূষণ পুনরায় সম্পাদনভার গ্রহণ করেন'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র (১৩৫৪), পৃঃ ১৫৮।

করে শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফরমা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।'[১] অবশ্য এই ইংরেজি অংশ সংযোগের জন্য কাগজের অবনতি ঘটেছিল, এমন অভিযোগও শোনা যায়।[২]

পত্রিকাটি সম্পাদনা ছাড়াও সোমপ্রকাশের রিপোর্টার হিসাবে শিবনাথ মাঝে মাঝে কাজ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'স্মরণ আছে যে সোমপ্রকাশের প্রতিনিধিরূপে হরিনাভি হইতে অভিনয় দেখিতে কলিকাতায় আসিতাম।'[৩]

শিবনাথের সম্পাদনাকালেও সোমপ্রকাশের নির্ভীক স্বভাব যে অক্ষুণ্ণ ছিল তা পত্রিকাটির সম্পাদকীয় স্তম্ভ ও অন্যত্র প্রকাশিত লেখাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। হরিনাভি, রাজপুর ইত্যাদি স্থানের প্রতি তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির অমনোযোগ দেখে পূর্ব থেকেই দ্বারকানাথ এই সকল স্থানের উন্নতির জন্য সোমপ্রকাশে আন্দোলন করে আসছিলেন। শিবনাথ এই আন্দোলনকে আরও বেগবান্ করে তুললেন। দ্বারকানাথ···'তৎকালীন হরিনাভি বিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের সাহায্যে এদেশে একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। সোমপ্রকাশের জলন্ত ভাষা এবং বিদ্যাভূষণের ক্রমাগত চেষ্টার গুণে'[৪] রাজপুরে একটি স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে স্বীয় উদ্যোগের তথ্য শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করেছেন।[৫] ৮ই পৌষ ও ২২এ পৌষ ১২৮০ সংখ্যার 'সোমপ্রকাশে' এই জলন্ত ভাষার প্রমাণ মিলবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধেও এই সাহসিকতার পরিচয় রয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সিবিল সার্ব্বিস হইতে বহিষ্কৃত' হলে শিবনাথ ইংরেজ সরকারকে তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করেছিলেন।[৬] 'ইংরাজী শিক্ষায়

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১২৪।

২। হারমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক (১ম ভাগ), পৃঃ ৯৯৬।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ৯০।

৪। সোমপ্রকাশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১০ই ভাদ্র ১২৯০ সংখ্যা।

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১১৯-২০।

৬। সোমপ্রকাশ, সম্পাদকীয়, ৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার কি হইল?'[১] নামক প্রবন্ধেও এই সাহসিকতা প্রকাশিত হয়েছে। 'চটিপায় ব্রাহ্মণ' ছদ্মনামে যে শিবনাথ বাল্যকালেই এই সোমপ্রকাশে ইংরেজ উড্রোসাহেবের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, 'ইংরাজী জুতায় মান থাকে আর চটি জুতায় মান যায় একথা আমি... সাহেবের মুখেই শুনিলাম', তার পক্ষে এ ধরণের প্রতিবাদ রচনা অস্বাভাবিক ছিল না। আর এই সৎ-প্রতিবাদই ছিল সোমপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য।[২] 'আদালতে উৎকোচ গ্রহণের প্রতিবাদ'ও এই প্রকারের একটি রচনা।[৩]

'মদ না গরল' সম্পাদনা করলেও সোমপ্রকাশেই শিবনাথের সাংবাদিকতায় যথার্থ শিক্ষানবীশী শুরু হয়। একদা যে পত্রের তিনি লেখক মাত্র ছিলেন—সেই পত্রেরই তিনি যোগ্য সম্পাদক হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, শিবনাথের সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনে দ্বারকানাথের প্রভাব ছিল প্রভূত। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই মন্তব্য করেছেন, '*Somprakash* was, however a professedly political newspaper, and it had always been absolutely outspoken in its criticism of Public policies and measures. And Shivanath had been trained by his uncle as a Bengali writer. ...Vidyabhushan exerted very considerable influence in the making of Shivanath's mind and character.'[৪]

৩ ॥ সমদর্শী ॥

'সোমপ্রকাশে' শিক্ষানবীশী শিবনাথকে স্বাধীনভাবে সাময়িকপত্র সম্পাদনের ব্যাপারে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনার জন্য শিবনাথ যখন হরিনাভিতে বাস করছিলেন (১৮৭৪), সে সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একটি নূতন বিবাদের সূচনা হয়েছিল। 'মহাপুরুষবাদ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে পূর্ব থেকেই একটা কেশব-বিরোধী গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু

১। তদেব, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

২। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (৫র্থ সং ১৩৫৫) পৃঃ ৩০৫-৬।

৩। সোমপ্রকাশ, ২রা আষাঢ় ১২৮১।

৪। Bipin Chandra Pal, Memoirs of My Life and Times (1939) Pp. 306-7

এবারে কেশবচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা প্রচার করলেন যে, যেহেতু প্রচারকগণ ঈশ্বর-নিযুক্ত, সুতরাং তাঁদের কার্যের বিচার মানুষে করতে পারবে না। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুবকগণ চেষ্টা করছিলেন, এই প্রচারে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে একটি ভিন্ন দল গঠন করেন। এই দলের নাম 'সমদর্শী' দল। এই দলের মুখপত্র হিসাবে 'সমদর্শী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা শিবনাথের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকত্ব ত্যাগের চার মাসের মধ্যেই। পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক, অর্থাৎ বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হত। এ সম্পর্কে 'সমদর্শী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়[১] লেখা হয়েছে যে, 'The Journal will be conducted in English and Bengali, that it may be accepted to the theists of other Presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, an *impartial Exponent of Theistic opinion*.

শিবনাথ লিখেছেন, 'সমদর্শীতে আমরা কেশববাবুর কোনো কোনো মতের প্রতিবাদ করিতাম ও স্বাধীনভাবে ধর্ম তত্ত্বের আলোচনা করিতাম।'[২] কেশবচন্দ্রের সমর্থকগণের প্রতিবাদ রবিবাসরীয় মিরারে প্রকাশিত হত। অর্থাৎ স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় বাদানুবাদই এই পত্রিকা প্রচারে প্রেরণা দিয়েছিল। সেকারণেই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধেই তৎকালীন ব্রাহ্মধর্মের বিবাদের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। আবার ব্রাহ্মধর্ম প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল বলে তৎকালীন সামাজিক আন্দোলন, যথা—ব্রাহ্মবিবাহ ও ১৮৭২ সালের তিন আইন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গও 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠায় আলোচিত হত।

কেশবচন্দ্রের বিরোধিতা পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও সম্পাদক নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেশবচন্দ্রকে কখনই অশ্রদ্ধা করতেন না। 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠাতেই এই 'সমদর্শিতার' প্রমাণ রয়েছে—'ব্রাহ্মদিগের মিতাচার, ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ, ব্রাহ্মদিগের সচ্চরিত্রতা, অনুসন্ধান করিলে ইহার অধিকাংশেরই মূলে বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের

১। সমদর্শী, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১২৮১, Nov. 1874

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১২৬-২৭।

সৌভাগ্যের বিষয় যে ইহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির হস্তে নেতৃত্বভার পড়িয়াছে।'

তবুও সাম্প্রদায়িকতাকে লেখক অস্বীকার করেন নি। বলেছেন, 'As long there is freedom of thought and freedom of discussion so long there must be division into *parties, sects, cliques* or whatever other names we may give them. No class of opinions, religious, social, moral or political, forms an exception of this.[১] আবার পরমতসহিষ্ণুতারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। পত্রিকাটি প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্যও যে তাই, সেকথা পত্রিকার এক স্থানে লিখিত হয়েছে—'this journal is an humble attempt in that direction'[১ক] 'সমদর্শীর এই বিশিষ্ট চরিত্রের কথা উল্লেখ করে সম্পাদক আরও লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজে মত বিষয়ক স্বাধীনতা ও উদারতার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যেই সমদর্শীর সৃষ্টি। ইহাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে যাহার যাহা বলিবার আছে, বলিব এবং শুনিব, আবার পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে ক্রটিবোধ করিব না। শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরের প্রতিবাদ দেখিয়া দুঃখিত না হইয়া আনন্দিত হওয়াই উচিত। এইজন্যই সমদর্শীতে পরস্পরবিরুদ্ধ মত সকল স্থান পাইতেছে।' এখানেই 'সমদর্শী' নামের সার্থকতা। অবশ্য এই নামটি নিয়ে সে সময়ে রহস্যও কম হয় নি। 'কোন রহস্যপ্রিয় সম্পাদক এই পত্রের সমালোচনায় বলিয়াছেন, ইনি সমদর্শী অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও জঙ্গম উভয় দলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।'[২]

প্রধানতঃ ধর্মসমালোচনামূলক ও একটি বিশেষ দলের মুখপত্র ছিল বলে 'সমদর্শী' খুব বেশি পরিমাণে লেখক সংগ্রহে সমর্থ হয় নি। আমরা মোট সতেরো জন লেখকের নাম পেয়েছি। এঁরা প্রায় সকলেই 'সমদর্শী' দলভুক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ণ বসুর একটি ইংরেজি রচনার সংকলনও এই পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। শিবনাথ ব্যতীত অন্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন, শিবচন্দ্র দেব, মথুরানাথ বর্মণ, বঙ্গচন্দ্র রায়, যদুনাথ চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, পদ্মহাস গোস্বামী, নবীনচন্দ্র

১। ১ক। সমদর্শী, ১ম বর ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮১।
২। শ্রীনাথ চন্দ, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পৃঃ ১৫০, পাদটীকা।

রায়, চন্দ্রশেখর বসু, শিতিকণ্ঠ মল্লিক, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং কেদারনাথ কুলভী।

শিবনাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) ছিলেন 'সমদর্শী'র প্রধান লেখক।' পত্রিকাটিতে তাঁর বাংলা ও ইংরেজি রচনার সংখ্যা মোট ৬৩। শিবনাথ 'শি. না ভ' এবং 'শ্রীশি:'—এই দুই সংক্ষিপ্ত নামেও লিখেছেন। সমদর্শীর ধর্মবিবাদহীন কবিতাগুলি সবই শিবনাথের রচনা।

জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪ সংখ্যায় 'ব' ও 'য' সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত রচনাদ্বয় যথাক্রমে বঙ্গচন্দ্র রায় ও যদুনাথ চক্রবর্তীর লেখা বলে অনুমান করি।

লেখক নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদক শিবনাথের একটা বিশেষ ধারণা ছিল। তাঁর মতে ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে বিশ্বাসী একেশ্বরবাদী মাত্রেই 'সমদর্শী'র লেখক হিসাবে গণ্য হবার অধিকারী ছিলেন।—'Here are welcome conservatives and progressives, professed Brahmos and theists who have not formally joined the Brahmo Samaj,—in short whoever accepts the short and simple creed of theism as his faith, and thereby seeks the moral and spiritual elevation of India.' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ব্যতীত পরে আরও একবার এই আহ্বান অন্যত্র বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 'ইহাতে একেশ্বরবাদী মাত্রেরই লিখিবার অধিকার। এমন কি সম্পাদকের মত সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রাধান্য থাকিবে না।'[১]

তবে লেখাগুলি সম্পর্কে সম্পাদকের একটা শর্ত ছিল—'Every sensible article whether religious, social and moral, will be cordially accepted, provided it is written in a good and charitable spirit.···The Editor will not hold himself responsible for the opinions expressed in the articles, and every article will bear the name of its author.' সম্পাদক আরও চেয়েছেন লেখাগুলি এমন হবে, যার মধ্যে সত্যানুসন্ধান তো থাকবেই, আরও থাকবে 'the practical good of humanity'-র চিন্তা। সম্পাদক লেখকদের এ সম্পর্কে সতর্ক করে

১। ভারত সংস্কারক, সমদর্শীর বিজ্ঞাপন, ১৮ই পৌষ ১২৮১, পৃ: ৪৩২।

দিয়ে লিখেছেন 'We request our contributors to have their eyes fixed on this, when they write articles for this journal '[১]

এমন ধরণের লেখা যে এই পত্রে নেই তা নয়। তবে ধর্মকলহবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। ফলে পত্রিকাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও লেখকগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তত ফুটে ওঠে নি। শিবনাথের কবিতাগুলি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'যে পত্রিকা যে দলের মুখপত্র, তাহাতে সেই দলের মতামত ও রীতিনীতিরই পোষকতা করা হয়। এই সকল রচনার ভিতর দিয়া লেখকগণের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না।'[২] তা না পেলেও 'সমদর্শী'র উদ্দেশ্য অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাধিত হয়েছিল। প্রধানতঃ এই পত্রিকার প্রতিক্রিয়ার ফলেই 'কেশববাবুর অনুগত প্রবীণ ব্রাহ্ম দল ও যুবক ব্রাহ্ম দলের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত বিচ্ছেদ দিন-দিন'[৩] বেড়ে গেছিল। যার শেষ পরিণতি ঘটেছিল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বিচ্ছেদে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়। ধর্ম ব্যাপারে 'সমদর্শী'র ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন, 'ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনাকে সর্বপ্রকারের অতি প্রাকৃতত্ব ও অতি লৌকিকত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত 'সমদর্শী' যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা করা হয় নাই।'[৪] সুদূর মফঃস্বলেও এই ভাব বিস্তারিত হয়েছিল। '··· সমদর্শী পত্রে এই সকল চিন্তা ও মতবৈষম্য প্রকাশ পাইতেছিল ; মফঃস্বলেও সেই সকল ভাব সংক্রামিত হইতেছিল'।[৫]

'ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক' এই মাসিক পত্রিকাটি কোন এক অজ্ঞাত কারণে কার্তিক ১২৮২ (অক্টোবর ১৮৭৫) সংখ্যার পর থেকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম বর্ষের বারোটি সংখ্যা ঠিকমতো প্রকাশিত হয়। সতেরো মাস বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৭) মাসে। পর পর তিনটি সংখ্যা (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ,

১ সমদর্শী, মাঘ ১২৮১।
২ বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত কথা, পৃঃ ১৮০।
৩ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৩২।
৪ বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত কথা, পৃঃ ১৮০।
৫ শ্রীনাথ চন্দ, ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর, পৃঃ ১১০।

আষাঢ়) প্রকাশিত হওয়ার পর 'সমদর্শী'র প্রচার একেবারে রহিত হয়। এর কতকগুলি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এ ধরণের বিবাদমূলক পত্রিকার প্রচার হয়ত শিবনাথ আর বোধ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, পত্রিকাটি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একা শিবনাথকেই বহন করতে হচ্ছিল। শেষ সংখ্যার অব্যবহিত পূর্বের দুটি সংখ্যার (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪) সমস্ত রচনা শিবনাথকেই লিখতে হয়েছিল। মনে হয় এ ধরণের ধর্মীয় বিবাদে লেখকগণেরও হয়ত আর উৎসাহ ছিল না। তৃতীয়তঃ, ১৮৭৭ সালে শিবনাথ ভয়ঙ্কর রকমের অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার জন্তও 'সমদর্শী'র প্রচার সহসা রহিত হয় বলে মনে করি।

৪ ॥ সমালোচক ॥

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে 'সমদর্শী'র প্রচার বন্ধ হয়ে গেলেও সমদর্শী দলটি ব্রাহ্মসমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শিবনাথ এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন আরও বেগবান্ হয়ে উঠলো বিশেষ একটি সংবাদে। ৩০এ জানুয়ারী তারিখে শিবনাথ তাঁর ডায়েরীতে এই নূতন সংবাদের উল্লেখ করে লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে বাবু লোকনাথ মৈত্র এক নূতন সংবাদ লইয়া আসিলেন। কুচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার শীঘ্র বিবাহ হইতেছে। কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই মার্চ বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন।·· আগামী মার্চ মাসে বিবাহ হইলে বড় পুঁটীর বয়স চৌদ্দও সম্পূর্ণ হইবে না।'[১] কুচবিহারের মহারাজাও তখন ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'সমদর্শী' দল এই প্রকারের বিবাহের বিরোধিতা করার জন্য একটি বাংলা ও আর একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'এদিকে আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে 'সমালোচক' নামে এক-বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ ও ২১শে মার্চ হইতে ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন নামক এক ইংরাজি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিলাম। দুর্গামোহনবাবু ও আনন্দমোহনবাবু উক্ত উভয় কাগজের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।···আমি বাংলা কাগজের

১। হেমলতা দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, শিবনাথ-জীবনী, পৃঃ ১৫৭।

সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।'[১] ৬ই মার্চ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষাধিক কাল পূর্বে 'সমালোচকের' আবির্ভাব।

'আত্মচরিত' থেকে জানতে পেরেছি পত্রিকাটি প্রথম ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও দেখছি যে, "The Kuch-Behar marriage agitation soon gave rise to the issue of other periodicals. The "Samalochak" (or "Review") now a secular weekly, was started on February 17.'[২] কিন্তু এই ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেই আবার লক্ষ্য করছি (পৃঃ ১৫) যে, প্রথম সংখ্যাটি ১৬ই ফেব্রুয়ারি (৫ই ফাল্গুন) এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি ২৩এ ফেব্রুয়ারি (১২ই ফাল্গুন) তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে মনে হয়, পত্রিকাটি ১৬ তারিখে মুদ্রিত হয়ে ১৭ তারিখে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটি প্রকাশের কোন তারিখ উল্লেখ করেন নি)।

বহু অনুসন্ধানেও এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির কোন সংখ্যা দেখতে সমর্থ হই নি। তাই পরোক্ষ উক্তির সাহায্যে পত্রিকাটির চরিত্র নির্ণয় করার চেষ্টা করছি। 'সমদর্শী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল কেশবচন্দ্রের 'অগণতান্ত্রিক' মনোভাব ও 'মহাপুরুষবাদের' সমালোচনা করা। তাছাড়া অন্যবিধ ধর্মীয় ও মৌলিক রচনাও 'সমদর্শী'তে প্রকাশিত হত। কিন্তু 'সমালোচকের' সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ভিন্নতর ছিল। এডুকেশন গেজেট[৩] 'সমালোচকে'র প্রথম সংখ্যা পেয়ে লিখেছেন, 'সমালোচক—সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে।' এই প্রসঙ্গে এডুকেশন গেজেট 'সমালোচকে'র উদ্ধৃতিও দিয়েছেন :—

> 'পত্রখানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটী মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটী কেশববাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা; গৌণ

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত. পৃঃ ১৫৬।

২। Brahmo Year Book—1878, Pp 43.

৩। এডুকেশন গেজেট, ১লা মার্চ ১৮৭৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা সাহিত্য, ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা. পৃঃ ২০২।

উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।'

পত্রিকাটির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিবনাথ কুচবিহারস্থ প্রতিনিধি মারফৎ ভিতরের সংবাদাদি জ্ঞাত হয়ে 'সমালোচকে' 'সারস পাখির উক্তি'— এই পর্যায়ে 'ধারাবাহিক' রচনা লিখতে আরম্ভ করেন।[১]

গৌণ উদ্দেশ্যও যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সাধিত হয়েছিল, মিস্ কলেটের পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য 'now a secular weekly' তার পরোক্ষ প্রমাণ।

শিবনাথের রচনা ব্যতীত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ও অন্য কয়েকটি সংখ্যায় অন্যান্য কয়েকজনের প্রতিবাদ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। একথা আমরা মিস্ কলেটের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক থেকে জানতে পেরেছি। এ থেকে পত্রিকাটি তার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কতখানি অগ্রসর হয়েছিল তা জানা যায়। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় উক্ত বিবাহের সংবাদ সমর্থিত হয়েছে দেখে ঐ দিনই গুরুচরণ মহলানবিশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কালীনাথ দত্ত—এই তিনজনে কেশববাবুর নিকটে গিয়ে শিবনাথ-রচিত একটি প্রতিবাদ পত্র দিয়ে আসেন। এই প্রতিবাদ পত্রের অনুক্রম হিসাবে আরও বহু প্রতিবাদ পত্র আসতে লাগল। 'সমালোচকে' এই প্রতিবাদগুলির কিছু কিছু প্রকাশিত হতে থাকে।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় (১৬. ২. ১৮৭৮) প্রায় কুড়িজন ব্রাহ্মিকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের সংবাদে বিস্মিত ব্রাহ্মিকাগণ কেশবচন্দ্রকে লিখেছেন (কুমারী কলেট কর্তৃক ভাষান্তরিত), 'We could not even have imagined that any act of yours would ever be obstacle to female education, or injurious to women ; we are therefore exceedingly grieved at this unexpected act.[২] দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৩. ২. ১৮৭৮) হরগোপাল সরকার মহাশয়ের একটি ব্যক্তিগত প্রতিবাদ পত্র এবং ডাঃ প্রসন্ন কুমার রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ ঢাকার আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদের ১২ জনের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ পত্রটিও মুদ্রিত হয়েছিল। ৬ই মার্চ (২৪এ ফাল্গুন) তারিখে সমালোচকের সম্ভবতঃ একটি

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৪৭।

২। Brahmo Year Book for 1878, Pp 15.

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল (অথবা সাপ্তাহিক ক্রম অনুসারে প্রকাশিতব্য ১লা মার্চের সংখ্যাটি বিলম্বে প্রকাশিত হয়েছিল)। এই সংখ্যায় (৬ই মার্চ ১৮৭৮, ২৩এ ফাল্গুন ১২৮৪) গিরিজাসুন্দরী সেন, রাজলক্ষ্মী সেন প্রমুখ বিক্রমপুরের ব্রাহ্মিকাদের কয়েকজনের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত আনন্দমোহন বসুর লেখা প্রতিবাদ পত্রটি উল্লেখযোগ্য।[১] এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল স্তরই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা অবশ্য স্মরণীয়। 'সমালোচক' সম্পাদনা-কালেই শিবনাথের চাকুরী জীবনের সমাপ্তি ঘটে। অনেকদিন থেকেই চাকুরীত্যাগের কথা তিনি ভাবছিলেন। কিন্তু এ সময়েই তাঁর স্বাধীনতাবোধ এত উগ্র হয়ে ওঠে যে প্রচুর অর্থের লোভ ত্যাগ করে তিনি ১লা মার্চ ১৮৭৮ তারিখে কাজে ইস্তফা দেন।

শিবনাথ কতদিন 'সমালোচক' সম্পাদনা করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। অবশ্য তিনি যে অধিক দিন এর সম্পাদক ছিলেন না, সে কথার উল্লেখ করে শিবনাথ নিজেই লিখেছেন, 'এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে সমালোচক তুলিয়া লইয়া দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।'[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে শিবনাথ 'সমালোচকের' প্রথম দুই বা তিন সংখ্যা সম্পাদনা করেন।[৩] ১৮৭৮ সালের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকে (পৃঃ ৯১) 'Periodicals Under Brahmo Management'-এর তালিকায় 'সমালোচক'কে 'Weekly General Newspaper' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং সম্পাদক হিসাবে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ব্রাহ্ম ইয়ার বুকেও ঐ একই প্রকার মন্তব্য দেখি (পৃঃ ১০০) ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় 'সমালোচকে'র কোন উল্লেখ দেখি না। এ থেকে মনে হয় যে, ১৮৭৯ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও খুব বেশি দিন চলে নি।

১। Ibid, Pp 16-17
২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৬৭।
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০।

'সমালোচক' যে বেশিদিন চলে নি তার মুখ্য কারণ, ইতিমধ্যে কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন থিতিয়ে এসেছিল ; আর গৌণ কারণ হল, চড়া সুরে বাঁধা তারে বেশিদিন সুর বাজে না। শিবনাথও পরে 'সমালোচকে'র প্রকাশ ভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কাজেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর 'তাহাকে··(সমালোচককে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না।'

যাই হোক্, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ও যা তাঁর কাছে অন্যায় বলে মনে হত, তার প্রতিবাদে শিবনাথের স্বরূপ এই পত্রিকাটির মাধ্যমে কিছুটা প্রকাশিত হতে পেরেছিল মনে করি।

৫ । তত্ত্বকৌমুদী

কুচবিহার বিবাহানুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের সংঘাতময় ক্ষেত্রে যে নবতর দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত করেছিল, তার প্রত্যেক ফল দেখা দিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়। এই নূতন সমাজের একটি মুখপত্রের প্রয়োজন হল তাঁদের আপন বক্তব্যকে সাধারণ্যে প্রচারের জন্য। শিবনাথ পত্রিকাটি আবির্ভাবের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, '···আমরা নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।' নূতন কাগজের নাম কি হয় কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী' : আদি সমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী' : ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কাগজের নাম 'ধর্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে 'তত্ত্ব' এবং রাজা রামমোহন রায়ের 'কৌমুদী' লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্বকৌমুদী'। ১৮৭৮ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।[১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ব্রাহ্ম শ্রেণী সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদী নামে এক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'তত্ত্ব' শব্দ এবং রামমোহন রায়ের প্রকাশিত কৌমুদী পত্রিকার নাম দুই একত্র করিয়া আপনাদিগের প্রকাশিত

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫১।

পত্রিকার নামকরণ করিয়াছেন'।[১] বিপিনচন্দ্র পালও ঐ একই কথা লিখেছেন।[২]

'রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন মহাধর্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে', সেই ধর্মভাবের প্রচারোদ্দেশ্যেই শিবনাথ 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মুখ্যত: মতভেদের কারণে সৃষ্ট বলে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় অনিবার্যভাবে দলগত বা সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমালোচনা প্রকাশিত হতে লাগল। সেকারণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই নবপ্রকাশিত পত্রিকাটিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে লিখেছেন, 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ন্যায় পত্রিকা যতই প্রকাশিত হয় ততই আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়,...। তিনি (সম্পাদক) কেবল ঈশ্বর ও ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্মের মত প্রচার করিলে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হইবেন সন্দেহ নাই। এবার তত্ত্বকৌমুদীতে যেমন বিবাদ বিসম্বাদের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে ভরসা করি সহযোগী সেইরূপ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী ধর্মজগতের উপর বর্ষণ করিয়া লোকের প্রাণমন শীতল করিবেন।'[৩]

প্রধানত: সাম্প্রদায়িক কারণে আবির্ভূত হলেও তত্ত্বকৌমুদীতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হত। আসলে ব্রাহ্মধর্মের মূল কথাই ছিল, জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের একেশ্বরবাদমূলক উপদেশাদির সারগ্রহণ ও প্রচার। বাইবেল, পার্কারের 'টেন্ সারমনস্', নিউম্যান, গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নানা উপদেশ ও আখ্যানের আলোচনা তত্ত্বকৌমুদীর বৈশিষ্ট্য ছিল। আবার ধর্মবিষয়ক নানা কবিতার (শিবনাথ এগুলির বেশির ভাগেরই রচয়িতা ছিলেন) প্রকাশ দ্বারা পত্রিকাটিকে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ যে মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে তিনটি ভিন্ন সমাজে বিভক্ত হয়ে গেছিল, তার মূল কারণ যতটা সামাজিক ও ব্যক্তিগত, ততটা ধর্মগত নয়। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই তত্ত্বকৌমুদীতে তৎকালীন

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮০০ শক, ৪১৯ সংখ্যা, পৃ: ৫৭-৫৮।
২। B. C. Pal, Memoirs of my Life and Times, pp 345.
৩। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮০০ শক, ৪১৯ সংখ্যা, পৃ: ৫৭-৫৮।

নানা সামাজিক প্রশ্নও আলোচিত হতে লাগল। বিশেষ করে Act III of 1872—বিবাহ সম্পর্কিত এই আইনটি তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ সমূহের মুখপত্রগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। বিতর্কমূলক এই সামাজিক সমস্যাগুলি ব্যতীত নানা সামাজিক উপদেশও শিবনাথ পত্রিকাটিতে প্রকাশ করতেন।[১]

পাশ্চাত্য দর্শনসমূহের আলোচনা উনিশ শতকের মনীষীদের মুখ্য বিষয় ছিল। বিশেষ করে হিউম, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির দর্শনচিন্তা প্রাচ্যদেশে প্রভূত পরিমাণে চর্চা করা হচ্ছিল। 'জড়বাদ' এই প্রকার চিন্তার মধ্যে অন্যতম ছিল। তত্ত্বকৌমুদীতে এই 'জড়বাদ'[২], 'মানব প্রকৃতি'[৩] প্রভৃতি পাশ্চাত্য দর্শন সমূহেরও আলোচনা প্রকাশিত হত।

পুস্তকাদির রিভিউ প্রকাশ, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা যথারীতি তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় থাকত। তবে পত্র-পত্রিকার আলোচনাগুলি দলগত কারণে কিঞ্চিৎ তিক্তরসযুক্ত থাকত। এগুলিকে পত্রিকামূলক কলহবিচার বলা যেতে পারে। বিশেষত: তত্ত্ববোধিনী ও ইণ্ডিয়ান মিরারের সঙ্গে এই প্রকারের বিচার মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। তত্ত্বকৌমুদীর এই চরিত্রটি যথাযথ অনুধাবনের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করছি। ১লা চৈত্র ১৮০০ শক সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী' কেশব-দেবেন্দ্রের সংঘাতকে 'এক-তন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তার' সঙ্গে 'সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তার' দ্বন্দ্ব বলে অভিহিত করায় 'তত্ত্ববোধিনী' তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।[৪] আবার ১৬ই বৈশাখ ১৮০১ সংখ্যার 'তত্ত্বকৌমুদী'তে ব্রাহ্মবিবাহের যে প্রতিবাদ ('সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী') প্রকাশিত হয়, আষাঢ় সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে সেই প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই কলহের সূত্র ধরে আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পরিশেষে লিখেছেন, 'আমরা আমাদিগের সহযোগীকে এ পর্যন্ত অনেক কথা বলিয়াছি, তথাপি তিনি বুঝিলেন না, অতএব তাঁহাকে বুঝাইবার বিষয়ে আমাদিগকে অবশেষে পরাজয় মানিতেই হইল' (পৃ: ১০৯)। দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে এই বিবাদকে

১। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সামাজিক প্রবন্ধ সংকলন—'গৃহধর্ম'।
২। ও ৩। যথাক্রমে 'তত্ত্বকৌমুদী'র দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।
৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৮০১ শক, পৃ: ১৩।

প্রশ্রয় দিয়েছিলেন বলা অসঙ্গত হবে না। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যারত্ন এবারকার পত্রিকাতেও তত্ত্বকৌমুদীকে খুব প্রহার করিয়াছেন, খুব চাবুক দিয়াছেন। তাহার আর মাথা উঠান ভার হইবেক।'[১]

এই সব কারণে বলা যেতে পারে যে, তত্ত্বকৌমুদী একটি সাধারণ সংবাদ পত্রের মত প্রচারিত হয় নি। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'তত্ত্বকৌমুদী আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্মতত্ত্বের মত কেবল ব্রাহ্মসমাজের মতবাদই প্রচার করিত, সাধারণ সংবাদ পত্র ছিল না।'[২]

তত্ত্বকৌমুদীকে শিবনাথ আত্মজের স্নেহে লালন করে এসেছেন। কারণ এটি শিবনাথ সম্পাদিত পত্রিকা (দ্বিতীয় পত্রিকা), যাকে তিনি স্বাধীনভাবে সম্পাদনা করেছিলেন এবং যেটি তাঁর স্বাধীন মতামতের বাহক ছিল। 'তত্ত্বকৌমুদী'কে পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য শিবনাথ অশেষ যত্ন করেছেন। প্রথম দিকের তত্ত্বকৌমুদীর প্রতিটি রচনা শিবনাথেরই ছিল এমন মন্তব্য করা অত্যুক্তি হবে না। শিবনাথ নিজেই লিখেছেন, 'অনেকদিন এরূপ হইত, তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না। এক এক দিন এমন হইয়াছে, দুই পত্রিকা একদিনে বাহির হইবার কথা। প্রত্যূষে স্নান ও উপাসনান্তে প্রেসে বসিয়াছি, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ সারিয়া তত্ত্বকৌমুদীর কাজ, সে কাজ সারিয়া ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের কাজ, এইরূপ সমস্ত দিন চলিয়াছে। মধ্যে এক ঘণ্টা আহার করিয়া লইয়াছি।'[৩] মনে রাখতে হবে যে, এই পরিশ্রম-শক্তি শিবনাথ তাঁর মাতুলের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখক সংগ্রহের ব্যাপারে শিবনাথ অনেকাংশে উদার ছিলেন। আনন্দচন্দ্র মিত্র, শশিভূষণ বসু, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের লেখা ব্যতীত তত্ত্ববোধিনী ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সারাংশাদিও তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত

১। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংকলিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী', ৮৬ সংখ্যক পত্র, পৃঃ ১১৬-১৭। পত্ররচনার তারিখ—দার্জিলিং ৫ আষাঢ় ৫০ ব্রাহ্মাব্দ (—১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

২। বিপিনচন্দ্র পাল, সত্তর বৎসর, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃঃ ৬০২।

৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৭৪।

হত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও শিবনাথ লেখক-গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।[১]

অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কর্মের ডাকে শিবনাথকে প্রায়ই বাইরে যেতে হত। সে সময়ে এবং শিবনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। যেমন দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শিবনাথ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গেলে তৃতীয় বর্ষের ত্রয়োবিংশ সংখ্যা থেকে কৃষ্ণকুমার মিত্র; অষ্টম বর্ষের কার্তিক সংখ্যা থেকে সীতানাথ দত্ত; নবম বর্ষের বৈশাখ সংখ্যা থেকে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ব্যক্তি তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু দূরে গেলেও পত্রিকাটির প্রতি শিবনাথের তীক্ষ্ণ নজর থাকত।

শিবনাথের সাক্ষাৎ যত্নের ফলে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমনি আয়ও বেড়েছিল প্রচুর। তৃতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় দেখছি যে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে পত্রিকাটির গ্রাহক সংখ্যা হয়েছিল ৪৫০। আর যে সময়ে 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রতিমাসেই প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করছে, সে সময়ে তত্ত্বকৌমুদী উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাভ করেছে।—'তত্ত্বকৌমুদী-গত তিন মাসে ইহার আয় ২২১৸৴১০, ব্যয় ১৮৪৲।' ১লা কার্তিকের (১৮০৫ শক) পূর্বের তিন মাসে আয় হয়েছিল ১২০৶২।

শিবনাথ আপন নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তত্ত্বকৌমুদীর প্রচারে যে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন, তার ফলে আজ দীর্ঘ ৯৫ বছর ধরে সেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে। সে যুগের কোন সাময়িক (পাক্ষিক) পত্রিকাই অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়ে এমন দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয় নি।

৬ ॥ সখা ॥

শিশুদের উপযোগী পত্রিকা প্রকাশের প্রথম পর্বে 'সখা' একখানি উচ্চ অঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। তরুণ বয়স্ক প্রমদাচরণ সেন এই পত্রিকাটি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করেন। এই প্রমদাচরণ সেন

১। শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ২৫।
২। তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই বৈশাখ ১৮০৫ সংখ্যা।

শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রমদা হেয়ার স্কুলে আমার নিকট পড়িত…প্রমদা আমার ধর্মপুত্র ছিল।'[১]

কাজেই অনুমান করতে বাধা নেই যে, 'সখা'র জন্মমুহূর্ত থেকেই শিবনাথ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগস্ট ১৮৮৪ সংখ্যা থেকে শিবনাথ 'সখা'র পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ জুন তারিখে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে প্রমদা-চরণের মৃত্যু হয়। প্রমদাচরণের অকৃতকার্য সমাপ্ত করার জন্য শিবনাথ পরবর্তী জুলাই সংখ্যা থেকে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। তৃতীয় বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (জুলাই ১৮৮৫) থেকে সমগ্র চতুর্থ বর্ষের (১৮৮৬) সখার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যার (জানুয়ারি ১৮৮৭) সম্পাদকীয়ও তিনি লিখেছিলেন।

'সখা' পত্রিকায় শিবনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় (আগস্ট, ১৮৮৪)—'স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস)' নামক একটি সচিত্র জীবনী। সম্পাদক হিসাবেও তিনি 'সখা'র পৃষ্ঠায় বহু জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। আমরা সেগুলির উল্লেখ করছি:—রামতনু লাহিড়ী (মার্চ ১৮৮৫), প্রমদাচরণ সেন (জুলাই ১৮৮৫), পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (অক্টোবর ১৮৮৫), বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর (জানুয়ারি ১৮৮৬), জোসেফ ম্যাটমিনি (মার্চ, ১৮৮৮), স্যার উইলিয়ম জোন্স (জুন ১৮৮৬), স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬), পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৮৮৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জানুয়ারি ১৮৮৭)।

অন্যান্য বহু শিশুপাঠ্য রচনার মধ্যে সাধের নৌকা (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) আবদারে ছেলে (জানুয়ারি ১৮৮৬), রামকান্তের ঘোড়া (মে ১৮৮৬), শ্যামচাঁদের পাঁচদশা (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬), পেটুক পুষি (জানুয়ারি ১৮৮৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সখা'র পৃষ্ঠায় একটি নূতন বিষয়ের সূত্রপাত করেন শিবনাথ। সেটি হল বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা। 'বায়ুমণ্ডল' নামে একটি অসমাপ্ত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা জুন ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিত, পৃঃ ১২৬।

প্রমদাচরণ যে উদ্যোগ ও কৃতিত্বের সঙ্গে 'সখা'কে প্রথম শ্রেণীর শিশু-মাসিকে পরিণত করেছিলেন, শিবনাথ তাঁর সহজাত অধিকার ও পূর্ব অভিজ্ঞতাবলে পত্রিকাটিকে পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। প্রমদাচরণের মৃত্যুর পর প্রমদার বহু অপ্রকাশিত রচনা শিবনাথ এই পত্রে প্রকাশ করেন। নূতন লেখকগণের মধ্যে চিরঞ্জীব শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ ইনি ছিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। এঁর লেখা একটি কবিতা 'ছেলেখেলা' প্রকাশিত হয় নভেম্বর ১৮৮৫ সংখ্যায়। এই ঔদার্য আরও প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাটির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রে। তবু প্রমদাচরণ ব্রাহ্মভাবপূর্ণ রচনা প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রমদাচরণ যা পারেন নি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়েও শিবনাথ তা পেরেছিলেন। তিনি স্পষ্টতঃই বুঝেছিলেন যে সম্প্রদায়গত গোঁড়ামির গণ্ডী পার হলেই তবে শিশুদের বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যোগ করা সম্ভব হবে। ফলে হিন্দু-ব্রাহ্মের মধ্যগত ভেদ-রেখাটি লুপ্ত হয়ে যথার্থ শিশুপত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন অন্নদাচরণ সেন। জুন ১৮৮৭ সংখ্যার পর শিবনাথের কোনো রচনা (অন্ততঃ স্বনামে) প্রকাশিত হতে দেখি না। এ ছাড়া, মে ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভরত বিলাপ' নামক কবিতাটি এবং জুন ১৮৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বায়ুমণ্ডল' নামক রচনাটির শেষে 'ক্রমশঃ' লেখা থাকা সত্ত্বেও রচনা দুটি আর প্রকাশিত হয় নি। অনুমান করি, হয়ত এই সময় থেকে কোন কারণে শিবনাথের সঙ্গে তৎকালীন 'সখা' সম্পাদকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

৩ ॥ মুকুল ॥

'সখা'র ক্ষেত্রে শিশুসাহিত্যের সঙ্গে শিবনাথের পরিচয়ের অঙ্কুর 'মুকুলে' গিয়ে মুকুলিত হয়ে উঠল। বাংলা ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে (ইংরেজি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) শিবনাথের সম্পাদকত্বে 'মুকুল' প্রকাশিত হয়। গুরুচরণ মহলানবিশের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী এবং শিবনাথের কন্যা হেমলতার উদ্যোগে একটি নীতি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি এই নীতি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকর্তা ও উৎসাহদাতা ছিলাম।···কয়েক বৎসর পরে (১৮৯৫ সালে)

ইঁহারা বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। তখন আমি তাহার সম্পাদক হইয়া মুকুল নাম দিয়া এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলাম এবং কিছুদিন তাহার সম্পাদকতা করিলাম।'[১]

কয়েকটি বালিকার উদ্যোগে এই ধরণের পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস নবতর সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। '১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত শিশুদের কোন ভাল কাগজ ছিল না।...শিশুদের আনন্দ দিবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত তাঁর (রামানন্দ) উদ্যোগে ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে 'মুকুল' নাম দিয়া একটি শিশুপাঠ্য সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল উৎসাহী যুবকেরা বলিয়া-কহিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মুকুলের সম্পাদক করেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু। আত্মভোলা উদাসীন রামানন্দ অন্তরালে ছিলেন, কিন্তু কি রচনা সংগ্রহে কি স্বয়ং রচনায় তাঁর উৎসাহ ইহাদের অপেক্ষা বেশী বই কম ছিল না।'[২]

সচিত্র এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় করা হয়েছে। 'জ্ঞানের মুকুল, প্রেমের মুকুল, সকল ভাল বিষয়েরই মুকুল অবস্থা আছে। এই পত্রিকা যাহাদের জন্য, তাহারাও মুকুল, মানব মুকুল।...মানব মুকুলদিগকে ফুটাইবার পক্ষে সাহায্য করাই মুকুলের উদ্দেশ্য।...আমরা মানব মুকুলদিগের হস্তে জ্ঞানের মুকুল দিব, যাহা তাহাদের জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত হইবে।' বাস্তবিকই পত্রিকাটি বিচিত্র জ্ঞানের মুকুলে সুরভিত হয়ে উঠেছিল। যে 'মানব মুকুলদের' প্রয়োজন স্মরণ করে গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা ও চিত্রের বিচিত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল, উদ্যোক্তাগণ যে তাদের সম্পর্কে কতখানি সজাগ ছিলেন, মুকুলের পৃষ্ঠাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। 'অনেকের ধারণা আছে, মুকুল ছোট ছোট শিশুদের জন্য, অর্থাৎ যাহাদের বয়স ৮।৯ বৎসরের মধ্যে প্রধানত তাহাদের জন্য। মুকুলে এমন অনেক কথা থাকে, যাহা এত অল্প

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১২৬।

২। শান্তা দেবী, রামনন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৪৮।

বয়স্ক শিশুগণ বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার কথাও নহে। যাহাদের বয়স ৮।৯ হইতে ১৬।১৭র মধ্যে ইহা প্রধানতঃ তাহাদের জন্ম। আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক-বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি।'[১] এ থেকে মুকুলের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই একটা ধারণা মুকুলের পাঠকগণের পক্ষে করে নেওয়া সহজ হয়েছিল। বয়সের কথা প্রসঙ্গে মনে হতে পারে যে ১৬।১৭ বছরের ছেলেদের উদ্দেশ্যে রচিত লেখাগুলি যথার্থই শিশুপাঠ্য কিনা। প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টতঃই বলেছিলেন, 'শিশু সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। কেন না শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না; আর শিশুরা সমাজের আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করে না।' তাঁর মতে শিশুপাঠ্য না হোক বালকপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত।[২] প্রমথ চৌধুরীর মতের সঙ্গে শিবনাথের মতের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। বলা যেতে পারে শিশুপাঠ্য পত্রিকা সম্পর্কে বয়সের এই সীমা নির্ধারণ সঠিক এবং বিজ্ঞান-সম্মত।

কাগজটিকে সর্বপ্রকারে আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে শিবনাথের বিচিত্র প্রয়াস কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়। রচনা-বৈচিত্র্য ব্যতীত নানাবিধ কৌতুককর বিজ্ঞাপন, রচনা সম্পর্কে পাঠকগণের মতামত আহ্বান, শিশুরচনা প্রকাশ মুকুলের বৈশিষ্ট্য ছিল। "তোমরা মুকুলকে ভালবাস, একথা কি আমাদিগকে জানিতে দিবে না?…যাহারা মুকুলকে ভালবাস, তাহারা যদি এক একখানি পোস্টকার্ডে "আমি মুকুলকে ভালবাসি", এই কয়টী কথা লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাও, তবে আমরা সেই কার্ডগুলি রাখিয়া দিব—[৩]"। মুকুলকে জনপ্রিয় করার জন্য এই চিন্তা অভিনব বলা যেতে পারে। অবশ্য শিবনাথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টান্তে এই প্রকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আবার বালক-বালিকাদের সৎকার্যের নানা বিবরণের প্রকাশের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পাঠক বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করেছিল।

কিন্তু যে গুণে মুকুল শিশুচিত্তকে সর্বাধিক পরিমাণে আকর্ষণ করতে

১। মুকুল কাহাদের জন্য? মুকুল, ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ ১৭।
২। সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৩।
৩। নববর্ষের সম্ভাষণ, মুকুল, ২য় ভাগ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩০৩।

সমর্থ হয়েছিল, তাহল এর চিত্র-সম্পদ। প্রায় প্রতিটি রচনা চিত্রসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হত। ছবিগুলি অনেক সময়ে বিলাতী পত্র-পত্রিকা থেকে গৃহীত হত। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে নানা আখ্যান-ভিত্তিক চিত্রাবলী ছাপিয়ে সে সম্পর্কে কবিতা ইত্যাদি রচনার আহ্বান জানিয়ে তরুণ লেখকদের উৎসাহ দেওয়া হত। চতুর্থ বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় চিত্র-অনুসারে কবিতা লিখে বালক বারীন্দ্র কুমার ঘোষ পুরস্কার পান।[১] পরে এই ছবিগুলির অনেকগুলি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের গ্রন্থসমূহে তাঁর স্বরচিত কবিতাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে ছবিগুলি অবলীলাক্রমে যোগীন্দ্রনাথেরই স্বত্বাধিকার পেয়েছে। অথচ শিবনাথের কথা আজ আর কেউ ভাবে না। কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত 'বালকবন্ধু' থেকে 'মুকুল' পর্যন্ত সব পত্রিকাতেই রচনার সঙ্গে চিত্র মুদ্রিত হয়ে এসেছে। সেদিক থেকে শিবনাথ নূতন কিছু প্রবর্তন করেন নি। কিন্তু ছবি ছাপার ব্যাপারে মুকুলের কর্তৃপক্ষের প্রয়াস যে কতখানি আন্তরিক ছিল, শান্তা দেবী তার সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছেন, "'মুকুলে' একটি মাত্র কবিতায় রঙীন ছবি দিবার জন্য ইহারা পোটো ডাকিয়া আনিয়া কাঠের ব্লকে ছাপা প্রতি কপি আলাদা আলাদা করিয়া হাতে রং দেওয়াইয়াছিলেন।"[২]

'মুকুলে'র সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের অপর সিদ্ধি লেখকগোষ্ঠী আহ্বান ও নূতন লেখক আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। সম্পাদক হিসাবে তিনি নিজে তো লিখতেনই, তাছাড়া বাংলা দেশের তৎকালীন সমস্ত প্রতিভাকে তিনি 'মুকুলে'র পৃষ্ঠায় আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথম বৎসরের 'মুকুলে' সর্বমোট ২৯ জন লেখক-লেখিকার মধ্যে অবলা বসু, কুসুমকুমারী দাস, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রমণীমোহন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেন্দ্র কুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বছরে লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, অমৃতলাল গুপ্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বালক সুকুমার রায়, হরিহর শেঠ, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

১। 'শ্রীমান বারীন্দ্র কুমার ঘোষের লেখাটি চলনসই রকমের হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকেই ৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'—মুকুল, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, পৃঃ ৩২।

২। শান্তা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ৬৮।

প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। উপর্যুক্ত দীর্ঘ তালিকা থেকে পত্রিকা হিসাবে 'মুকুলে'র মূল্য স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়। এতগুলি প্রতিভার একত্র সমাবেশ তৎকালীন, এমন কি বর্তমানেও কোন পত্রিকায় সম্ভব হয়নি—এমন মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না।

প্রতিষ্ঠিত লেখকগণকে আহ্বান করা ব্যতীত নূতন লেখক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের কৃতিত্ব অনেকাংশে গুপ্তকবির সঙ্গে তুলনীয়। বঙ্কিম, দীনবন্ধু প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দের গুরু হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, শিবনাথ অবশ্যই সেই মর্যাদার অধিকারী। কারণ সুকুমার রায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতি বালককে রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তাঁদের উত্তরকালের সাহিত্য-সাধনায় শিবনাথ প্রথম গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। আট বছরের বালক সুকুমার রায়ের প্রথম কবিতা 'নদী' মুকুলেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল—জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সংখ্যায়। বারীন্দ্র কুমার ঘোষের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বালক-বালিকারা যাতে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হয়, সেজন্য শিবনাথ নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। চিত্র-কাহিনী রচনা আহ্বান, 'কোনও পাঠিকার একটি সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা ছাপিয়া' প্রকাশ, বালক-বালিকাগণের নানাপ্রকার সৎকার্যের বিবরণ প্রকাশ, ধাঁধাঁর উত্তরদাতাদের (১৬ বছরের অনধিক) বর্ষশেষে দশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা, বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি পৃষ্ঠায় মেয়েলী ঘরকন্না বিষয়ে রচনা প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা পাঠক-পাঠিকা মহলের একাংশকে রচনাকর্মে আকর্ষণ করেছিলেন সম্পাদক শিবনাথ। আধুনিক কালে শিশুপাঠ্য পত্রিকায় বালকদের জন্য কয়েকটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট রাখা হয় তাদের সাহিত্যকর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য, শিবনাথ শাস্ত্রীই ছিলেন এর পথপ্রদর্শক।

লেখকদের মত লেখাগুলিও লক্ষ্য করার মত! কেবলমাত্র মুকুলের পৃষ্ঠা থেকেই শিবনাথ এবং অন্যান্য লেখকদের রচনা সংগ্রহ করে একটি মনোরম শিশুপাঠ্য সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব—এমনই রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। কুসুমকুমারী দাসের সুবিখ্যাত 'আদর্শ ছেলে' (পৌষ ১৩০২), জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' (আষাঢ় ১৩০২) ও 'মন্ত্রের সাধন' (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩০৫), রবীন্দ্রনাথের 'কাগজের নৌকা' (আশ্বিন ১৩০২) ও 'সুখ ও দুঃখ' (শ্রাবণ ১৩০৩), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণের' প্রথমাংশ (শ্রাবণ ১৩০৩), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মজার মুল্লুক' (কার্তিক

১৩০৫) প্রভৃতি সুবিখ্যাত রচনাগুলি 'মুকুলে'র পৃষ্ঠাতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শিবনাথের লেখা শিশুপাঠ্য গল্প-সংকলন সম্প্রতি 'ছোটদের গল্প' (১৯৬৪) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্র-রচনাগুলিতে সব সময়েই পাঠকগণকে লেখার জন্য আহ্বান করা হত। পূর্বোল্লিখিত বারীন্দ্র কুমার ঘোষের চিত্র-রচনাটির উপর যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর একটি কবিতা 'বেজায় ধূর্ত' নাম দিয়ে লিখেছিলেন; এটি তাঁর 'হাসিরাশি' বইটিতে সংকলিত আছে। সম্পাদক হিসাবে শিবনাথও ছবিগুলির কোন কোনটির উপর কবিতা রচনা করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (ভাদ্র ১৩০২) কবিতাটির উল্লেখ করছি। এই ছবিটির উপর যোগীন্দ্রনাথ সরকারও 'সাপ নয় তো যম' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন।

'মুকুল' পত্রিকার অপর বৈশিষ্ট্য ছিল নানা জীবনী প্রকাশ করে পাঠককুলের সম্মুখে একটা আদর্শ স্থাপনের মধ্যে। স্বয়ং সম্পাদক এই ধরণের জীবনী[১] রচনায় সর্বাধিক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। জাতীয় গৌরববোধ, স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রগঠন—এই রচনাগুলির প্রধান শিক্ষা ছিল।

শিশুদের জন্য নানা ভৌতিক রচনা আধুনিক কালের শিশুপাঠ্য পত্রিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। শিশুদের পক্ষে এই ধরণের তরল চিন্তা ক্ষতিকর হবে ভেবে সম্ভবতঃ শিবনাথ 'মুকুলে' কোন ভূতের গল্প প্রকাশ করেন নি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'বলবন্ত সিংহ'কে কোনক্রমেই ভৌতিক গল্প বলা চলে না। বরং একে রূপকথা জাতীয় রচনা বলাই সঙ্গত।

এই রূপকথার রস পরিবেষণে শিবনাথের যত্নের ত্রুটি ছিল না। সেজন্যে তিনি নিজে বিদেশী রূপকথার অনুবাদ করে 'মুকুলে' প্রকাশ করেছিলেন।[২] উপকথাগুলি যথাক্রমে এই;—১. সখের যাত্রার দল (আশ্বিন ১৩০২), ২. কাঠুরের মেয়ে (কার্তিক ১৩০২), ৩. হাতকাটা মেয়ে (পৌষ ১৩০২), ৪. না বুঝে করিলে কাজ শেষে হায় হায় (মাঘ ১৩০২), ৫. হংসরূপী রাজপুত্র (চৈত্র ১৩০২)।

১। শিবনাথ-রচিত এই ধরণের একটি জীবনী-সংকলন 'স্বনামা পুরুষ' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬৪)।

২। ১৯০৭ সালে শিবনাথ-কর্তৃক 'উপকথা' নামে প্রকাশিত।

আধুনিক কালে 'একটুখানি হাসো' ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় যে স্তম্ভ থাকে, সেই ধরণের চুটকি রচনার সূত্রপাত শিবনাথ 'মুকুলে'ই প্রথম প্রকাশ করেন। কৌতূহলোদ্দীপক হবে ভেবে একটি উদাহরণ উদ্ধার করছি :—

মা। কিরে হরে, তুই কাঁদছিস যে?

ছেলে। ভোলা—আ—আ—আমাকে মে—রে—ছে—।

মা। তুই তাকে আচ্ছা করে ফিরিয়ে দিলিনে কেন?

ছেলে। আ—মি—আগেই ফিরিয়ে দি—ছি—লু—ম!'[১]

সম্পাদক হিসাবে শিবনাথের কৃতিত্বের কথা আমরা আর একবার আলোচনা করছি। সম্পাদকের যে একটা দায়-দায়িত্ব থাকে সম্পাদনার ব্যাপারে, শিবনাথ সে সম্পর্কে পুরো মাত্রায় ওয়াকিবহাল ছিলেন। কোন রচনা প্রকাশ করার পূর্বে তাকে প্রয়োজন বোধ করলে সংস্কার করে নিতেন। আবার রচনার মৌলিকতা বিষয়ে সন্দেহ জাগলে তিক্ত-কষায় ভাষায় সমালোচনাও করতেন। কোন এক গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত 'সর্পের কৃতজ্ঞতা' (আশ্বিন ও কার্তিক ১৩০৪) নামক রচনাটি প্রকাশ করে সম্পাদক পাদটীকায় লিখেছেন, 'গল্পটী সত্য কিনা জানি না, কোন্ পুস্তকে তিনি এই গল্পটী পাইয়াছেন, লেখক তাহা জানাইলে, ভাল হইত। শেষ অংশ অসম্ভববোধে পরিত্যক্ত হইল।' ফজলে করিম নামক এক পাঠক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'জ্ঞানমুকুল' বইয়ের 'ছোটপাখী' নামক কবিতাটি চুরি করে প্রকাশ করতে চাইলে শিবনাথ তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩, পৃঃ ৩১)। দশচক্রে ভগবানের প্রেতযোনি-প্রাপ্তির প্রবাদ আমরা জানি। কিন্তু স্বয়ং সম্পাদককেও একবার এই প্রকারের পরস্বাপহরণের অভিযোগে সোপর্দ হতে হয়েছিল। 'পত্র প্রেরকদিগের প্রতি'[২] স্তম্ভে লক্ষ্য করি 'মুকুলে'র একজন 'হিতাকাঙ্ক্ষী' সম্পাদকরচিত 'তিনটি বর' (আষাঢ় ১৩০৩) নামক গল্পটি শিবনাথ কোথা থেকে অপহরণ করেছেন—এমন ইঙ্গিত করে চিঠি লেখায় শিবনাথ লিখেছেন যে, 'পত্রপ্রেরকের নাম জানিতে পারিলে, আর কোন উপকার না হউক, তাঁহার শিক্ষা এবং রীতিনীতির

১। মুকুল মাঘ ১৩০২, পৃঃ ১.৭।

২। মুকুল শ্রাবণ ১৩০৩, পৃঃ ৬৩।

সুবন্দোবস্তের জন্য অন্তত: তাঁহার পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে পারিতাম।'

সুসম্পাদনার গুণে মুকুলের বহুল প্রচার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশের প্রায় দেড় বছরের মধ্যে 'মুকুলে'র গ্রাহক সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক হয়েছিল—'আমাদের দেড় হাজারেরও অধিক গ্রাহক আছেন……'[১]। গ্রাহকদের মধ্যে মুকুলের প্রভাব কেমন ছিল, সে সম্পর্কে দৌলতপুর-নিবাসী জনৈক কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 'সংকটে প্রাণরক্ষা' নামক যে চিঠিটি সম্পাদককে পাঠিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিরাট এই চিঠিটির বক্তব্য হল এই যে, একটি বালক নিদারুণ অসুস্থ হয়ে যখন বিকারগ্রস্ত হয়, তখন 'মুকুল' পত্রিকা পাঠে সে আশ্চর্যজনকভাবে রোগমুক্ত হয়। 'মুকুলে'র এই মুষ্টিযোগ দেখে বালকটির পিতা বলেন, 'যেদিন মুকুল আসে বাছার মুখে সেদিন আর হাসি ধরে না। এমন সুন্দর কাগজের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।[২] ঘটনাটি কল্পিত কিনা জানি না, তবে মুকুলের প্রচার এত বেশি হয়েছিল যে তার প্রশংসা সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল,—মুকুলের একটি বিজ্ঞাপন থেকে একথা জানতে পারি।

১৩০৭ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করার পর শিবনাথ 'মুকুলে'র সম্পাদকতা ত্যাগ করেন এবং হেমচন্দ্র সরকার সেই ভার গ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধি ও অসুস্থতার কারণে শিবনাথ এই ভার ত্যাগ করেন বলে মনে হয়। কিংবা হয়ত মুকুলের প্রকৃতির সমতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে যে কোন কারণেই সম্ভব হচ্ছিল না। 'সাহিত্য' পত্রিকার একটি সমালোচনায় এমন ইঙ্গিত লক্ষ্য করি ;—'পৌষ ও মাঘ। মুকুল শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। শিশুপাঠ্য একমাত্র মাসিকের এই দশা! দেশের প্রশংসা করিব, না অদৃষ্টের নিন্দা করিব?…মুকুল আমাদের বড় আদরের,—মালীর নিকট প্রার্থনা করি, মুকুল যেন শুকাইয়া ঝরিয়া না যায়।'[৩]

১। মুকুল, পৌষ ১৩০৩, পৃঃ ১৩০।
২। মুকুল, ফাল্গুন ১৩০৩, পৃঃ ১৯-৭৩।
৩। সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০৭, পৃঃ ৭০৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পত্রিকা কথা

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভারত সংস্কার সভার মদ্যপাননিবারণী শাখার মুখপত্র 'মদ না গরল' পত্রিকা-সম্পাদনায় হাতে খড়ি হওয়ার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে শিবনাথ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করে সম্পাদক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পূর্বালোচিত পত্রিকাগুলি ছাড়া আরও দুটি পত্রিকার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাটির সঙ্গে স্বল্পদিনের জন্য সম্পাদনার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক তালিকায় কৃষ্ণকুমার মিত্র ছাড়া আরও দুজনের নাম উল্লেখ করেছেন[১]—এঁরা হলেন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তৎকালীন সরকার নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলে 'সঞ্জীবনী'র প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে। অথচ পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশের ব্যাপারে শিবনাথের উদ্বেগের অবধি ছিল না। এই সময়ে শিবনাথ যে 'সঞ্জীবনী'র পরোক্ষ সম্পাদক হয়ে পড়েছিলেন, তার কয়েকটি প্রমাণ আমরা তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে উল্লেখ করছি। 'কৃষ্ণকুমারবাবুকে যে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাঁহার অনুপস্থিতকালে সঞ্জীবনী যে কিরূপে চালান যাইবে সে বিষয়ে পরামর্শ হইল' (ডায়েরীর তারিখ ২০-১২-১৯০৮)। এই পরামর্শ তিনি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সঙ্গে করেছিলেন। সঞ্জীবনী কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনীর নামে প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু শিবনাথই সে ব্যাপারে মুখ্য সহযোগী হলেন। তিনি লিখেছেন 'সঞ্জীবনী আপিসে কৃষ্ণকুমার বাবুর পরিবারদিগকে দেখিতে গেলাম। সেখানে মুখে মুখে সঞ্জীবনীর জন্য কিছু বলিলাম, কুমুদিনী লিখিয়া লইলেন' (২১.১২ ১৯০৮)। পরদিনের (২২.১২.১৯৩৮) ডায়েরীতেও তিনি লিখেছেন, '…কৃষ্ণকুমার

১। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (৪র্থ সং ১৯৩৫ (১৩৪২). পৃঃ ৩৪১।

মিত্রের বাড়ীতে গিয়া সঞ্জীবনীর জন্য কিছু কিছু dictate করি, কুমুদিনী লেখেন।'

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও শিবনাথের যত্নের ত্রুটি ছিল না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছে, 'আজকালকার যুবকেরা জানে না যে, 'বঙ্গবাসী'র গঠনে তিনি (শিবনাথ) কতখানি বুকের রক্ত ঢালিয়াছিলেন।'[১] এই প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র স্বীকার করেছেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের প্রেরণা শিবনাথই তাঁকে প্রথম দিয়েছিলেন।'

সম্পাদকের আরও একটি দায়িত্ব শিবনাথ সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন; সেটি হল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় ও স্বসম্পাদিত পত্রে বিনা পারিশ্রমিকে বিপুল সংখ্যায় রচনা প্রকাশ। সাংবাদিকের ভাষায়, 'আজকালকার সম্পাদক ও লেখকগণের নিকট ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা লেখক বিনা পারিশ্রমিকে এতগুলি সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে এত প্রবন্ধ দিতে পারিয়াছেন।'[২] আসলে সাংবাদিকের সত্য-নিষ্ঠা ও নিস্পৃহতা এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৬, স্থগিত নবম অধিবেশন, পৃঃ ৬৮-৭২।

২। সাংবাদিক সুধীরকুমার লাহিড়ীর এই উক্তি জীবনময় রায় কর্তৃক উদ্ধৃত, দ্রঃ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৪, 'শিবনাথ জন্মশতবার্ষিকী' নামক প্রবন্ধ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপ্রকাশিত রচনাবলী

কোন লেখকের অপ্রকাশিত রচনাবলীর আবিষ্কার সেই সেই লেখকের জীবন, সাহিত্যিক প্রতিভা ও সাহিত্যমূল্য বিচারে প্রভূত সহায়তা ক'রে থাকে। আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর তিন প্রকারের অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান পেয়েছি—কবিতা, কুলপঞ্জিকা এবং ব্যক্তিগত ডায়েরী বা দিনলিপি।

শিবনাথের স্বহস্ত-লিখিত[১] কবিতার যে খাতাখানি[২] আমরা পেয়েছি, তা আদ্যন্ত খণ্ডিত। ফলে তার প্রথম ও শেষ দিকের বিলুপ্ত অংশে কোন কবিতা ছিল কিনা তা বলা কঠিন। তাছাড়া, খাতাটিতে কোন পৃষ্ঠাঙ্ক নেই বলে ভিতরের কোন পাতা কবিতাশুদ্ধ হারিয়ে গেছে কিনা, তা ধরা যাচ্ছে না। খাতাটি খুবই জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। এই খাতাখানিতে অনেকগুলি কবিতা রয়েছে। কিন্তু সেগুলি যে সবই অপ্রকাশিত এমন দাবী আমি করি না। কারণ কয়েকটি কবিতার উপরে শিবনাথ selected ও held back এই শব্দ দুটি লিখে রেখেছেন। এ থেকে অনুমান করি, শিবনাথ হয়ত selected চিহ্নিত কবিতাগুলি কোথাও প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিংবা সেই কবিতাগুলি নিয়ে 'পুষ্পমালা' বা 'পুষ্পাঞ্জলি'র মত আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর দিল। প্রথম প্রকারের অনুমানের কারণ এই যে, এই selected লেখা কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩] একটি কবিতা সম্পর্কে শিবনাথের পার্শ্ব-মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—'পূজাবন্ধু কাগজে দিলাম।' পূজাবন্ধু বলতে সম্ভবতঃ তিনি 'ধর্মবন্ধু' কাগজের কথা বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকার অনুমানের কারণ এই যে, অপ্রকাশিত ডায়েরীতে[৪] শিবনাথ 'প্রসূন প্রক্ষেপ' নামে আরও একটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আর held back চিহ্নিত কবিতাগুলিকে তিনি হয়ত সংশোধন না করে প্রকাশ

১। একটি কবিতা তাঁর স্বহস্ত-লিখিত নয়।

২। শিবনাথের পৌত্র শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য আমাকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

৩। যথা 'সংসার সরসীজলে' কবিতাটি 'সন্দেশ', কার্তিক ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

৪। অপ্রক.শিত ডায়েরীর তারিখ ১১.৮.১৯০১।

করতে চান নি। সে যাই হোক্, খাতাভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যে যে কয়টি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানতে পেরেছি, তা বাদ দিলে আরও প্রায় পৌনে একশতটি কবিতা থাকে। সেই কবিতাগুলির মধ্যে কোন কোনটি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, তা বলা দুঃসাধ্য। কারণ তৎকালীন সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি মোটেই সুলভ্য নয়। অবলাবান্ধব, আলোচনা, ভারত শ্রমজীবী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকা সমূহের ফাইল অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নি। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনাগুলি ব্যতীত আরও বহু রচনা বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে আছে। আমরা সাধ্যমতো সেগুলি উদ্ধার করে বর্তমান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছি।

আদ্যন্ত খণ্ডিত এই খাতাটির রচনাকর্ম কোন তারিখ থেকে আরব্ধ হয়েছিল, তা জানার উপায় নেই। তবে খাতাটি থেকে যে কবিতাগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে, তাতে রচনার তারিখ হচ্ছে ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯১৩ (২৫এ এপ্রিল) পর্যন্ত। এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে বলেই শিবনাথের লেখা শেষ কবিতা কোনটি তা জানতে পারা গেছে। সেটি হচ্ছে ২৫.৪.১৯১৩-তে লিখিত 'গাড়ির বলদ' শীর্ষক কবিতাটি[১]। আমরা এই দীর্ঘ কবিতাটির প্রথম স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি।

গাড়ির বলদ

'৭৮ ল্যান্সডাউন রোড, বালিগঞ্জ কলিকাতা ২৫-এ এপ্রেল ১৯১৩' তারিখে রচিত।

গাড়িতে বলদ বাঁধা মুখে তার ঠুলি,
লাগাম চাবুক পিছে চালকের বুলি ;
একি দুঃখ হায় হায়,
তবু আশে পাশে চায়,
তৃণ গুল্ম খেতে চায় তবু মুখ তুলি ;
দাঁড়ায় পথের পাশে নিজ কাজ ভুলি। ইত্যাদি।

১। শিবনাথ-কন্যা হেমলতা দেবী তাঁর শিবনাথ-জীবনী গ্রন্থে 'ভুলচুক দুষ্প্রবৃত্তি' শীর্ষক কবিতাটিকে শিবনাথের রচিত শেষ কবিতা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি ২৩.৩.১৯১৩ সালে লেখা।

খাতাভুক্ত সমস্ত কবিতা এখানে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আর সে প্রয়োজনও অনুভব করি না। কারণ কবিতাগুলিতে শিবনাথের কবিজীবনের নূতন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি না। অপ্রকাশিত কবিতাগুলির প্রায় সবই তাঁর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে দেশপ্রীতিমূলক, আখ্যানমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক, শিশুপাঠ্য ইত্যাদি কবিতারও সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু এগুলিতে কোন নূতন কথা নেই। যে কবিতাগুলি অন্যান্য কারণে উল্লেখযোগ্য, আমরা সেগুলিরই মাত্র এখানে আলোচনা করছি।

১॥ 'কটক তুলসীপুর, কুমারিকা কুঠীতে ১৯১৩ সালের ১লা মার্চ দিবসে লিখিত' একটি আখ্যানমূলক কবিতা শিবনাথের এই খাতাতে থাকলেও শিবনাথ নিজের হাতে এই কবিতাটি খাতায় লেখেন নি। কারণ হস্তলিপি পৃথক ধরণের। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখার প্রয়োজন যে, কোন কোন কবিতা খাতাটিতেই প্রথম লেখা হয়েছে, আবার কোন কোনটি অন্য পাণ্ডুলিপি থেকে এই খাতায় নকল করে নেওয়া হয়েছে। একটি কবিতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্যে লিখেছেন, 'বিগত বৎসর অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে এপ্রেল মাসে যখন Mrs. Rai-কে লইয়া আমর্গাও নামক স্থানে বাস করি, তখন কবিতাটির কিয়দংশ পেনসিলে একখানি কাগজে লিখিয়া রাখি। এ বৎসর কলিকাতাতে তাহা সমাপ্ত করি। অদ্য এই পুস্তকে নকল করিলাম। কলিকাতা। ২০ মে ১৮৯৯।' আবার এই কবিতাটিরই লেখার ইতিহাস অন্যত্র উল্লিখিত রয়েছে এইভাবে—'জীবনের অবশিষ্ট কাল কিরূপে লোকের স্তুতি নিন্দার প্রতি উদাসীন হইয়া ঈশ্বরচরণে আপনাকে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে নিম্নলিখিত কবিতাটির ভাব মনে আসিল।'[১]

২॥ '৭৮ ল্যান্সডাউন রোড্, বালিগঞ্জ'—এই ঠিকানায় শিবনাথ যখন বাস করছিলেন, তখন ১৮ই এপ্রিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম 'তুমি ডেকেছ প্রভু তুমি ত এসেছ' ইত্যাদি শীর্ষক কবিতাটি লেখেন। কিন্তু সেই প্রাথমিক খসড়া তাঁর পছন্দ হয় নি বলে ২৫.৪.১৯১৩ তারিখে কবিতাটির পরিমার্জিত রূপ দেন। একই বক্তব্যের উপর একাধিক কবিতা রচনা নিঃসন্দেহে লেখকের কাব্যরুচি এবং রচনার উৎকর্ষানুৎকর্ষ বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করে। এমন আরও কয়েকটি কবিতা এতে আছে।

১। অপ্রকাশিত ডায়েরী, তারিখ ১.৩.১৯১৩।

৩॥ কোন কবিতা পাঠের পূর্বে যদি কবিতা রচনার ইতিহাসটুকু জানতে পারা যায়, তাহলে কবিতাটি বোঝার ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়। এই পাণ্ডুলিপিটি থেকে আমরা শিবনাথের কয়েকটি কবিতা রচনার-ইতিহাস জানতে পেরেছি।

(ক) চন্দননগরে বাসকালীন ৯.১.১৯০০ তারিখে 'তোমারে দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছি' শীর্ষক কবিতাটি রচনার ইতিহাস শিবনাথ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, 'গতকল্য কলিকাতা হইতে চন্দননগর আসিবার সময় শিয়ালদহ Lady Elliot Hostel-এ লাবণ্যপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। তিনি Unitarian দিগের প্রকাশিত Helper নামক মাসিক পত্রিকা হইতে Spirit of God বিষয়ে একটী সুন্দর প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম তাঁহারা যথার্থ প্রেমিক যাঁহারা ঈশ্বরকে বলিতে পারে, 'এ জীবনে যাহা কিছু দুঃখ পেয়েছি যা কিছু তিক্ততা সঞ্চয় করেছি সাস্তে তোমাকে দেখে ভুলে গিয়েছি।' তিনি এই কথার পোষকতা করিয়া চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে কোন কোন অংশ মুখস্থ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তৎপরে চন্দননগরে চলিয়া আসার পরও ঐ কথোপকথনটা মনে ঘুরিতে লাগিল। অদ্য নিশাশেষে মনে মনে কয়েক পংক্তি রচনা করিলাম, তৎপরে বর্তমান পংক্তিগুলি লিখিতেছি।'

(খ) আরেকটি কবিতা রচনার ইতিহাস হচ্ছে '১৮৮৯ সালে আমাদের আশ্রয়ে পালিতা পরলোকগতা সরলা সেনকে একখানি নোট্‌বুক উপহার দিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি কবিতা লিখিয়া দিয়াছিলাম।···অদ্য নকল করা গেল—বালিগঞ্জ ২৬ জুন ১৯০৩।'

(গ) ১৯০৬ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে শিবনাথের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনী মারা যান। সেই ঘটনায় কাতর হয়ে শিবনাথ যে কবিতাটি লেখেন, তার ভূমিকায় আছে '১৬ই নভেম্বর কলিকাতা পৌঁছিয়াছি, পৌঁছিয়া জানিলাম সুহাসিনী মারা গিয়াছে। হঠাৎ এ সংবাদে প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। পরেই মনে হইল একজন প্রেমময় পুরুষ আছেন, এ জীবন তাঁহারই হাতে। তদবধি এ কবিতাটি মনে ঘুরিতেছে, আজ লিখিয়া রাখিতেছি।

মন তুমি ইহা কেন দেখ না ?
যদিও বা দেখ তবে কেন রাখ না ?

জগতে জাগিছে প্রেম
জগতে জাগিছে ক্ষেম
সেই প্রেমে প্রেম দিয়ে ক্ষেম কেন চাখ না ?

বালিগঞ্জ, ২৯ নভেম্বর ১৯০৪।'

এই প্রসঙ্গে কন্যা সরোজিনীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে শিবনাথ 'নবশোক'[১] নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা স্মর্তব্য। সন্তানদের প্রতি সহৃদয় পিতার স্নেহ, সন্তান বিয়োগে সেই পিতার অন্তর্বেদনা এবং ঈশ্বর-নির্ভরতার ফলে সেই অন্তর্বেদনার দীপ্তিলাভ, এই জাতীয় কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

৪॥ একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদের উল্লেখ করছি। শিবনাথ এই অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Mrs. Rai-এর মুখে শুনি ১৮৭৮ সালে আমি যখন প্রথম আগরাতে গিয়া তাঁদের ভবনে অতিথি হই তখন নাকি শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে একটী ইংরেজী কবিতা দেখাইয়াছিলেন। ঐ কবিতা দেখিয়া···আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তৎপরে তাহার ভাব···কয়েক পংক্তিতে প্রকাশ করিয়া···ছিলাম।' কবিতাটি নিম্নরূপ :

রমণীয় ··তন্ত্রী সুকোমল তারে
চতুর বাদক বিনা কে বাজাতে পারে ?
পড়িলে মূর্খের হাতে সে বীণা সুন্দর
টানে না অমিয় সুধা মধুর সুস্বর।

চন্দননগর ৯ই জানুয়ারী ১৯০০।[২]

৫॥ শিমলা শৈলে রচিত ৪ঠা অক্টোবর ১৯০৪ তারিখে লিখিত 'পাহাড়ের পাখীদের প্রতি' নামক কবিতাটির সঙ্গে 'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের 'পাখী' কবিতাটি তুলনীয়। অনন্ত আকাশের বুকে উড্ডীয়মান পাখী শিবনাথকে গভীরভাবে আকর্ষণ করত। এ প্রসঙ্গে বলা ভাল যে, পাণ্ডুলিপিতে উদ্ধৃত অধিকাংশ কবিতাই শিমলা শৈল, চন্দননগর গঙ্গাতীর,

১। দ্রঃ, পুষ্পাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ।

২। R. W. Emerson-এর লিখিত Spiritual Laws প্রবন্ধ পাঠের পর শিবনাথ 'ইচ্ছার স্রোত' নামে যে কবিতাটি নদীতীরে বসে লিখেছিলেন, সেটি শিবনাথের মৃত্যুর বহুদিন পর 'আশ্বিন ১৩৬১' সংখ্যায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে।

পুরীর সমুদ্রতীর প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশে রচিত। এ থেকে বেশ বোঝা যায়, প্রকৃতির সাহচর্য শিবনাথের অন্তরে কবিত্বশক্তি উদ্বোধন করত।

পাণ্ডুলিপি ব্যতীত আরও একটি শিশুপাঠ্য অপ্রকাশিত কবিতার আমরা সন্ধান পেয়েছি। শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মীরা সান্যাল (শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের পত্নী) যখন ৬।৭ বছরের মেয়ে ছিলেন, সেই সময় সর্দি-কাশি থেকে সদ্য-আরোগ্যমুক্ত এই নাতনির চিঠির উত্তরে শিবনাথ শিশুচিত্তনন্দন একটি কবিতার মাধ্যমে পত্র লিখেছিলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ :

শুন মীরাবাই, ওগো শুন মীরাবাই
কি চিঠি লিখেছ তুমি বলিহারি যাই।
কাশি সেরে খুশী আছ শুনে সুখী বড়,
সুখে থাক খেলা কর মন দিয়া পড।
মীরা হবে ভাল মেয়ে তাতে ভুল নাই,
ঈশ্বরচরণে আমি এই শুধু চাই।
ইতি তোমার দাদামশাই।[১]

—ছন্দের খাতিরে এখানে শিবনাথ 'দাদামশায়' নন, 'দাদামশাই হয়ে গেছেন। হয়ত অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এমন বহু অপ্রকাশিত কবিতা রয়ে গেছে।

কুলপঞ্জিকাটিকে অপ্রকাশিত বললে ভুল হবে, বরং বলা ভাল 'অংশত প্রকাশিত'। কারণ হেমলতা দেবী 'শিবনাথ-জীবনী' গ্রন্থটিতে কুলপঞ্জিকার 'বংশলতিকা'টিকে ব্যবহার করেছেন। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় শিবনাথের 'আত্মচরিতে'র দ্বিতীয় (১৯২০) ও তৃতীয় সংস্করণ (১৯৪০) সম্পাদনাকালে কুলপঞ্জিকাটি থেকে তিনটি মন্তব্য 'আত্মচরিতে'র পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।[৩] এ দুটি ছাড়া কুলপঞ্জিকার অন্যত্র ব্যবহার লক্ষ্য করি না।

১। কবিতাটি মীরা দেবীর সৌজন্যে আমি পেয়েছি।
২। কুলপঞ্জিকাটি আমি শিবনাথের পৌত্র শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে পেয়েছি
৩। দ্রঃ, আত্মচরিত (সিগনেট সংস্করণ ১৩৫৯) পৃঃ ১।

'আত্মচরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কুলপঞ্জিকাটি থেকে উদাহরণ দিয়ে এটি যে আত্মচরিত রচনার প্রথম উদ্যোগ ছিল, সেকথার উল্লেখ করেছি। এখানেই কুলপঞ্জিকাটির সাহিত্যমূল্য। আবার বংশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া শিবনাথের মত ব্যক্তির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল, কারণ তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র লেখক।

কুলপঞ্জিকাটির আরম্ভ এইরূপ :

'ওঁ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
কুল-পঞ্জিকা।
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ ২৯ নবেম্বর
শনিবার হইতে
আরব্ধ'

গ্রন্থ সূচনা নিম্নরূপ :

'বালিগঞ্জ ২৯ নবেম্বর ১৯০২। আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্তবাবু মধুসূদন রাও মহাশয় গত ২৭ নবেম্বর বৃহস্পতিবার তারে সংবাদ দিয়াছেন যে সেই দিন মধ্যাহ্ন ১২টা ৫৮ মিনিটের সময় আমার পুত্র প্রিয়নাথের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বধূমাতা শ্রীমতী অবন্তী দেবী প্রসব হইবার জন্য পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে নিরাপদে পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছেন। আমার আদেশক্রমে প্রিয়নাথ এই খাতাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন; ইহাতে আমাদের বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে।'

এরপর শিবনাথ তাঁর পূর্বপুরুষ, জন্মস্থান ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। বংশপরিচয় ব্যতিরেকে নিজের বিবাহ, শিক্ষা ও শিক্ষকতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে বলেছেন, '১৮৬৯ সালে আমি স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস ১৮৬৫ সালেই জন্মিয়াছিল। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই আমার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছা জন্মে। ঐ কার্যে এখনও আছি।' ১৯০১ সালের ৩রা জুন দিবসে প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যুর উল্লেখ করে শিবনাথ কুলপঞ্জিকার প্রথম দিনের লেখা শেষ করেছেন।

২৩-এ আগষ্ট ১৯০৩, ৬ই ভাদ্র ১৩১০ তারিখে লেখা দ্বিতীয় দিনের

দিনলিপিতে শিবনাথ একমাত্র পৌত্র অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামকরণ-অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন।

তৃতীয় দিনের (২৭এ নভেম্বর, ১৯০৬) লেখাতে 'অমরনাথের জন্মদিনের বিশেষ উপাসনা' ও তাঁর বিদ্যারম্ভের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। মীরা দেবীর বিদ্যারম্ভের কথাও এই প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে।

সবশেষে (১লা ডিসেম্বর ১৯০৬) শিবনাথ মাত্র চার বছরের পৌত্র 'অমরনাথের বিকাশোন্মুখ চরিত্রের যে যে লক্ষণের আভাস পাওয়া যাইতেছে তাহার কিছু কিছু' লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এখানেই শিবনাথের স্বহস্তে লেখা কুলপঞ্জিকার অংশটুকু সমাপ্ত হয়েছে।

। ডায়েরী ।[১]

শিবনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরী[২] শিবনাথের দ্বিতীয় আত্মচরিত। 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' যখন মুদ্রিত হয়, তখন শিবনাথের বিচিত্র কর্মধারা ও সাহিত্যিক চিন্তার একাংশের সঙ্গে অনুরাগীগণ পরিচিত হবার অসামান্য সুযোগলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'তে ইংলণ্ডবাসকালে শিবনাথের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রধানতঃ লিপিবদ্ধ থাকায় তা তার সমগ্র জীবনের উপর তেমন আলোকপাত করে না। আমরা এখানে যে অপ্রকাশিত ডায়েরীটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি, তা এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। এর মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্য আছে, তা শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-কাহিনীকে বহুলাংশে আলোকোজ্জ্বল ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। শিবনাথ ব্রাহ্মপ্রচারক, শিবনাথ সাধক, আবার তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিক, দায়িত্বশীল স্বামী, স্নেহকাতর পুত্র, অসীম বন্ধুবৎসল, নারীজাতির পৃষ্ঠপোষক, শ্রদ্ধাবান্ পাঠক, প্রকৃতি-প্রেমিক এবং সর্বোপরি প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক—ডায়েরীর বহু পৃষ্ঠাতেই শিবনাথের এই বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় আছে।

১। ডায়েরীগুলি আমি ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্রের সৌজন্যে পেয়েছি।

২। আমরা ডায়েরীর যে খাতাগুলি পেয়েছি, সেগুলিই যে সব, এমন নয়। ১৮৭৮ সাল থেকে শিবনাথ ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেন—একথা হেমলতা দেবী বলেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে ডায়েরীর যে সব অংশ ব্যবহার করেছেন, আমরা তার আলোচনা করছি না। ১৮৮৪ সালের ৩রা মার্চ থেকে ২৪এ এপ্রিল ১৯১৪ পর্যন্ত ডায়েরী আমরা ব্যবহার করছি। বিচ্ছিন্নভাবে রাখা ৫৮২ দিনের দিনলিপি এখানে আলোচিত হচ্ছে।

শিবনাথের এই বৃহৎ ডায়েরী থেকে আমরা প্রয়োজন মত অংশ উদ্ধার করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি। এতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হবে যে ডায়েরীটি তাঁর 'আত্মচরিতে'র পরিপূরক।

এক। সাহিত্য সম্পর্কে শিবনাথের ধারণা ও নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়ন সম্পর্কিত অংশ বিশেষ :—

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে শিবনাথের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটলেও তাঁর মধ্যে একটি কবি প্রাণ মাঝে মাঝে প্রধান হয়ে উঠত। শিবনাথ নিজেও একথা বহুস্থানে বলেছেন[১]। ডায়েরীর একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'এক সময়ে আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম, প্রকৃতি ও মানুষকে কবির চক্ষে দেখিতাম। কালক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ, ছাড়া-ছাড়ি, ছুটাছুটি, খাটুনি প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া আমার কবিত্ব আর স্ফূর্তি পাইবার সময় পাইল না। এখন সময় আসিয়াছে—যখন একান্তে ও প্রকৃতির বন্য নিকেতনে বসিয়া আবার কবিত্বের স্ফূর্তির দিকে মন দিতে হইবে।'—২৩-৯-১৯১১। প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিবনাথের কবি-প্রতিভা সমধিক স্ফূর্তিলাভ করত। ইডেন গার্ডেনে ভ্রমণরত অবস্থায় 'প্রকৃতির শোভা দেখিয়া এক অপূর্ব ভাব মনে' আসায় বহু কবিতার জন্ম হয়েছে। এমন একটি কবিতার অংশবিশেষ :

সারা নিশি ছিলা পড়ি প্রকৃতি সুন্দরী,
মান ভরে নীলাম্বরে আপনা আবরি ;
উষাগমে প্রেম কর প্রসারি তপন,
ঘোমটা খুলিয়া মুখ করে দরশন।
এই প্রেমলীলা দেখে যেন পাখীকুল,
কোলাহল করে উঠে আনন্দে আকুল।—৫.১.১৯১০।

এই ইডেন গার্ডেনে লেখা আরও একটি কবিতা—

হিম জলে করি স্নান স্নিগ্ধ ধ্যানরূপ,
তরুলতা ধরিয়াছে শোভা অপরূপ ;
হিম-স্নাত দুর্বাদল প্রাণ মন হরে ;
ধরা যেন প্রেমানন্দে পুলকে শিহরে।—৩০.১.১৯১০।

১। 'আমি…ভাবুক ও কবি হইবার জন্য জন্মিয়াছি। কিন্তু কবিত্বও বুঝি অনভ্যাসবশতঃ মারা যায়।'—অপ্রকাশিত ডায়েরী—৬-৫-১৮৮৪।

কবিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাতে তাঁর প্রচুর আগ্রহ ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। শিবনাথ একদিনের কথা এইভাবে লিখেছেন, 'রামানন্দের সহিত affections সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমি বলিলাম modern age-এর একটা লক্ষণ depreciation of the affections.—তিনি বলিলেন এই জন্যই poetry ও Literature ভাল হইতেছে না। আমি বলিলাম imagination ও question সাহিত্যের প্রাণ; তাহার অবনতিতে সাহিত্যের অবনতি অনিবার্য।' —২৯.১০.১৯০১।

গদ্যরচনার নিজস্ব ভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর মতামত—'ওজস্বী ভাষাতে লেখা আমার স্বভাব নয়। কেশববাবু বলিতেন—যা করে বা লেখে সকলি simple হইয়া যায়, ওর প্রকৃতিতে simplicity প্রধান গুণ।'

শিবনাথ শেষ বয়সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে তাঁর একমাত্র ইচ্ছা হত সাহিত্য রচনায় তিনি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবেন। ডায়েরীতে লক্ষ্য করেছি তিনি বারবার 'সাহিত্য রচনাতে ও জ্ঞানানুশীলনে' (১৬.১০.১৯০১) নিজেকে নিযুক্ত করার সংকল্প করেছেন। এ থেকে তাঁর অন্তরে সাহিত্যিক তাগিদ বা literary urge কতখানি ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অবশ্য এর মধ্যে ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তক রচনাতেই সমধিক আগ্রহ দেখা যেত।

দুই ॥ কয়েকটি গ্রন্থ রচনার ইতিহাস ও পরিকল্পনা ॥

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং 'আত্মচরিত' গ্রন্থদ্বয় আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই অপ্রকাশিত ডায়েরীর কোন কোন অংশ উদ্ধার করে দেখিয়েছি। 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের বহু অংশের সমর্থনেও এই ডায়েরীকে কাজে লাগিয়েছি। সেগুলির পুনরুল্লেখ না করে অপর কয়েকটি গ্রন্থের কথা বলছি :—

(ক) প্রবন্ধাবলি ॥

'প্রবন্ধাবলি' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি পূর্বে প্রবাসী, প্রদীপ, ভারতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে শিবনাথের 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শিবনাথ লিখেছেন যে এই গ্রন্থটি সমাপ্ত

হওয়ামাত্র 'অমনি প্রদীপ ও প্রবাসীতে আমার যে সকল প্রবন্ধ অগ্রে বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়া বসিলাম, সে সমুদায় হইতে বাছিয়া একখানা বই করিতে হইবে।' (১৪.১০.১৯০৩)। নভেম্বর মাসের মধ্যে এই বইখানি মুদ্রিত করার পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়। '... যে প্রবন্ধাবলি নামক পুস্তক ছাপিব মনে করিতেছি তাহার কাপি arrange করিতে বসিলাম। এমন সময়ে শশিভূষণ চক্রবর্তী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ গ্রন্থ ছাপা বিষয়ে কথা হইয়া তাঁহাকে কাপি দেওয়া গেল।' প্রথম খণ্ড প্রবন্ধাবলি প্রকাশিত হয়ে গেলে গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশ করার ইচ্ছাও তিনি করেছিলেন (যথাক্রমে ১১.১০.১৯০৮ ও ১৯.৮.১৯১১ তারিখে)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা কার্যে পরিণত হয় নি।

(খ) 'বিধবার ছেলে' ব্যতীত আরও একখানি উপন্যাস রচনার ইচ্ছা শিবনাথের ছিল (১১.১০.১৯০৮)। টলষ্টয়ের জীবনী পাঠের পর তিনি দেশের যুবকদের 'influence' করার জন্য এই উপন্যাস রচনার ইচ্ছা তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। (২১.৫.১৯০৯)।

(গ) ডায়েরী পাঠে জানতে পারি আরও চারটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ইচ্ছা শিবনাথের ছিল। (১) এর মধ্যে একটি কবিতাগ্রন্থ—""প্রসূন প্রক্ষেপ" নাম দিয়া আমার কবিতাগুলি পুনঃমুদ্রিত করিতে হইবে ও নূতন কবিতাগুলি ছাপাইতে হইবে" (১৯.৮.১৯১১)। শিবনাথের মৃত্যুর পর কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'শিবনির্মাল্য' নামে যে কাব্যসংকলন প্রকাশ করেছিলেন (১৯২২), শিবনাথের এই ইচ্ছার কথা জানা থাকলে হয়ত তিনি তাঁর সংকলনের নাম দিতেন 'প্রসূন প্রক্ষেপ'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শিবনাথ নিজের ছোট কবিতাগুলিকে ফুলের মতই পবিত্র ও সুরভিত মনে করতেন বলেই কবিতা-সংকলনগুলির নামের পূর্বে 'পুষ্প' বা 'প্রসূন' নাম দিতে চেয়েছিলেন। (২)-(৩) "'ধর্মসাধন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছাও তাঁর মনে হয়েছিল ; এবং 'Men I Have Seen' বলিয়া ইংরাজী পুস্তক ও 'মনের মানুষ'" নামে তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল[১] (২০.৯.১৯১১)। (৪) শিবনাথের অধ্যাত্মজীবনে

১। 'Men I Have Seen' গ্রন্থের অনুবাদিকা মায়া রায় গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'মহান্ পুরুষের সান্নিধ্যে'। শিবনাথ এর নামকরণ করতে চেয়েছিলেন 'মনের মানুষ'।

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সে কারণে তিনি বাংলা ভাষায় 'নবভক্তিধর্ম' নামে একটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন (২১.৮.১৯১০)। বলা বাহুল্য, 'প্রবন্ধাবলি' ও 'বিধবার ছেলে' ব্যতীত অন্যগুলি প্রকাশিত হয় নি—প্রধানতঃ আর্থিক কারণে।

তিন ॥ রচনার পূর্ব প্রস্তুতি ॥

কোন ইংরেজি প্রবন্ধ রচনার পূর্বে শিবনাথ কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতেন, ডায়েরীতে তার উল্লেখ আছে। সে কারণে Hindusthan Review পত্রিকার জন্য রামমোহন রায়ের জীবনী লেখার পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'যখনই আমার কিছু ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে হয় তৎপূর্বে বা সেই সময়ে Thackerayর কোন গ্রন্থ পড়ি। Thackerayর ইংরাজীটা আমার বড় ভাল লাগে, প্রাণটা ভাল ইংরাজীতে অভ্যস্ত করিবার জন্য তাঁর লেখা পড়ি।···বিশেষতঃ Thackerayর novelগুলি আমার বড় মিষ্ট লাগে।··· অবশেষে Rammohan Royএর জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করি' (১.৯.১৯০৩)। ১৭.১৯০৯ তারিখের ডায়েরীতেও এই একই প্রকারের মন্তব্য পাই।

অন্যদিকে ইংরেজি-বাংলা বহু গ্রন্থ পাঠের পর তিনি বাংলা লেখায় হাত দিতেন। তিনি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য 'চিন্তা সঞ্চরণ' নামক প্রবন্ধটি রচনার আগে 'Tod's History of Rajasthan' এবং Hunter's Rural Bengal পড়তে আরম্ভ করেন (১০.৮.১৯০৪)।

চার ॥ গ্রন্থকীট শিবনাথ ॥

শিবনাথ যে কত বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ পাঠ করতেন এবং পাঠ করে তাদের সমালোচনা করতেন, তার বিচিত্র পরিচয় তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরী থেকে পাওয়া যায়।

পাঁচ ॥ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য ॥

মিস্ সোফিয়া ডবসন্ কলেট সম্পাদিত ব্রাহ্ম ইয়ার বুকের খণ্ডগুলি নানা তথ্যের আকর বলে সম্মানিত হয়ে আসছে। মিস্ কলেটের সঙ্গে ইংলণ্ড বাসকালে শিবনাথের গভীর সৌহার্দ্য জন্মে এবং শিবনাথ তাঁকে 'কলেট দিদী'

বলে ডাকতেন। কিন্তু ১৮৮৮ সালের আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে কুমারী কলেটের পত্রালাপ চলছিল। সম্ভবতঃ ব্রাহ্ম ইয়ার বুক-এর ব্যাপারেই এই যোগাযোগ ঘটেছিল। ১৮৮৪ সালের গোড়ার দিকে মিস্ কলেট অসুস্থ হয়ে পড়লে ঠিক হয় যে, সে বছরের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে। শিবনাথ তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্বময় নেতা। সুতরাং সে বছরের বর্ষপঞ্জী সম্পাদনায় শিবনাথের ভূমিকাই ছিল প্রধান, এ কথা ভাবা অসমীচীন হবে না। শিবনাথ নিজেও লিখেছেন, 'আমি Retrospect ও কেশবচন্দ্র সেনের sketch লিখিব' ঠিক হয়েছিল (১৮.৫.১৮৮৪)।

এ ছাড়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা সম্পাদনে শিবনাথের সহযোগিতার কথা পত্রিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। অপ্রকাশিত ডায়েরী পাঠের পূর্বে এই তথ্যগুলি জানার উপায় ছিল না।

ছয়। গুরুবন্দনা॥

শিবনাথ-রচিত গুরুবন্দনা একটি বিখ্যাত প্রশস্তি কবিতা। সারা পৃথিবীর গুণীদের অনেকে শিবনাথের শ্রদ্ধা ও প্রণাম পেয়েছেন এই কবিতাটিতে। ১৭.২.১৯০৭ তারিখে এই গুরুবন্দনাটির রচনারম্ভ হয়। তারপর দীর্ঘ সাত বছর ধরে বন্দনাটিতে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে, তার বিস্তারিত ইতিহাস এই অপ্রকাশিত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই রূপ পরিবর্তনের একটি উদাহরণ উদ্ধার করছি। এথেকে গুরুবন্দনাটি যে নিছক নামোল্লেখ মাত্র ছিল না, তার মধ্যে বিচার ও শ্রদ্ধা উভয়ই বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ পাবো। রামমোহন রায়কে গুরুকীর্তনে স্থান দিয়ে শিবনাথ লিখেছেন, "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠশ্চ রামমোহন আত্মবান্। আত্মবান্ শব্দটি এইজন্য দিয়াছি যে self-respect ও dignity রাজার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। আত্মবান্—অর্থাৎ self-respect, self-control, self-help, serenity ও dignity বিশিষ্ট।"—(৮.১০.১৯০৭)।

সাত। মৃত্যু সম্পর্কে শিবনাথের উপলব্ধি॥

১৯০১ সালের ৩রা জুন শিবনাথের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীর মৃত্যু হয় । ইএ মৃত্যু শিবনাথকে অসহনীয় আঘাত দেয়। কারণ এর পর থেকেই

তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রায় দুই মাস হইল জানিতে পারা গিয়াছে যে আমার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছে।' স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অবনতি ঘটায় মৃত্যুর যে পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, সেকথার উল্লেখ করে শিবনাথ আরও লিখেছেন, 'বলিতে গেলে আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে। সেজন্য এই দৈনিক লিপি আরম্ভ করিতেছি।[১] ...সত্য সত্যই মৃত্যু আমার কেশে ধরিয়াছে। এখন প্রতিদিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া আমার ক্লেশ হইতেছে না। বরং একপ্রকার সন্তোষ ও শান্তি অনুভব করিতেছি।' (১৫.১০.১৯০১)।

অবশ্য মৃত্যুকে তিনি হাসিমুখে বরণ করার জন্য এর পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'মৃত্যু আমাদের শত্রু নহে, মৃত্যু বন্ধু, কারণ মৃত্যু ত্রিবিধ উপকার সাধন করে। প্রথমতঃ মৃত্যু আমাদের প্রণয়কে বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের হৃদয়কে উন্নত করে, দ্বিতীয় মৃত্যু আমাদিগকে সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া দেয়, তৃতীয়ত ঈশ্বরকে ও পরকালকে নিকটে আনিয়া দেয়'—(২৪.৪.১৮৮৪)। খণ্ডিত জীবন এইভাবে মৃত্যুর সন্নিধানে অখণ্ড ও পূর্ণ হয়ে ওঠে, শিবনাথের এই বিশ্বাস এখানে ফুটে উঠেছে।

আট॥ মাতা গোলকমণি দেবীর মৃত্যুতে শিবনাথের প্রতিক্রিয়া॥

১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে গোলকমণি দেবী সংকটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হন। শিবনাথ অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তাদি সংস্কারের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ আত্মীয়েরা স্পর্শ করতে চাইবেন না শুনে তিনি পুত্র প্রিয়নাথ মারফৎ 'মার প্রায়শ্চিত্ত দং ২০ টাকা' পাঠিয়েছিলেন। ১৩.৯.১৯০৮ তারিখে তিনি মাকে দেখতে যান, কিন্তু মায়ের মৃত্যু ঘটে। সে প্রসঙ্গে শিবনাথ লিখেছেন, 'আমার মাতার সংযম, স্বধর্ম-নিরতি, কঠিন

১। ১৮৮৫ সালের ১২ই ডিসেম্বরের বহুদিন পর ১৫.১০.১৯০১ তারিখ থেকে তিনি আবার ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য ইংলণ্ডে রাখা ডায়েরীর (প্রকাশিত) কথা আমরা জানি।

নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা এই কয়দিন মনে জাগিতেছে, তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন ও যাহা সহিয়াছেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। হায়! বাধ্য হইয়া এ জীবনে তাঁহাকে কি ক্লেশই দিতে হইয়াছে।' (১৯.৯.১৯০৮)। বেশ কয়েকদিন পর আবার লিখেছেন, 'আমার পরলোকগতা জননীকে যেন ভুলিতে পারিতেছি না। তিনি যেন সর্বদা আমার নিকটে রহিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে জিনিসের জন্য আমাকে এত ক্লেশ দিয়াছ তাহাতে বঞ্চিত থাকিও না।' (১২.১০.১৯০৮)।

এ সব ব্যতীত ধর্মজীবনের নানা প্রসঙ্গে ডায়েরীটি আকীর্ণ। এই ডায়েরীর সঙ্গে আরও একটি ডায়েরীর সন্ধান পেয়েছি। সেটিকে ডায়েরী না বলে বরং শিবনাথের ধর্মজীবনের কড়চা বলাই অধিকতর সঙ্গত। অপ্রকাশিত এই সাধন-ইতিবৃত্তটি ১৮৯১ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখে আরম্ভ হয়েছে। এর প্রথম পৃষ্ঠাটি এইরূপ :—

ওঁ শ্রীশ্রীজগদীশ্বরো জয়তি/পারিবারিক ধর্মসাধন/প্রতিদিন পারিবারিক/উপাসনাতে/বিবৃত/উপদেশ ও প্রার্থনাদি/সংগ্রহ/২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১/খ্রীষ্টাব্দ/মঙ্গলবার/হইতে/স্বাস্থ্যের উদ্দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের/মধুপুর ষ্টেশনে/বাসকালে/আরব্ধ'।

পরিশিষ্ট ॥ ক ॥

॥ ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥

॥ ১ ॥

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কর্মজীবন বিচিত্র ও বহুশাখাশ্রিত। এই কর্মধারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজকেই কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছে। শিবনাথ তাঁর 'আত্মচরিতে'র একস্থানে লিখেছেন,[১] 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।' অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য কাজের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতিকরণকেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে গণ্য করতেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শিবনাথ শাস্ত্রী দেবেন্দ্রনাথের আদি সমাজ ও কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—এই উভয় সমাজের সঙ্গেই এককালে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা কোন একটা ছিন্নমূল বা আকস্মিক ঘটনা নয়। সুতরাং কেবলমাত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথের কর্মপদ্ধতি আলোচনা করলে যে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি জড়িত ছিলেন, তার ইতিবৃত্তটুকু অনালোচিত থেকে যাবে। কাজেই আমরা প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটা খসড়া রচনা করে তার আলোকে শিবনাথের ধর্মকেন্দ্রিক কর্মজীবনের আলোচনা করছি।

॥ ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের প্রথমাংশ ॥

'…ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দু সমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দু সমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে।'[২] অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব হিন্দু সমাজে অনিবার্য হয়েছিল। রামমোহনের আবির্ভাবকালে হিন্দুসমাজ নবাগত মিশনারীদের বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপে এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হচ্ছিল।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫১।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতপথিক রামমোহন রায় (১৮৮১ শক), পৃঃ ১৩১-৩২।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রামমোহন এসে কলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন। কলকাতায় আসার পূর্বে রংপুরে থাকতে তিনি হিন্দুসমাজের কতকগুলি কুসংস্কারকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ভাবতে থাকেন। বাঙালীর চিত্ত তখনও পশ্চিমাগত আলোকে উদ্বোধিত হয়নি বটে, তবুও রামমোহন যে মানবিকতার যুগ আসছে তাকে বরণ করার জন্য, আধুনিক কালের নূতন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং বাস্তব-জীবনপ্রীতি তথা স্বাজাত্যবোধে সমাজকে উদ্দীপিত করার মানসে সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। এর প্রথম উদ্যোগ দেখা দিল তাঁর ধর্মসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগের মধ্যে। রামমোহন স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করেছিলেন, হিন্দু সমাজে যে ধর্মাচরণ চলেছে, তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ নেই। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নীচে মৃত্যু বরণ ইত্যাদি কুসংস্কার ও বাহ্যিক আচার, ধর্মের সঙ্গে 'has become fashionable'. পুরোহিতদের মধ্যেও তিনি সদাচার লক্ষ্য করলেন না—কারণ মুসলমান আমলে তাদের প্রতিপত্তি ও বৃত্তির হ্রাস ঘটেছে। তাছাড়া কৌলীন্যপ্রথা, বাইজীনাচ প্রভৃতি সামাজিক অনাচার ধীরে ধীরে সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল! তিব্বতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করে এবং উপনিষদাদি ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করে তাঁর স্পষ্টতঃই মনে হল, পৌত্তলিকতা এক অযৌক্তিক আচারমাত্র।

এই সময় বাংলা দেশে বেদান্তচর্চা ধীরে ধীরে মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এ ছাড়া ব্রহ্মসম্পর্কীয় আলোচনার জন্য তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করলেন। এই 'আত্মীয় সভা'তেই আসলে ব্রাহ্মসমাজের বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদকে প্রয়োগ করা। ঠাকুর পুতুলের দেশে প্রতিমাহীন পূজা প্রচার যেমন অভিনব ছিল, তেমনি এই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার স্বাভাবিকভাবেই সমাজের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে গভীর আঘাত হেনেছিল। এই ধর্ম বিচার ও প্রচারের অবাঞ্ছিত সংগ্রামে রামমোহন কেন নেমেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।[১]

১। 'My constant reflections on the inconvenient, or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatry, which, more

রামমোহনের চিত্ত ধর্মালোচনার জন্য ব্যাকুল হত বলে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে খ্রীষ্টীয় চার্চসমূহে যেতেন। একদিন চার্চের উপাসনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রামমোহনের দুই একেশ্বরবাদী বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাব করলেন যে, আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণের জন্য কেবল মিশনারীদের দ্বারস্থ না হয়ে নিজেদেরই একটা ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। 'এই মহৎ প্রস্তাবেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্র হইল।'[১] রামমোহন এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। ধর্মকে সকল সম্প্রদায়ের মিলনভূমি রূপে কল্পনার আদর্শকে রূপায়ণের জন্য এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত কল্পে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খ্রী:) তারিখে জোড়াসাঁকোর রামকমল বসুর বাড়ীর একাংশ মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ[২] স্থাপিত হল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের একটি ট্রাস্টডীড্ সম্পাদিত হল এবং এই বছরের ১১ই মাঘ দিবসে সমাজের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হল। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং মিশনারীরা এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে লাগলেন। নবনির্মিত গৃহে যে উপাসনা শুরু হল তা ছিল বিচিত্র। শূদ্রের সম্মুখে বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল বলে অন্য একটি কক্ষ থেকে তা পাঠ করা হত। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের একাসনে বসে উপাসনার এমন অনুষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আগে আর অনুষ্ঠিত হয় নি।

॥ আন্দোলনের দ্বিতীয়াংশ ॥

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ড যান এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাসেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাঁর অনুগামীদের

than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error; and by making them acquainted with devotion the unity and omnipresence of Nature's God.'

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্পাদকীয়, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

২। রামমোহন প্রবর্তিত সমাজের প্রকৃত নাম ব্রাহ্মসমাজ'। ব্রাহ্মসভা, ব্রহ্মসভা ইত্যাদি বহু নাম তদানীন্তন কালে প্রচারিত থাকলেও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রথম অনুষ্ঠানে একে ব্রাহ্মসমাজই বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য—দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, পৃঃ ৩১১-১৮।

কেউ ছিলেন না। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। ১৮৩৯ সালের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দশ বছর (১৮৩০-৩৯) ধরে সমাজের অবস্থা খুবই 'ম্লান' ছিল।

রামমোহনের ধ্যানধারণা ২২ বছরের যুবক দেবেন্দ্রনাথকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করে তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবিত করলেন। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ দেবেন্দ্রনাথ আরও ২০ জন সভ্য সমেত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (তৎকালীন প্রধান আচার্য) কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই সমাজের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হল। বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে কোথাও সত্যের দর্শন না পেয়ে তিনি 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কেই ঈশ্বরের 'পত্তনভূমি' বলে প্রচার করলেন। ব্রাহ্মধর্ম দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং ১৮৪৫ সালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা ৫০০তে উপনীত হল। আর ১৮৫৯ সালের মধ্যে এই ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৪। আরও একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে অবশ্য আলোচিতব্য। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র সরকার নামে এক যুবক সস্ত্রীক খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্তম্ভে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু নেতা রাধাকান্ত দেব ও ইয়ং নেতা রামগোপাল ঘোষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন। ফলে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপিত হল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।[১]

॥ আন্দোলনের তৃতীয়াংশ ॥

১৮৫৭ সালে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে বিশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সেইমত দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহর্ষি 'হৃদয়ের বড় কাছের' লোকটিকে পেলেন। আত্মশক্তি বলে কেশবচন্দ্র অনতিকালের মধ্যেই

১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, পৃঃ ৬৫।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা হয়ে পড়লেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে এক উন্নত স্থানে নীত করলেন। স্নেহ ও শ্রদ্ধার চিহ্ন স্বরূপ দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

কেশবচন্দ্র ছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই তাঁর মতপার্থক্য দেখা দিতে লাগল।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। প্রথমতঃ কেশবচন্দ্র চাইছিলেন সপ্তাহান্তে একবার মাত্র উপাসনার পরিবর্তে প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের অধিষ্টান প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, মহর্ষির নির্ভর ছিল কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র ধর্মচিন্তাকে বিশ্বের ধর্মচিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ, ট্রাস্টীর বয়ান বলে সমাজে উপাচার্যাদি নিয়োগের ব্যাপারে সর্বকর্তৃত্ব ছিল দেবেন্দ্রনাথের হাতে। এই অধিকার কেশবচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। তিনি একটি প্রতিনিধি সভার হাতে এই ভার দিতে চাইলেন।

এছাড়া কেশবচন্দ্র জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সমাজসংস্কারে হাত দিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ যুগের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে ১৩.৪.১৮৬২ তারিখে অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে উপাচার্যের বেদীতে বসালেন। শুধু তাই নয়, কেশবচন্দ্রের দাবী মত নিয়ম করা হল যে, বেদীতে উপবেশনকালে সূত্রধারী ব্রাহ্মণদের উপবীত ত্যাগ করে বসতে হবে। দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

কেশবচন্দ্র হিন্দু সমাজের উপর দ্বিতীয় আঘাত হানতে চাইলেন অসবর্ণ বিবাহ প্রচার দ্বারা। এবারে দেবেন্দ্রনাথের সহনশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। তিনি ট্রাস্টীর অধিকার বলে পুনরায় সসূত্র ব্রাহ্মণদের বেদীতে বসালেন। হিন্দু ধর্মের আদর্শকে তিনি কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন হতে দিতে চাইলেন না। কারণ কেশবচন্দ্রের মধ্যে তিনি একটা খ্রীস্টভাব লক্ষ্য করেছিলেন।

মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ সংশ্রব রাখা আর উন্নতিশীল দলের পক্ষে সম্ভব হল না। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে লিখলেন, 'আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।' কেশবচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখলেন, 'যতদিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য।' এবং শেষ পর্যন্ত

দেবেন্দ্রনাথের কাছে 'পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে পরামর্শ' চেয়ে পাঠালেন। ফলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের' নাম হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। এই ঘটনার পর থেকে দেবেন্দ্রনাথও নিজেকে অনেকখানি সংযত করে ব্যক্তিগত উপাসনায় গভীরভাবে মগ্ন হলেন। 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' অনেকাংশ মন্থরগতি সম্পন্ন হল।

এই সময়কালের মধ্যে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের' পরিচালকবৃন্দের মধ্যে আমরা রাজনারায়ণ বসু (দীক্ষা—১৮৪৬ খ্রীঃ), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে রবীন্দ্রনাথকে পাই। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্যত্বে ও শম্ভুনাথ গড়গড়ির উপাচার্যত্বে 'আদি সমাজের' কার্য বাহিত হতে লেগেছিল।

॥ আন্দোলনের চতুর্থাংশ ॥

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও শিবনাথ লিখেছেন যে তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' অপেক্ষা 'আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অধিক আকর্ষণ বোধ করতেন। এর তিনটি কারণ ছিল। (এক) শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে' কেশবচন্দ্রের গোষ্ঠীকে বিদ্রূপ করে 'কৈশব দল' বলে অভিহিত করতেন; (দুই) দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে শিবনাথকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন; এবং (তিন) শিবনাথের নিকট আত্মীয় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

কিন্তু ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) তারিখে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের দিনে শিবনাথ কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও এর পূর্বে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে যে নগর-কীর্তন বের হয়, তখনই শিবনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আকর্ষণে তিনি কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত হন। শিবনাথ লিখেছেন, 'সেই আমাকে উন্নতিশীলদলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন।' শিবনাথ কিভাবে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেকথা আমরা পূর্বেই আলোচনা

করেছি। এবং সেই প্রসঙ্গে শিবনাথকে যে কি নিদারুণ নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল, তারও উল্লেখ করেছি।

কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভার' মাধ্যমে যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করলেন, শিবনাথ তাতে একেবারে আত্মসমর্পণ করলেন।

১৮৭২ সাল পর্যন্ত শিবনাথ কেশবচন্দ্রকে নানাভাবে সমর্থন করে এসেছেন। মুঙ্গেরের নরপূজার আন্দোলনে তিনি কেশবচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৮৭২ সালের তিন আইন (Act III of 1872) নিয়ে হিন্দু, ব্রাহ্ম—সকল সমাজ যখন আলোড়িত, রাজনারায়ণ বসু যখন কেশবচন্দ্রের 'আমি হিন্দু নই' কথার তীব্র প্রতিবাদ করে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বিখ্যাত বক্তৃতা দান করছেন, সে সময়েও শিবনাথ রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার বিরুদ্ধে নানা বক্তৃতা দিয়ে কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেছেন। শিবনাথ নিজেই এই বক্তৃতার অসারতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'এই বক্তৃতা কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না' এবং 'এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।' কাজেই দেখা গেল শিবনাথ অন্ততঃ ১৮৭২ সাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করে এসেছেন। কিন্তু শীঘ্রই বিরোধ দেখা গেল এই ১৮৭২ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা একতন্ত্রতাকে লক্ষ্য করেছিলেন বলেই গণতন্ত্রের উপর ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' স্থাপন করেন[১]। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেশব-চন্দ্রের মধ্যেও বর্তমান ছিল। সেটি হল উভয়ের মধ্যে আভিজাত্যবোধ লক্ষণীয় পরিমাণে বর্তমান ছিল। এই আভিজাত্যবোধই পরিণামে কেশব চন্দ্রের মধ্যে একতন্ত্রের ভাব সঞ্চারিত করেছিল। যে মুহূর্ত থেকে তাঁর মধ্যে এই ভাব-পরিস্ফুট হল, সেই মুহূর্তে তাঁর দলের[২] মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল।

১। দ্রঃ, কেশবচন্দ্রের মন্তব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১১৮।

২। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দলগঠনের একটা সুপ্ত ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এমন মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না।

এই বিদ্রোহের প্রকাশ প্রধান চারটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

এক ॥ দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পরিবারের কয়েকটি মহিলা মন্দিরের মধ্যে পর্দার বাইরে[১] এসে বসেছিলেন। এজন্যে দ্বারবানেরা নাকি মহিলাদের অসম্মান করে।[২] কেশবচন্দ্র মহিলাদের প্রকাশ্যে বসার বিরোধী জেনে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিরা ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের বৌবাজারের বাড়ীতে পৃথক উপাসনা সমাজ স্থাপন করলেন। লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী শিবনাথ এ ব্যাপারে কোন নেতৃত্ব দিলেন না। কারণ মেয়েদের প্রকাশ্যে বসতে দিলেই তাদের পরিত্রাণ ঘটবে, শিবনাথ একথা বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য কেশবচন্দ্র সময়ের গতি বুঝে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে স্বতন্ত্র সমাজ উঠে যায়। তাছাড়া, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন, তা নিয়েও মতভেদ দেখা দেওয়ায় দ্বারকানাথ প্রমুখের উদ্যোগে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

দুই ॥ কেশবচন্দ্র যখন স্বীয় সমাজের মধ্যে নিজেকে ঈশ্বরের 'প্রেরিত মহাপুরুষ' বলে প্রচার করতে লাগলেন, তখন একদল ব্রাহ্ম যেমন কেশবচন্দ্রকে তাঁদের পরিত্রাতা ভেবে তাঁর শরণাপন্ন হলেন, তেমনি অপর একদল ব্রাহ্ম যুবক নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আশু সর্বনাশের আশঙ্কায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের তর্ক-বিতর্কের অন্ত রইল না।

তিন ॥ নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের নিমরাজী ভাব এক দল ব্রাহ্মকে তাঁর বিরোধী করে তুলেছিল। এই কালের মধ্যে আনন্দমোহন বসু ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে একটি নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করলেন। কেশবচন্দ্র প্রথমে বাধা দিয়েও শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়ে প্রতিনিধি সভা আহ্বানে সম্মত হলেন।

১। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেশবচন্দ্রই ১৮৬৬ সালের মাঘোৎসবের সময় নিজে উদ্যোগী হয়ে মহিলাদের পর্দার বাইরে বসার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্রঃ, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৪।

২। কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫৮।

এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এই সভার প্রস্তাবক্রমে কেশবচন্দ্র ও আনন্দমোহন যথাক্রমে প্রতিনিধি সভার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। অবশ্য সমাজের ব্রাহ্মগণের অসহযোগিতায় কিছুদিনের মধ্যেই সভাটি 'বিযুক্ত' হয়; এতে ব্রাহ্মদের একাংশের মনে অসন্তোষ গুঞ্জরিত হতে থাকে।

এই অসন্তোষ ১৮৭৪ সালে ভারত-আশ্রমে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফেটে পড়ল। দেনার দায়ে মজিলপুরের হরনাথ বসুকে সস্ত্রীক আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু আশ্রমের ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর স্ত্রীকে অপমানের সঙ্গে গহনা খুলে দিয়ে পরিত্রাণ পেতে হয়। দারুণ সমালোচনার মধ্যে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে 'সমদর্শী' নামে একটি দল প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। শিবনাথ হরিনাভি থেকে এসে এই দলে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে সমর ঘোষণা করে শিবনাথ ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দুটি বক্তৃতা দিলেন।

এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছিল চতুর্থ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। এই শেষোক্ত আন্দোলনে শিবনাথ সাক্ষাৎভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সেটি হল, কুচবিহার-বিবাহ আন্দোলন। এর কথা আমরা পূর্বেই 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' নামক পুস্তিকাটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি। ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে কেশবচন্দ্রের কন্যা (পাত্রী) ও কুচবিহার-রাজ (পাত্র) উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তাছাড়া বিবাহটি পূর্ণ ব্রাহ্ম মতে অনুষ্ঠিত হয় নি। বিবাহ-মণ্ডপে হরগৌরী নামক 'দুইটি পদার্থ' স্থাপিত হয়েছিল। যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মসমাজ সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল, এই ঘটনা দ্বারা কেশবচন্দ্র সারা বিশ্বের সম্মুখে সেই ব্রাহ্মসমাজকেই হেয় করে দিলেন। ইংরাজ সরকারের অভীষ্ট পূর্ণ হল। সামাজিক একটা ঐক্য স্থাপনের মধ্যে তারা রাজ্য শাসনের যে অন্তরায়ের আশঙ্কা করেছিল, সেই ঐক্যস্থাপনার সূচনা-মুহূর্তে তাকে বিনষ্ট করল চক্রী ইংরাজ সরকার।[1] হাতিয়াররূপে ব্যবহার করল তারা কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস ও আনুগত্যকে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দল, সমদর্শী দল ও নিয়মতন্ত্র দলের

১। বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই বলেছেন, 'কেশবচন্দ্রকে কুচবিহারের রাজপুরুষেরা একটা ফাঁদে ফেলিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।'—সত্তর বৎসর, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪ পৃঃ ৫৯৯।

পর্যায়ক্রমী আন্দোলনের ফলে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে যে প্রীতি ক্ষয় হয়ে আসছিল, কুচবিহার-বিবাহকে কেন্দ্র করে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল। কেশবচন্দ্রকে অপসারণের চেষ্টা চলতে লাগল। সকলে কেশবচন্দ্রকে একটা মিটিং ডাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্র এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের সাহায্যে একটা মিটিং ডাকলেন—'Babu Keshub Chunder Sen will propose, that Babu Keshub Chunder Sen be deposed. সভায় কেশবচন্দ্রের অপসারণের দাবী জানিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী যেই প্রস্তাব তুললেন, অমনি কেশবচন্দ্র সপার্ষদ সভা ত্যাগ করলেন এবং পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে মন্দিরে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। লক্ষণীয় যে, যেদিন মন্দিরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ঘটে সেদিন শিবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যাই হোক্, ঐ দিনই (২৪.৩.১৮৭৮) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের পার্শ্বস্থ উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে তাঁরা পৃথক্‌ভাবে উপাসনা শুরু করলেন। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই প্রথম পৃথক উপাসনা আরম্ভ হইল।'[১] এখানে শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রতি রবিবার নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে আচার্যের কার্য করতে লাগলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল।

॥ নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ॥

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিত হয়। 'নববিধানে'র ক্রিয়াকর্মে কিছু পরিমাণে দেববাদ স্বীকৃত হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট চিন্তাধারা থেকে 'নববিধান' যথার্থই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। কুচবিহার বিবাহের অনুষ্ঠানে কেশবচন্দ্র পৌত্তলিক-ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই সরস্বতী, কালী ইত্যাদি হিন্দু দেব-দেবীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেন। সান্‌ডে মিরারে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধের মধ্যে কেশবচন্দ্রের এই নূতন মতকে প্রচারিত হতে দেখি। এই হল তাঁর 'নববিধান'। এর পশ্চাতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের গভীর যোগাযোগ ও রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বহুল পরিমাণে সক্রিয় ছিল, এমন

১। কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫৯।

অনুমান অসঙ্গত হবে না।[১] কিন্তু কেশবচন্দ্রের মত সে যুগের বহুজনেরই বিশ্বাস ছিল যে 'নববিধানে'র আধ্যাত্মিক সমন্বয়ী উপলব্ধি এবং সমাজ-সংস্কারের অবলম্বিত পন্থা উনিশশতকীয় সংস্কার আন্দোলনের সার্থকতর রূপ ছিল। সর্বধর্মের প্রতি, সমগ্র সভ্যতার প্রতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কেশবচন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। দেশের এই অগ্রগতির সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হয়েও নববিধান প্রতিষ্ঠা করে কেশবচন্দ্র দেশের অতীত সত্যকে নিয়ে পড়ে রইলেন। ফলে যে সত্য-আনন্দ তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আনন্দ থেকে তাঁর চতুষ্পার্শস্থ বহুসংখ্যক দুঃখার্ত ও বিভ্রান্ত লোকদের তিনি বঞ্চিত করেছিলেন। সুতরাং জন্মনেতা ও গতিশীল মানব কেশবচন্দ্র, যিনি তাঁর প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের রাজদূত হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন, যিনি শাস্ত্রের চেয়ে মানবিক উপলব্ধিকে, ব্যক্তিতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারকে, সামাজিক শাসনের চেয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান দান করতে চেয়েছিলেন,—বৈরাগ্য প্রচারে রত হয়ে, সন্ন্যাসীর ঔদাসীন্য গ্রহণ করে ও এক নূতন আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে প্রচার করে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাক্ষাৎ যোগ থেকে বহুদূরে সরে এসেছিলেন।

পক্ষান্তরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ 'হিন্দু' আদর্শ গ্রহণের ব্যাপারে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়েও দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছিল বলে তার শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই সমাজের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর যোগ হয় সর্বাধিক। বরং একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সব কিছু কাজই শিবনাথ-জীবননির্ভর ছিল। শিবনাথের বিভিন্নমুখী কর্মব্রত উদ্‌যাপনে আমরা তার কিছু কিছু পরিচয় গ্রহণ করেছি।

পৃথক্ উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পর ব্রাহ্মসমাজ কমিটির উদ্যোগে ব্রাহ্মদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৫ই মে তারিখে টাউন হলে একটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হল। তাতে 'কুচবিহার বিবাহ দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ঐ সভায় উপস্থিত সমস্ত লোক একবাক্যে তাহা

১। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫।

নির্ধারণ' করার পর ঐ সভার[১] প্রস্তাবক্রমে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হল।

বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রথম সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত এর সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। অন্যান্যদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ৩৫ জন সাধারণ সভ্য নিযুক্ত হলেন।

এ ছাড়া আরও একটি প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হল—'দুই মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের জন্য নূতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া সভ্য সাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত করা চাই।' অর্থাৎ যে নিয়মতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রচেষ্টা চলছিল, তার রূপায়ণের জন্য সকলের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। দেবেন্দ্রনাথও শিবনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে একটি পাকা 'constitution-এ বদ্ধ' করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নিয়মাবলী রচনার ব্যাপারে শিবনাথের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু। ব্যারিস্টার আনন্দমোহন সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের দিকে তাকিয়েই ১৮৭৮ সালেই এক আদর্শ সংবিধান রচনা করলেন। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে এই সংবিধানের আদর্শ সবিশেষ লক্ষণীয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হওয়ার সত্তর বছর আগেই এই সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষ-বৃত্তি-আয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে সকলের বয়স্ক ভোটদানের অধিকার (adult franchise) মেনে নিয়েছিল—এমন কি যখন লণ্ডনসমেত ইউরোপের বহুদেশ এই প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার মেনে নেয় নি।[২]

এই প্রসঙ্গে নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামকরণের ঘটনাটিও উল্লেখ্য। কারণ এই নামকরণের মধ্যেও একটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে পুষ্টিদান করা

১। সভায় চারশো'র বেশি লোক উপস্থিত ছিলেন। আদি সমাজের পক্ষ থেকে রাজনারায়ণ বসু, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত মিঃ ম্যাকডোনাল্ড, রেভারেণ্ড মিঃ হেক্টর সাহেব ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন। আনন্দমোহন বসু সভাপতি হন। ২৬টি সমাজের মধ্যে ২৩টি সমাজের সমর্থনে, ৪২৫ জন ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার মতানুকূল্যে ও ২৫০টি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে ১৭০টির সম্মতিক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। ইংলণ্ড এই অধিকার মেনে নিয়েছিল বহু সংগ্রামের পর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় (ইনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণেরও অন্যতম ছিলেন) এই নামটি প্রথম উল্লেখ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ১৫ই মে'র সভায় এই নাম প্রস্তাব করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই নাম সমর্থন করলে এই নামই রাখা হয়।[২] অবশ্য এই নামকরণের ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়াও অচিরকাল মধ্যে লক্ষিত হল। প্রাচীনেরা এর মধ্যে একটা লঘুভাব লক্ষ্য করলেন, সাধারণ লোকে একে যথেচ্ছ অধিকারের সাধারণ সম্পত্তি ভাবতে লাগলেন এবং সমাজস্থ সভ্যেরা পাছে নিয়মতন্ত্র প্রণালী ক্ষুন্ন হয়, এই ভেবে পরস্পরের দোষ দর্শনে মগ্ন হলেন।[১]

১৫ই মে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা' প্রকাশিত হল ২৯এ মে তারিখে। তাছাড়া ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন তো ছিলই। ১৪নং কলেজ স্কোয়ারে গুরুচরণ মহলানবিশের বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটির অধিবেশন বসত। এই সমাজে যে স্বাধীনতার আদর্শ ও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দেখা দিল, তাতে বহু যুবক আকর্ষিত হল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শিবনাথ শাস্ত্রী—এই চারজনকে প্রথম প্রচারকের পদে বরণ করা হল। অবশ্য ১৮৮৬তে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং আরও পরে রামকুমার বিদ্যারত্ন সমাজ ত্যাগ করেন। গণেশচন্দ্র ঘোষেরও মৃত্যু হয়। একমাত্র শিবনাথই সমাজের কাজে শেষ পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেন।

মহান্দোলনের মধ্যে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ অতিবাহিত হল। এবারে সভ্যেরা সমাজের একটি স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য উদ্যোগী হলেন। ২১১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে (বর্তমানে বিধান সরণি) ক্রীত জমিখণ্ডের উপর উপাসনাগৃহ নির্মাণের উদ্যোগ চলতে লাগল। নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য সভ্যেরা প্রত্যেকেই তাঁদের এক মাসের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দান করলেন সাত হাজার টাকা ('Unconditional Gift')। এতদ্ব্যতীত সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবের সর্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তি মুক্ত হস্তে দান করলেন।

১। ২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃঃ ১৫৩।

সমাজগৃহের ভিত্তি স্থাপন সম্পন্ন হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসবের সময়। বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে ১১ই মাঘ তারিখে বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব ভিত্তি-স্থাপন কার্য সম্পন্ন করলেন।

তিনটি সমাজকে একত্রীকরণের চেষ্টা এই সঙ্গে চলেছিল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ-প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত রামমোহন স্মৃতিসভাকে উপলক্ষ্য করে এই মিলন-সাধনের চেষ্টা চলেছিল। শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র আসেন নি। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ২।১ জন দর্শক মাত্র এসেছিলেন।

১৮৮০ সালের মাঘোৎসব অর্ধনির্মিত মন্দিরের মধ্যেই চন্দ্রাতপের নীচে অনুষ্ঠিত হল। ১৮৮১ সালে গুরুচরণ মহলানবিশ, রাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শিবনাথের নিরন্তর চেষ্টার পর মন্দিরের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হল। কীর্তনান্তে ১০ই মাঘ ১৮৮১ সালে মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য সম্পূর্ণ হল।

বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছেন,'…ব্রাহ্মসমাজ একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস কখনো তাহা ভুলিতে পারিবে না'।[১] ভোলা যায় না, কারণ তা স্বাভাবিক নয়। ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন ধর্মীয় উপাখ্যান বা উপকাহিনী নয়, তা ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনের অন্তঃসংঘাতেরই সৃষ্টি। এই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বাঁক ফেরার ইতিহাসের সঙ্গে যে ব্যক্তিটি সর্বাধিক পরিমাণে যুক্ত ছিলেন—তিনি স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী।

১। বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১২৮।

পরিশিষ্ট (খ)

॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

১৮৪৭ :	৩১এ জানুয়ারি	চাংড়িপোতা গ্রামে জন্ম।
১৮৫৬ :	জুলাই	কলকাতায় আগমন ও সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয়।
:	৭ই ডিসেম্বর	প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি।
১৮৬০ :		প্রথম বিবাহ প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে।
১৮৬৫ :		প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ' সোমপ্রকাশে প্রকাশারম্ভ।
১৮৬৬ :		: দ্বিতীয় বিবাহ বিরাজমোহিনী দেবীর সঙ্গে।
		: এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ।
১৮৬৭ :		: শাঁখারিটোলায় জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস।
		: প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর শ্বশুরগৃহে পুনরায় আগমন।
১৮৬৮ :	১লা আষাঢ়	: প্রথমা কন্যা (প্রথম সন্তান) হেমলতার জন্ম।
		: প্রথম বিধবাবিবাহ দান, যোগেন্দ্রের সঙ্গে মহালক্ষ্মীর।
		: ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকর্ষণ বোধ।
		: গ্রন্থাকারে 'নির্বাসিতের বিলাপ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।
১৮৬৯ :		: সংস্কৃত কলেজে বেণীসংহার নাটকে অভিনয়।
		: এল. এ. পরীক্ষায় পাশ।

	: ৭ ভাদ্র, ২২এ আগষ্ট	কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ।
		পিতা কর্তৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত।
		রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে পরিচয়।
		সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আচার্যের আসন গ্রহণ।
১৮৭০	: ৮ই শ্রাবণ	দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিনীর জন্ম।
১৮৭১	: ১৪ই আষাঢ়	তৃতীয় সন্তান ও একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথের জন্ম।
১৮৭২	:	এম. এ. পাশ ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্তি।
		ভারত আশ্রমে সপরিবারে বাসের জন্য আগমন।
	: এপ্রিল	'মদ না গরল' পত্রিকা সম্পাদনা।
১৮৭৩	: ডিসেম্বর	হরিনাভিতে আগমন, হরিনাভি স্কুলের ভার-গ্রহণ ও 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনা।
১৮৭৪		রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে যোগ।
	নভেম্বর	'সমদর্শী' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা।
	২৫এ ডিসেম্বর	তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীর জন্ম।
১৮৭৫		'পুষ্পমালা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।
	নভেম্বর	সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনীর জন্ম।
১৮৭৬		হেয়ার স্কুলে আগমন।
	২৬এ জুলাই	আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'ভারত সভা' স্থাপন।
১৮৭৭	:	প্রথম সন্তান বিয়োগ—সরোজিনীর মৃত্যু।
১৮৭৮	: ১৭ই ফেব্রুয়ারি	: 'সমালোচক' পত্রিকা সম্পাদনা।
	: ফেব্রুয়ারি	: চাকুরি ত্যাগ।
	: মার্চ	: কুচবিহার বিবাহান্দোলনে আত্মনিয়োগ।

	: মার্চ, এপ্রিল	: 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' পুস্তিকা রচনা।
	: ১৫ই মে	: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।
	: ২৪এ মে	: প্রথম প্রচারযাত্রায় বিহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ।
	: ২৯এ মে	: 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা।
১৮৭৯	: ২৭এ এপ্রিল	: আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় সিটি স্কুল স্থাপন।
	:	: ছাত্রসমাজ স্থাপন।
	: সেপ্টেম্বর	: প্রচারের জন্য প্রায় সমগ্র ভারত-ভ্রমণ।
	:	: মাদাম ব্লাভাট্স্কীর সঙ্গে সম্মিলন।
১৮৮০ :		'মেজবউ' নামক প্রথম উপন্যাস।
		এণ্ট্রান্স ও এল. এ. পরীক্ষার সংস্কৃত বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত।
		অর্ধনির্মিত সমাজ-মন্দিরে মাঘোৎসব।
১৮৮১	: ফেব্রুয়ারি	প্রচারের জন্য দক্ষিণ ভারত গমন।
		'গৃহধর্ম' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।
১৮৮৩ :		: 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকা সম্পাদনা।
		: বর্ধমান জেলার বড়বেলুন নামক গ্রামে প্রচারার্থে আগমন।
১৮৮৪ :		: 'জাতিভেদ' নামক পুস্তক প্রকাশ।
১৮৮৫	: জুলাই	: 'সখা' শিশুমাসিক সম্পাদনা।
১৮৮৬ :		: ধর্মপ্রচারের জন্য আসাম যাত্রা ও কার্সিয়াঙে নির্জনবাস।
		: 'রামমোহন' নামক পুস্তিকা প্রকাশ।
১৮৮৭ :		: 'হিমাদ্রি কুসুম' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৮৮ :	ফেব্রুয়ারী	: পিতার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের পর মিলন
	১৩ই এপ্রিল	দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিনীর বিবাহ।
	১৫ই এপ্রিল	বিলাতযাত্রা শুরু হয়।
	১৯এ মে	লণ্ডনে পৌছান।
		বিলাত বাসকালে জেমস্ মার্টিনো, ঈ. বি. কাউয়েল, ফ্রান্সিস্ নিউম্যান, মিস্ কব্, রেভারেণ্ড ভয়সী, উইলিয়ম স্টেড্ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরিচয়।
		'দি হিস্ট্রি অফ্ ব্রাহ্মসমাজ' নামক গ্রন্থ রচনারম্ভ।
		'বক্তৃতাস্তবক' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।
		'রঘুবংশ' নামক পুস্তক প্রকাশ।
		'পুষ্পাঞ্জলি' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।
১৮৮৯ :	নভেম্বর	ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা।
		প্রচারার্থে ইন্দোর যাত্রা।
		'ছায়াময়ী পরিণয়' নামক শেষ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।
১৮৯০ :	অক্টোবর	প্রচারের জন্য মাদ্রাজ যাত্রা।
		'সাধুজীবন' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।
১৮৯২ :	১লা ফেব্রুয়ারি	সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৩ :		জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ।
১৮৯৫ :		'যুগান্তর' নামক দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশ।
১৮৯৮ :		চন্দননগরে বাস।
১৮৯৯ :		তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনীর বিবাহ।
১৮৯৯-০১		'ধর্মজীবন' গ্রন্থ ছয় খণ্ডে প্রকাশ।
১৯০১ :		পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ।
	৩রা জুন	পত্নী প্রসন্নময়ীর মৃত্যু।

১৯০২ :		: 'মাঘোৎসবের উপদেশ' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯০৩ :		: 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯০৪ :		: সমগ্র ভারত ভ্রমণে বহির্গমন।
		: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ প্রকাশ।
		: 'প্রবন্ধাবলি' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯০৬ :	১৫ই নভেম্বর	: কন্যা সুহাসিনীর মৃত্যু।
১৯০৭ :		: কোকনদা, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে প্রচারের জন্য গমন।
		: 'উপকথা' নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯০৯		নব্যভারতে 'ভূত ও ভবিষ্যৎ' নামক পুস্তিকা প্রকাশ।
১৯১০		'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' পুস্তিকা প্রকাশ।
১৯১১ :		: 'দি হিস্ট্রি অব ব্রাহ্ম সমাজ'—১ম খণ্ড প্রকাশ।
১৯১২ :		: 'দি হিস্ট্রি অব ব্রাহ্ম সমাজ'—২য় খণ্ড প্রকাশ।
১৯১৪-১৬ :		: 'ধর্মজীবন' গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশ।
১৯১৬ :		: 'বিধবার ছেলে' উপন্যাস প্রকাশ।
১৯১৭ :		: 'সাহিত্য রত্নাবলী' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯১৮ :		: 'আত্মচরিত' প্রকাশ।
	: অক্টোবর	: জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু।
	:	: 'মেন্ আই হ্যাভ্ সীন্' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯১৯	: ৩০এ সেপ্টেম্বর	

॥ মৃত্যুর পর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ ॥

১৯২২ : 'উমাকান্ত' নামক উপন্যাস, পুত্র প্রিয়নাথ কর্তৃক প্রকাশিত।
: 'শিবনির্মাল্য' নামক কবিতা সংকলন, কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৫২ : 'আত্মপরীক্ষা' নামক তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকীয় সংকলন, অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯৫৭ : 'ইংলণ্ডের ডায়েরী', অবন্তী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

১৯৬০ : 'ছোটদের গল্প' শিশুপাঠ্য রচনার সংকলন।

১৯৬২ : 'স্বনামা পুরুষ' শিশুপাঠ্য জীবনী-সংকলন।

পরিশিষ্ট (গ)

শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবৎকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী

(১৮৪৭-১৯১৯)

১৮৪৭ : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রকাশ।

১৮৪৯ কালা আইন বা ব্লাক অ্যাক্ট্ প্রচার।
বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

১৮৫১ রামতনুর উপবীত ত্যাগ।
বেথুনের মৃত্যু।
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের **'বিবিধার্থ সংগ্রহ'** প্রকাশ।
: ৩১এ অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের (ভারতবর্ষীয় সভা) প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৫ : : ফুলমণি ও করুণার বিবরণ নামক উপন্যাসাখ্য রচনার প্রকাশ।

১৮৫৩ :		: হরিশ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু প্যাট্রিয়টের প্রকাশ।
		: রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা।
১৮৫৪ :	ফাল্গুন	: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' নামক প্রস্তাব প্রকাশ।
		: সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতির প্রতিষ্ঠা।
		: রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের প্রকাশ।
১৮৫৫ :	১৬ই জুলাই	বিধবাবিবাহ আইন পাশ।
	: ৭ই ডিসেম্বর	প্রথম বিধবাবিবাহ (১০নং সুকিয়া স্ট্রীটে)।
১৮৫৭ :		সিপাহী বিদ্রোহ।
		কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
		কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান।
		'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসচিত্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশ।
		দাশরথি রায়ের মৃত্যু।
১৮৫৮ :		প্রথম গ্রাজুয়েট—বঙ্কিম ও যদুনাথ।
		বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম।
		হিমালয় থেকে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তন।
	: ১৫ই নভেম্বর	সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রকাশ।
১৮৫৯		নীলবিদ্রোহ।
		মেট্রোপলিটন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা।
		মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রকাশ।
১৮৬০		মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ।
		দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের প্রকাশ।

১৮৬১ : ১২ই শ্রাবণ প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ (দেবেন্দ্রনাথের কন্যা সুকুমারীর)।
মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্রকাশ।
ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার প্রকাশ।
হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু।
রেভারেণ্ড লঙের কারাগার।
রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮৬২ : দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দান ও অব্রাহ্মণ কেশবচন্দ্রকে বেদীতে উপবেশনের অধিকার দান।

১৮৬৩ : বিবেকানন্দের জন্ম।
মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফের ভারত-ত্যাগ।

১৮৬৫ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের প্রকাশ।

১৮৬৬ : ১১ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা।
কেশবচন্দ্র কর্তৃক শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশ।

১৮৬৭ : হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন।

১৮৬৮ : ঐ, দ্বিতীয় অধিবেশন।
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৬৯ : ২২এ আগস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০ : কেশবচন্দ্র কর্তৃক ভারত সংস্কার সভার প্রতিষ্ঠা।
সুলভ সমাচার পত্রিকার প্রকাশ।
সাঁওতাল-বিদ্রোহ।
রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী) বিলাত গমন (প্রথম ভারতীয় নারী)।

১৮৭১ : : মদ না গরল পত্রিকা প্রকাশ।
: বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ।

		: কেশবচন্দ্র কর্তৃক ভারত আশ্রমে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
১৮৭২ :		: ১৮৭২ সালের তিন আইন (Act III of 1872) পাশ।
		: বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ।
		: ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা।
		: রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতাদান।
১৮৭৩ :		: মধুসূদনের মৃত্যু।
		: হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়)।
১৮৭৪ :		: ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকা প্রকাশ।
১৮৭৫ :	১৫ই মার্চ	: রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎকার।
		: দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা।
		: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য প্রকাশ।
		: ইণ্ডিয়ান লীগের প্রতিষ্ঠা।
		: স্টুডেন্টস্ এসোশিয়েসন (ছাত্রসমাজ) প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৬ :	২৬এ জুলাই	: ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৭ :		: ভারতী পত্রিকার প্রকাশ।
		: ভিক্টোরিয়া কর্তৃক 'ভারত রাজরাজেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ।
১৮৭৮ :	২১এ মার্চ	: ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্রিকা প্রকাশ।
	: ১৫ই মে	: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।
	: ৩১এ মে	: তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা প্রকাশ।
		: বিবেকানন্দের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যোগ।
১৮৭৮ :		: ভার্ণেকিউলার প্রেস অ্যাক্ট প্রচার।

১৮৭৯ : : থিওসফিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া শাখা প্রতিষ্ঠা।
: বিহারীলালের সারদা-মঙ্গল কাব্য প্রকাশ।
: সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা।

১৮৮০ : ২৫এ জানুয়ারি : কেশবচন্দ্র কর্তৃক নববিধান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা।

১৮৮১ : ১০ই মাঘ : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৮৮২ : : ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রকাশ।
: রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

১৮৮৩ : : প্রথম ন্যাশনাল কনফারেন্স—কলকাতায়।

১৮৮৪ : : কেশবচন্দ্রের মৃত্যু।
: প্রচার পত্রিকার প্রকাশ।

১৮৮৫ : : ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৬ : : রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যু।

১৮৮৯ : : রিপন কর্তৃক প্রেস অ্যাক্ট প্রত্যাহার।

১৮৯১ : : সাধনা পত্রিকার প্রকাশ।
: বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।

১৮৯৩ : : শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের যোগদান।
: মূক ও বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (সিটি স্কুলের উদ্যোগে)।

১৮৯৪ : : বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু।

১৮৯৭ : : রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা।
: অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৮ : : রামতনু লাহিড়ীর মৃত্যু।

১৮৯৯ :	: রাজনারায়ণ বসুর মৃত্যু।
১৯০১ :	: রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন।
১৯০২ :	: বিবেকানন্দের মৃত্যু।
১৯০৫ :	: দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু।
	: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু।
১৯০৬ :	: গান্ধিজী কর্তৃক হরিজন আন্দোলন আরম্ভ।
	: ঋষি অরবিন্দ কর্তৃক বন্দেমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশ।
	: যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ।
১৯০৮ :	: ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
১৯১৩ :	: রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি।
১৯১৪-১৯১৮ :	: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

॥ যে সব পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি ॥

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস	: ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।
আত্মজীবনী	: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আত্মচরিত	: রাজনারায়ণ বসু।
আত্মচরিত	: কৃষ্ণকুমার মিত্র।
আধুনিক সাহিত্য	: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আমার জীবন	: নবীনচন্দ্র সেন।
আচার্য কেশবচন্দ্র	: উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।
আরণ্যক	: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা	: যোগেশচন্দ্র বাগল।
কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র	: যোগেশচন্দ্র বাগল।

কাব্যবাণী : ভবতোষ দত্ত।
কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
চরিত-কথা : বিপিনচন্দ্র পাল।
চরিত-চিত্র : ঐ
চারিত্র পূজা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন-চরিত : কার্তিকেয়চন্দ্র রায়
দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ১৩৪৪ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নবযুগের বাংলা : বিপিনচন্দ্র পাল।
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী (শিবনাথ-জীবনী) হেমলতা দেবী।
পুরাতন প্রসঙ্গ বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
বাংলার নারী জাগরণ প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
বাংলার ইতিহাস-সাধনা প্রবোধচন্দ্র সেন।
বাংলার জাগরণ কাজী আবদুল ওদুদ।
বাংলা সাহিত্যে গদ্য সুকুমার সেন।
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় ঐ
বাংলা গদ্যের চার যুগ মনোমোহন ঘোষ।
বাংলার নব্য সংস্কৃতি যোগেশচন্দ্র বাগল।
বাংলার উচ্চশিক্ষা ঐ
বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ঐ
বাংলা সাময়িক পত্র—১ম ও ২য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাংলার নবজাগরণের কথা যোগেশচন্দ্র বাগল।
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব : রামগতি ন্যায়রত্ন।
ব্রহ্মসঙ্গীত—নবম ও দ্বাদশ সং : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত
ব্রাহ্মধর্ম : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত — দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর — শ্রীনাথ চন্দ।
বঙ্গভাষার লেখক—১ম খণ্ড — হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—১ম — বিনয় ঘোষ।

ভারতপথিক রামমোহন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ : প্রবোধচন্দ্র সেন।
ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া : প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : অজিতকুমার চক্রবর্তী।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সংকলিত।

শতাব্দীর শিশুসাহিত্য : খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
শান্তিমঠ : দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
শিবনাথ : সুনীতি দেবী।
শিবনাথ শাস্ত্রী : শশিভূষণ বসু।
শিবনির্মাল্য : বিজয়চন্দ্র মজুমদার সংকলিত।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা-১ম ও ২য় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১-৯ খণ্ড ॥
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র-১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড — বিনয় ঘোষ।
সেবকের নিবেদন — কেশবচন্দ্র সেন।
সত্তর বৎসর : আত্মজীবনী — বিপিনচন্দ্র পাল।
স্বপ্নপ্রয়াণ — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
সেকাল ও একাল — রাজনারায়ণ বসু।

হিন্দু আইনে বিবাহ — তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

॥ ইংরাজি গ্রন্থসমূহ ॥

Brahmo Samaj—the Depressed classes and Untouchability	: Satischandra Chakravarti and Sarojendranath Roy
Brahmoism and Hinduism	: Sir Monier-Monier Williams
Cassell's Encyclopeadia of Literature.	
History of the Brahmo Samaj Vol. I & II	: Sivanath Sastri.
Keshub Chunder Sen	Pratapchunder Majumdar.
Keshub : As Seen by His Opponents	: G. C. Banerjea.
Life and Letters of Raja Rammohan Roy	: Miss S.D. Collet, Ed. by D.K. Biswas & P. C. Ganguli.
Memoirs of My Life and Times	B. C. Pal.
Modern Political Thought	V. P. Verma.
Men I Have Seen	Shivanath Sastri.
Pandit Shivanath Sastri	Sitanath Tattwabhusan.
Philosophy of Brahmoism	Do
Shivanath Sastri	Hemchandra Sarkar.
Studies in Bengali Renaissance	Ed. by Atul Gupta.
The Literature of Bengal	R. C. Dutt.
The Story of My Experiment with Truth. Vol I.	M. K. Gandhi.
The Origin and Growth of Caste in India. Vol. I.	N. K. Dutta.
The Rise and Growth of the Congress in India	C. F. Andrews snd Girija Mukherjee.
The Brahmo Samaj and the Battle for Swaraj.	: B. C. Pal.

॥ যে সমস্ত পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি ॥

অবলাবান্ধব : আষাঢ় ১২৭৭ সাল

তত্ত্ববোধিনী ফাল্গুন ১৭৮১ শক
ফাল্গুন ১৭৮২ শক
আষাঢ় ১৮০০ শক
বৈশাখ ১৮০১ শক
আশ্বিন ১৮০১ শক
কার্তিক ১৮০৬ শক
ভাদ্র ১৮০৭ শক
বৈশাখ ১৮০৯ শক
জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৯ শক
কার্তিক ১৮৪১ শক

তত্ত্বকৌমুদী ১৮০০ শক ১ম বর্ষ
থেকে সমগ্র সংখ্যা

দেশ—সাপ্তাহিক : ১২ পৌষ ১৩৪২
—সাহিত্য-সংখ্যা : ১৩৭৩ সাল

ধর্মতত্ত্ব : ১৬ শ্রাবণ ১৭৯২ শক
১৬ কার্তিক ১৭৯২ শক
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক
১ ফাল্গুন ১৭৯৩ শক
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক
১ ও ১৬ই আষাঢ় ১৩৬৫ সন

নব্যভারত : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সাল
: আষাঢ় ১২৯০ সাল

নব্যভারত : ভাদ্র ১২৯০ সাল
ফাল্গুন ১২৯০ সাল
ভাদ্র ১২৯১ সাল
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১২৯২ সাল
কার্তিক ১২৯২ সাল
পৌষ ১২৯২ সাল
চৈত্র ১২৯২ সাল
শ্রাবণ ১২৯৪ সাল
আষাঢ় ১২৯৫ সাল
কার্তিক ১২৯৬ সাল
ভাদ্র ১২৯৬ সাল

প্রদীপ : আশ্বিন ও কার্তিক
১৩০৫ সাল
: আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩০৭ সাল
: আশ্বিন ১৩০৭ সাল

প্রবাসী : বৈশাখ ১৩০৯ সাল
ভাদ্র ১৩০৯ সাল
কার্তিক ১৩০৯ সাল
পৌষ ১৩০৯ সাল
মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৯ সাল
অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ ১৩০৯
চৈত্র ১৩১০ সাল
কার্তিক ১৩১১ সাল
অগ্রহায়ণ ১৩১১ সাল
ফাল্গুন ১৩১১ সাল
চৈত্র ১৩১১ সাল
আষাঢ় ১৩১২ সাল

প্রবাসী : ভাদ্র ১৩১২ সাল
: জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ সাল
অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল
অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল
মাঘ ১৩৩৪ সাল
ফাল্গুন ১৩৩৪ সাল
অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সাল
চৈত্র ১৩৪৫ সাল
ফাল্গুন ১৩৪৭ সাল
ভাদ্র ১৩৫৪ সাল
অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ সাল

বঙ্গদর্শন : জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ সাল
ফাল্গুন ১২৮৭ সাল

বান্ধব : চৈত্র ১২৯১ সাল

বামাবোধিনী : শ্রাবণ ১২৭৩ সাল
: চৈত্র ১২৭৩ সাল
: শ্রাবণ ১২৮০ সাল
: আষাঢ় ১২৮১ সাল
: মাঘ-ফাল্গুন ১২৮১ সাল
: বৈশাখ ১২৮২ সাল
: কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ সাল
: শ্রাবণ ১২৮৯ সাল
: ভাদ্র ১২৮৯ সাল
: বৈশাখ ১২৯৫ সাল
: পৌষ ১২৯৫ সাল

বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬ সাল
: কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯ সাল

ভারত সংস্কারক : ৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০ সাল
: ২ শ্রাবণ ১২৮১ সাল
: ১৮ পৌষ ১২৮১ সাল

ভারত মহিলা : ফাল্গুন ১৩১৪ সাল
: অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল

ভারতী : বৈশাখ ১৩০৭ সাল
: জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ সাল
: ভাদ্র ১৩১৮ সাল
: বৈশাখ ১৩১৯ সাল

মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩৫৭ সাল
: জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ সাল
: মাঘ ১৩৬৫ সাল

মুকুল : আষাঢ় ১৩০২ থেকে চৈত্র ১৩০৭ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যা

শনিবারের চিঠি : বৈশাখ ১৩৭৫ সাল

শারদীয় যুগান্তর : ১৩৬৯ সাল

সোমপ্রকাশ : ২০ মাঘ ১২৭০ সাল
১৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ সাল
২৮ শ্রাবণ ১২৭৪ সাল
৫ কার্তিক ১২৭৪ সাল
১০ অগ্রহায়ণ ১২৭৪ সাল
১ শ্রাবণ ১২৭৯ সাল
১ পৌষ ১২৮০ সাল
১২ ফাল্গুন ১২৮০ সাল
৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১
১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ সাল

সোমপ্রকাশ : ২ আষাঢ় ১২৮১ সাল
: ১৫ই ভাদ্র ১২৯৩ সাল

সাহিত্য : জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ সাল
: ফাল্গুন ১৩০৭ সাল
: ফাল্গুন ১৩১০ সাল
: আষাঢ় ১৩১৩ সাল
: আশ্বিন ১৩১৬ সাল

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : বিশেষ
সংখ্যা ১৩২৬

সুলভ সমাচার : ২৯ মাঘ ১২৮০ সাল
: ৩০ বৈশাখ ১২৮১ সাল

সবুজ পত্র : অগ্রহায়ণ ১৩২৩ সাল

সমাচার দর্পণ : ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ খ্রী:

সমদর্শী : সমস্ত সংখ্যা

সখা : সমস্ত সংখ্যা, বিশেষত:
জানুয়ারি, মে, সেপ্টেম্বর,
১৮৮৬ খ্রী: ও জানুয়ারি
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ

সাধনা : চৈত্র ১৩০০ সাল

সুপ্রভাত : ফাল্গুন ১৩১৭ সাল

॥ ইংরেজি পত্র-পত্রিকা ॥

Brahmo Year Book—1878-84
Brahmo Public Opinion—1878

॥ শিবনাথ-রচিত পুস্তকসমূহের তালিকা (বিষয়ানুযায়ী) ॥

কাব্যগ্রন্থ ।

নির্বাসিতের বিলাপ—১৮৬৮ ।
পুষ্পমালা—১৮৭৫ ।

জীবনকাব্য (অন্য কয়েকজনের লিখিত পদ্যসহ)—১২৯১ সাল।
হিমাদ্রিকুসুম—১৮৮৭।
পুষ্পাঞ্জলি—১৮৮৮।
ছায়াময়ী পরিণয়—১৮৮৯।

উপন্যাস ॥

মেজবউ—১৮৮০।
যুগান্তর—১৮৯৫।
নয়নতারা—১৮৯৯।
বিধবার ছেলে—১৯১৬।

শিশুসাহিত্য, জীবনী, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাসমূহ ॥

এই কি ব্রাহ্মবিবাহ?—১৮৭৮।
গৃহধর্ম—১৮৮১।
ধর্ম কি?—১৮৮৪।
জাতিভেদ—১৮৮৪।
রামমোহন রায়—১৮৮৬।
বক্তৃতা স্তবক—১৮৮৮।
রঘুবংশ (১-৪ সর্গ, সটীক অনুবাদ)—১৮৮৮।
মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা—১৮৮৯।
সাধুজীবন—১৮৯১।
সমাজরক্ষা ও সামাজিক উন্নতি—১৮৯৫।
ধর্মজীবন (ছয় খণ্ডে)—১৮৯৯-১৯০১।
(তিন খণ্ডে)—১৯১৪—১৬
মাঘোৎসবের উপদেশ—১৯০২।
মাঘোৎসবের বক্তৃতা—১৯০৩।
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—১৯০৪।
প্রবন্ধাবলি—১৯০৪।
উপকথা—১৯০৭।
নব্যভারতের ভূত ও ভবিষ্যৎ—১৯০৯।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—১৯১০।

সাহিত্য রত্নাবলী—১৯১৭।

আত্মচরিত—১৯১৮।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ॥

শিবনির্মাল্য—১৯২২ (বিজয়চন্দ্র মজুমদার সংকলিত)।—কাব্যগ্রন্থ।

উমাকান্ত—১৯২২—উপন্যাস (প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত)।

আত্মপরীক্ষা—১৯৫২—সম্পাদকীয় রচনার সংকলন (অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত)।

ইংলণ্ডের ডায়েরী—১৯৫৭ (অবন্তী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত)।

ছোটদের গল্প—১৯৬০।

স্বনামা পুরুষ—১৯৬২—জীবনী সংকলন।

এটিই শিবনাথ-রচিত গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। কারণ আরও বহু পুস্তিকা তাঁর নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে সেগুলি একান্তই দুষ্প্রাপ্য। এখানে কতকগুলির উল্লেখ করছি।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা—১৮৮০।

জাতিভেদ—১ম ও ২য় প্রবন্ধ—১৮৮০।

পরকাল—১৮৮০।

ভারতক্ষেত্রে সংস্কারকার্য ও তৎসাধনের উপায়—১৮৮০।

সামাজিক ব্যাধি।

নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

চিন্তামঞ্জরী (মাঘোৎসব—১৮০৭ শক)।

প্রার্থনা।

ব্রহ্মোপাসনা কর্তব্য কেন ?

জাতীয় সাধনা।

ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামালা (৩য় সংস্করণ ৮৬ ব্রাহ্ম সংবৎ)।

ব্রাহ্মধর্মসাধন।

নির্ঘণ্ট

[পাদটীকার সংক্ষিপ্তরূপ 'পা' পৃষ্ঠা-সংখ্যার পাশে উল্লিখিত না থাকলেও
পাদটীকার প্রতি লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি]

ব্যক্তিনাম

গ্রন্থনাম